শিকড় যদি চেনা যায়

অরুণ মিত্র

করুণা প্রকাশনী | কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯,

মুদ্রাকর
শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

স্নেহাস্পদ সুরজিৎ ঘোষ-কে

প্রথম পর্ব : ফ্রান্স

১

প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি জন। মনে হল আমি আমার ছোটবেলায় রয়েছি আর আমার খেলার সাথী বাবুল দৌড়ে এসে পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার এক এক সময় এইরকম হয় : স্থান কাল পাত্র ঠিক থাকে না। ভেতরের কোনো স্রোত যেন হঠাৎ আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় এক তীরে যেখানে অনেককাল আগেকার দেখা মুখ, হয়তো আমার দিনশেষে যারা আবার আসবে তারা, অস্পষ্ট অস্পষ্ট। আবার এমনও হয়, যাকে একরকমভাবে চিনি সে এক মুহূর্তে পাল্‌টে গিয়ে অন্য পরিচয় নিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকও বদলে যায়। কত মজার খেলা করে যে স্মৃতি! শুধু স্মৃতি কেন, ইচ্ছে। ইচ্ছেরও একটা ভূমিকা আছে মনে হয়। বেশ মজার খেলা। নইলে সেদিন অমন কাণ্ড করব কেন? মেজঁ অ্যাঁতেরনাসিওনাল-এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি আড্ডা মারছি ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে, এমন সময় ক্লোদ এসে উপস্থিত। ওকে দেখেই আমি লাফিয়ে উঠলাম, বাংলায় চেঁচিয়ে বললাম : "আরে, তুই কোথা থেকে? কতদিন তোর দেখা নেই।" ক্লোদ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। বাংলা সে কি ক'রে বুঝবে? অন্য ফরাসী ছেলেরাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার সংবিৎ ফিরিয়ে আনল। খেয়াল হল ক্লোদ ফরাসী, বাংলা সে জানে না এবং আমরা রয়েছি প্যারিস শহরের চোদ্দ নম্বর এলাকায়।

ক্লোদের গায়ের রং অবিশ্যি ঝকঝকে ফর্সা নয়, একটু তামাটে। ফ্রান্সের দক্ষিণে, ইতালীতে ও স্পেনে যেমন রং কারো কারো দেখা যায়। কিন্তু আমি কেন তার সঙ্গে হঠাৎ বাংলা বললাম? তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কে আমার মন দখল করেছিল? বাবুল? নাকি আমার আরো প্রিয় সেই চোখ-বড়বড় শ্যামল ছেলেটা যে পানু ব'লে ডাকলেই মিষ্টি ক'রে আমার দিকে তাকাত? কিন্তু ক্লোদের সঙ্গে তাদের মুখের কোনো মিল এ পর্যন্ত আমাকে নাড়া দেয়নি। সে-সব হয়তো নয়। হয়তো এটা শুধু ক্লোদকে হঠাৎ ভালো-লাগার জন্যে হয়েছিল, তার হৃদয়ের কাছাকাছি যাওয়ার ইচ্ছে থেকে হয়েছিল।

স্মৃতি আর ইচ্ছে। এক এক সময় মানুষও থাকে না। আকাশ বা রোদ বা নদীর জল অথবা সব একসঙ্গে আমাকে একটা ঘেরাটোপ থেকে বের ক'রে নিয়ে যায়। এই কয়েকদিন আগে যেমন হল। রোজই তো আমি বিবলিওতেক নাসিওনাল থেকে বেরিয়ে লুভ্র্ জাদুঘরের আঙিনা পার হ'য়ে সেন নদীর পোলের উপর দিয়ে বাড়ি ফিরি। সেদিন লুভ্র্-এর আঙিনায় সত্যি জাদুই হল। পড়ন্ত রোদ পাথরের দেয়ালগুলোকে রাঙিয়ে দিয়েছে, নদীর বাঁধটা দেখা যাচ্ছে হলুদ-হলুদ লাল, আমার শরীরের একটা ম্লান ছায়া পড়েছে ঘাসের উপর। হঠাৎ চারপাশের আওয়াজ ঝিমিয়ে গেল আর আমার মনে পড়ল মাকে। না, তারও বেশি। আমার মনে হল মা আমাকে দেখছে, ঠোঁটে লেগে আছে মা'র বেঁচে থাকার সময়ের সেই করুণ হাসিটা। আমি একবার চাপা গলায় ব'লেই ফেললাম: "মা, তুমি নিজেকে উজাড় ক'রে হেসে ওঠো না কেন?" কিন্তু পরমুহূর্তেই ফিরে এল প্যারিস, লুভ্র্, সেন আর আমার দৈনন্দিন কাজ।

পেছন থেকে কে আমার কাঁধ দুটো চেপে ধরেছে তা আমার বোধে আসতে অবিশ্যি দেরি হয়নি। মুখটা একটু পাশে ফেরাতেই দৃষ্টির মধ্যে এল মূর্তিমান জন। মুখ না ফেরালেও বোঝা যেত। তখন তার চড়া গলার আওয়াজ শুরু হ'য়ে গিয়েছে: "পলাশ,

তোমাকে সারা প্যারিস শহর তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজছি, তোমার পাত্তা নেই। কোথায় যে গা ঢাকা দাও জানি না। খালি আমি নই, এলেনি, পিটার, ইম্‌রে সবাই খুঁজছে। অথচ তুমি হাওয়া। কি কাণ্ড যে করো তুমি!"

আমি তার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে বললাম: "দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা কী বুঝতে দাও। আমার যদি পাত্তাই নেই, তাহলে আমাকে তুমি এখন দেখছো কি ক'রে? তাছাড়া, এ জায়গাটা বাদ দিয়ে সারা প্যারিস খোঁজার মানেটা কী? তুমি তো জানো আমি এই সস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ী রেস্তোরাঁয় প্রায় রোজই খাই এবং খাবার সময়টা এখন বেশি দূরে নয়।"

একগাল হেসে জন উত্তর দিল: "সারা প্যারিস মানে তোমার থাকার সম্ভাব্য জায়গাগুলো। প্রথমে গিয়েছি তোমার হোটেলে, তারপর বন্ধুদের বাড়ি, এমনকি ফ্রাঁসোয়ার বাড়িতেও, যদিও তার স্ত্রীরত্নটিকে আমি খুব ডরাই। আমার বাড়িটা আর খুঁজিনি, কারণ সারাদিনের পর সেখান থেকেই আমি বেরিয়েছি। জানি না, অন্যেরা যদি এখন সেখানেও গিয়ে থাকে।"

—"তা তো বুঝলাম, কিন্তু এই রেস্তোরাঁয় আসতে কী হয়েছিল?"

—"বাঃ, এখানে প্রথমে আসব কেন? এখানে তোমার আসা ঠেকাবার জন্যেই তো আমাদের এত খোঁজাখুঁজি।"

অকাট্য যুক্তি। বললাম: "ঠিক ঠিক, আমি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছি। এখন আসল কথাটা ব'লে ফ্যালো। আমার মতো এক সামান্য আত্মার সন্ধানে কেন এই স্বর্গমর্ত্যপাতাল আলোড়ন?"

জন বলল: "আজ আমার ঘরে খানাপিনার আয়োজন হয়েছে। তুমি না এলে চলবে না।"

—"উপলক্ষ্য?"

—"আসল উপলক্ষ্য বলা যায় আমার মার কাছ থেকে বাড়তি কিছু ডলার প্রাপ্তি। সেটার জন্যে তো একটা অনুষ্ঠান করা দরকার।

এছাড়া, আমাদের দু'জন বন্ধু এসেছে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে। তাদের সঙ্গে আমাদের সকলের এক জায়গায় মেলাটাও হবে।"

—"কারা এই নবাগত বন্ধু ?"

—"একজন নবাগত হলেও নতুন নয়। আমার আর পিটারের পুরনো বন্ধু ম্যাক্স। আমাদেরই স্বদেশবাসী। আমরা একসঙ্গে সানফ্রান্সিসকোতে পড়তাম। অন্যজন হল ক্লারা, জার্মান মেয়ে। তার সঙ্গে আমাদের এই প্রথম পরিচয়।"

আমি জিগ্যেস করলাম : "দু'জন কি আলাদা আলাদা এসেছে, না, একসঙ্গে ?"

জন বলল : "একসঙ্গে। ওরা একসঙ্গেই বাস করে।"

মহাযুদ্ধোত্তর ক্ষত-বিক্ষত জার্মানী আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। রুটি, কাপড়, কয়লা সব কিছুরই অভাব। পয়সাও নেই। শত্রুকে প্রতিপক্ষ হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বে নতুন বিশ্ব-সম্রাট হতে চাওয়ার মজাটা কী। তারপর ধীরে ধীরে তাকে নিজেদের প্রাচীন সাম্রাজ্য-যন্ত্রে মাপসই ক'রে লাগিয়ে নেবে। তখন দেখা দেবে সমৃদ্ধি আর সম্ভোগ। এখন কিছু নেই। আছে কেবল শীত ও খিদে। আর আছে মেয়েদের শরীর। আগন্তুক বিদেশী পুরুষের অভাব নেই। তাদেরও ভীষণ খিদে। রুটির নয়, রুটি তাদের প্রচুর। তাদের খিদে মেয়ের, পেট জুড়োলেই যা প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে। তারা মেয়েদের শরীর চায়। আমেরিকানরা তো রাজা। তাদের পকেট ভরতি ডলার, দোকান বাজার তাদের মুঠোর মধ্যে। সুতরাং খিদের সঙ্গে খিদের কাটাকুটি হোক। ডলারওয়ালা পুরুষের সঙ্গে শুলে যদি রুটি মাংস পাওয়া যায়, পশম পাওয়া যায়, জ্বালানি পাওয়া যায়, যদি নিজে বাঁচা যায় আর আপনজনদের বাঁচানো যায়, তাতে অন্যায় কী ? তাছাড়া, ন্যায় অন্যায় ভাববার মতো অবস্থা কি জার্মানদের আছে এখন ?

আমার অন্যমনস্ক মুখে কি বিতৃষ্ণার কোনো চিহ্ন ফুটেছিল ? জন হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলল : "তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

আমি এর আগেও দেখেছি জন এক এক-সময় আশ্চর্যভাবে মনের কথা ধ'রে ফেলে। শিশুদের বেলাতেও আমি এ রকম দেখেছি। ওরা হঠাৎ যেন বয়স্ক মানুষের মনের ভেতরটা দেখতে পায়। তখন তাদের দৃষ্টির সামনে কেমন লজ্জা করে। আমারও জনের কথায় একটু লজ্জা হল। সেটা কাটাবার জন্যে বললাম: "আমি কী ভাবছি বলো তো।"

জনের স্বাভাবিক ছেলেমানুষী ভাবভঙ্গি বিজ্ঞতায় ভারী হ'য়ে উঠল, বলল: "তুমি ভাবছ ওদের সম্পর্কটা টাকার।"

বললাম: "কিন্তু আমেরিকানদের এরকম রেওয়াজ তো আছে।"

জনের মুখটা বেদনার্ত দেখাল। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "হ্যাঁ আছে। কিন্তু আমেরিকানরা তো এক জাত নয়, অনেক জাত। আমি ও পিটার এবং আমাদের বন্ধুরা একটা বিশেষ জাতের আমেরিকান। তা কি তুমি অনুমান করতে পারো না, পলাশ?"

এবার আমি সত্যি সত্যি লজ্জা পেলাম। জন ঠিকই বলেছে। সব আমেরিকানকে এক ক'রে ভাবা আমার উচিত হয়নি। বাস্তবিকই তো তারা অনেক জাতের। আমেরিকান কেন, প্রত্যেক জাতই তো অনেক জাতের। এই আমি বাঙালী পলাশ হালদার, সব ভারতীয়দের সঙ্গে, এমনকি সব বাঙালীর সঙ্গে চিন্তায় ও আচরণে আমার কতখানি মিল? যতটা মিল, তার চেয়ে বেশি অমিল। কারো কারো সঙ্গে খুব মিল আর অনেকের সঙ্গে এমন প্রকাণ্ড অমিল যা কোনো জন্মেও পার হওয়া যাবে না।

"ম্যাক্স ও ক্লারা বুঝি স্বামী-স্ত্রী?" আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করলাম।

জন উত্তর দিল: "তা বলতে পারো। তবে ওরা সামাজিক বিয়ে করেনি। ক্লারার বাবা জার্মানীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁর অবস্থাও খারাপ নয়। তাঁর বাড়িতেই ওরা থাকে। ওদের এই যুগ্ম জীবনযাত্রায় তাঁর পূর্ণ সম্মতি আছে।"

আমি বললাম: "আমার অভিনন্দন প্রথমেই জানিয়ে দিই।

এমন সংস্কারমুক্ত মন এবং এমন সাহসিকতা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত বাবার মনোভাব।"

জন মন্তব্য করল : "অভিনন্দনের যোগ্য তো বটেই। আমি ওদের জানাব।"

অতঃপর আমি বললাম : "কিন্তু সমাজের ব্যবস্থা এবং চিন্তাধারা যেখানে অন্যরকম, মানে বিপরীত, সেখানে এইরকম দাম্পত্যে ব্যক্তিগত দায়িত্বের একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সমাজ যখন দূর ভবিষ্যতে বদলে যাবে তখন হয়তো সে প্রশ্ন অদৃশ্য হবে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সেটা খুব বড়।"

জন সায় দিল : "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

আমরা কথা বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। জনের আস্তানা বেশি দূরে নয়। শীত এখনো ঠিক পড়েনি, তবে হাওয়ায় ধার এসেছে। চওড়া বুলভার। ঘরমুখো মানুষের ভিড় স'রে গিয়ে তাকে আরো চওড়া ক'রে দিয়েছে। ছাড়া-ছাড়াভাবে যারা পথ চলছে তাদের চলনে ব্যস্ততা নেই। প্রায় সবার গায়েই রেনকোট, যদিও আকাশ এখন পরিষ্কার। হেমন্তের রাজত্বে এটাই রেওয়াজ। জল ঠেকাবার আস্তরণ হাওয়াও ঠেকায়। কিন্তু এই বাঁধ এর পর অকেজো হ'য়ে যাবে, শীতের ঝাপ্‌টা তাকে হাস্যকর ক'রে তুলবে। তখন পশমের মোটা ওভারকোট না চাপালে আর চলবে না। দু'ধারে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া প্লাতান গাছ থেকে একটা দুটো ক'রে পাতা খসছে, এরপর হঠাৎ একসময় ঝরঝর ক'রে ঝরতে থাকবে। গাছগুলো একেবারে ন্যাড়া হ'য়ে যাবে। শীতের রাতে তারা প্রকাণ্ড এক-একটা প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। রাস্তাটা এই সময় কেমন ঝিমঝিম করে। বাতি জ্বললেও প্লাতান গাছগুলোর নিচে পাৎলা অন্ধকার। সেই এলাকায় পা দিলে শরীরগুলো যেন অবাস্তব হ'য়ে যায়। ঝরা পাতার উপর জুতোর চাপ পড়ে আর শোনা যায়-কি-যায় না এমন একটা শব্দ হয়। গলার স্বর যেন ছায়ায় লেগে প্রতিধ্বনিত হয়, মনে হয় অনেক দূর থেকে ফিরে আসছে। আবার আলোয় বেরিয়ে এলেও

তার রেশ যায় না। এপাশে ওপাশে ছাইরঙ বাড়িগুলোকে বিধুর লাগে। এই অন্তরঙ্গ আলোছায়ার রাস্তায় আমরা হাঁটতে লাগলাম।

ম্যাক্স-ক্লারার কাহিনী একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। সেটা বড় হতে হতে এইখানে আমার চোখের সামনে এসে পড়ল। আমি জনকে জিগ্যেস করলাম: "তুমি তো এইরকম দাম্পত্যজীবন সমর্থন করো।"

সে উত্তর দিল: "হ্যাঁ করি।"

এর পরের প্রশ্ন আমি ঠেকাতে পারলাম না। জনের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে ঠেকানোর কোনো মানেও হয় না। আমি প্রশ্ন করলাম: "তাহলে তুমি এলেনির সঙ্গে ঐ ভাবে থাকো না কেন?"

জনকে এক মুহূর্ত কেমন যেন বিভ্রান্ত মনে হল। তারপর সাম্‌লে নিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল: "তা তো সম্ভব নয়। কোথায় থাকব আমরা? এখানে আমাদের আশ্রয়স্থল তো হোটেল অথবা গৃহস্থ পরিবার। কিন্তু কোথাও আমাদের এক ঘরে থাকতে হ'লে মিথ্যে ক'রে বলতে হবে আমরা স্বামী-স্ত্রী, সামাজিক নিয়মে বিবাহিত দম্পতি। তা কেন বলব?"

তারপর একটু থেমে বলল: "তাছাড়া, এলেনি তা চায় না।"

আমি জনের চোখ দুটো দেখতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ওর মুখ তখন অন্যদিকে ফেরানো।

তবে কি এলেনি এখনো একটা বে-ওয়ারিশ এলাকা রাখতে চায় জন ও তার মধ্যে?

২

জন একটা পাগল। বাবা যেমন ছেলেকে বলে তেমনি আমার ওকে বলতে ইচ্ছে করে, পাগল। এই আবার এক ইচ্ছে। জনের চেয়ে অবিশ্যি বয়সে আমি বড়, কিন্তু এত বড় নই যে বাবার আসন নিতে পারি। তবু এক-এক সময় ওর উপর আমার স্নেহ উথলে

পড়ে। স্নেহ এবং সখ্য কোন রেখায় আলাদা হয়ে যায় কে বলবে? আমার মা তো আমাকে অসম্ভব স্নেহ করত, অথচ মাকে আমার কোনো কোনো মুহূর্তে নিকটতম বন্ধু মনে হত। মা'রও কি মনে হত না? মারা যাবার আগে মা'র ব্যাকুলতার দৃশ্যটা এখনো আমার সামনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে আর আমি মা'র অব্যক্ত কথাগুলো শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হই। না, যন্ত্রণার ব্যাকুলতা তখন মা'র ছিল না, সমস্তটাই ছিল আমাকে কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুলতা। বিশ্বসংসার পরিবার পরিজন সব অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল, শুধু ছিল একটি সন্তান এবং তার দিকে বাড়ানো দুটো হাত, আর দুই ঠোঁটের শব্দহীন নড়া। শারীরিক যন্ত্রণার কথা মা আমাকেই বলত, কিন্তু শেষকালে আর বলেনি। শেষকালে যেন আমার মধ্যে মিশে যেতে চেয়েছিল। আচ্ছা, এমন কি হয়, যাকে গর্ভে ধারণ করা যায় তার মধ্যে অবলুপ্ত হ'য়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে?

জনকে আমি যতদিন জানি, পিটারকেও ততদিন। কিন্তু পিটারের কথায় বা আচরণে কোনোদিন মনে মনে ব'লে উঠিনি, পাগল। পিটার এবং আমার মধ্যে যেন একটা সমান-চিহ্ন আছে। জনের মতো তীব্র নিখাদে সে কথা বলে না, এক নিমেষে উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে না, সমবেদনায় অস্থির হয় না। পিটারের গলার স্বর অনেকটা চাপা, যার লয় সব সময় একরকম থাকে। তার আবেগ শুধু টের পাওয়া যায় যখন সেই গলার স্বর একটু একটু কাঁপে। বীরেনদারও এই রকম ছিল, কোনো অবস্থাতেই তার গলার স্বরের অদলবদল হত না।

আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিল বীরেনদা, তবে আমাদেরই দলের পাণ্ডা ছিল সে। মনে আছে একবার কলকাতায় আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সিনেমা শব্দটা তখনো তত চালু হয়নি। বীরেনদা তো সব সময় বলত বায়োস্কোপ। সবচেয়ে কম দাম চার আনার টিকিটঘরের সামনে দারুণ ভিড়, গুণ্ডারা লোকের ঘাড়ের উপর চ'ড়ে, জানলার শিক ধ'রে সকলকে

পেছনে ঠেলছে। তারা বেশির ভাগ টিকিট কিনে নিয়ে চড়া দামে বেচবে। টিকিট কেনার জন্যে আমি সামনে ছিলাম, কিন্তু আর থাকতে পারছিলাম না। দুশমন চেহারার একটা লোক উপর থেকে তার পায়ের চাপে আমাকে হটিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম পেছন থেকে কেউ সেই লোকটার ঘাড়ের কাছে জামাটা চেপে ধরল, ধ'রেই এক ঝট্‌কায় তাকে টেনে নামাল। সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ শুরু হল, ভিড়ের চাপও একটু কমল। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম লোকটা যার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, সে বীরেনদা এবং বীরেনদা প্রচণ্ড ঘুষি মারছে তার মুখে। এক ফাঁকে বীরেনদা আমার দিকে চোখ তুলে স্থির কণ্ঠে বলল: "টিকিট কেটে নাও।" আমি টিকিট কেটে ভিড়ের বাইরে এসে দেখি আমাদের অন্য সঙ্গীরা বীরেনদাকে সরিয়ে নিয়েছে। গুণ্ডাটা প্রতিশোধের হুম্‌কি দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমরা হলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। ফিল্ম শেষ হ'লে বীরেনদার কথা ভেবে আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে বেরোলাম। এখন হ'লে বোধহয় বীরেনদা অত সহজে পরিত্রাণ পেত না।

আমাদের মফস্বল শহরের পাশে গাঁয়ের ঘটনাটা তার আগের। সেবারও আমরা দল বেঁধে বেরিয়েছিলাম। সন্ধের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল ডাব চুরি। খানিকক্ষণ হাঁটার পর ডাব ভরতি একটা মাঝারি-উঁচু গাছের সামনে আবছা অন্ধকারে আমরা দাঁড়ালাম। মানিকদার গাছে চড়ার দক্ষতা ছিল এমন অসাধারণ যে না-দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। গাছে হাত-পা বাধিয়ে বুক না-ঠেকিয়ে সে তরতর ক'রে উঠে যেত যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। নারকেল গাছে চড়ার জন্যে তাকে কখনো পায়ে দড়ি পরতে দেখিনি। মানিকদার গাছে চড়ার কথা উঠলেই বীরেনদা বলত: "ও আসলে একটা বাঁদর।"

মানিকদা তো উঠে গেল গাছের মাথায়। আমরা ক'জন একটা চাদর চার ভাঁজ ক'রে ধ'রে থাকলাম। উপর থেকে ডাবগুলো তার উপর ফেললে শব্দ হবে না। কয়েকটা ডাব ঠিকই পড়ল, কিন্তু একটা ছিট্‌কে পড়ল মাটিতে। মানিকদা বোধ হয় বেশি তাড়া-

হুড়ো করছিল, কারণ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, আর অন্ধকারে একা আলাদা হ'য়ে থাকা মানিকদার পক্ষে সম্ভব নয়। মাটিতে ডাব পড়ার শব্দ হতেই আমরা চাদর গুটিয়ে ফেলেছি এবং মানিকদা নামতে আরম্ভ করেছে। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত। তারপরই অল্প দূরের এক কুটীরের ভেতর থেকে হুঙ্কার: "ডাব পাড়ে কে. কোন্ শালারা? শালাদের আজ ক্যাটেই ফ্যালব।" বীরেনদা শান্ত নিচুস্বরে বলল: "তোমরা দৌড়োও।" আমরা শুধু এক লহমা পেছনে তাকিয়ে দেখলাম পিদ্দিম-জ্বলা ঘরের দরজা দিয়ে এক দশাসই মরদ বেরিয়ে আসছে এবং তার হাতে ভারী একটা কী। আমরা দৌড়োলাম। বীরেনদাও দৌড়োল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে নয়, পেছনে। আমাদের উপর চোট পড়ার আগে রামদা সাম্‌লাবার দায়িত্ব বীরেনদা নিজে থেকেই নিয়ে নিয়েছে। অন্ধকার অবিশ্যি আমাদের সকলকেই ঢেকে দিয়েছিল সেদিন।

বীরেনদার বাবা মারা যাওয়ার পরের পর দিনটাও মনে আছে। আমি সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলাম সমবেদনা জানাতে। বীরেনদার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তিনি প্রচুর জোতজমি করেছিলেন; শুনতাম চাষীদের কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে থাকেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য নাকি কারো নেই। সেবার তিনি শহরের বাড়ি থেকে ভোরবেলায় গিয়েছিলেন বকেয়া আদায় করতে কিংবা হিসেব-নিকেশ করতে, সঠিক জানি না। সেই দিনই ফেরার কথা ছিল কিন্তু ফেরেননি। সকালে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধ'রে থাকার পর সবাই তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। যে-গাঁয়ে তাঁর জোতজমি ছিল সেখানে গিয়ে লোকজনকে জিগ্যেস ক'রে কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। হদিস পাওয়া গেল দুপুরবেলায় খেতের জমিতে। দেখা গেল, আলের ধারে তাঁর মৃতদেহ প'ড়ে আছে. গলার নলীটা কাটা এবং দুই ঠোঁটের মধ্যে গোঁজা রয়েছে একগুচ্ছ ধান।

বীরেনদার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, বাবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ সে একটুও তুলল না। বরং অন্য দিনের মতোই সাধারণ কথাবার্তা

বলল। স্বভাবতই আমার তরফ থেকে সমবেদনা জানানো সম্ভব হল না। সেদিন এবং পরে কোনোদিন বীরেনদা বাবার মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করেনি। কেন করেনি ? বাবার বিরুদ্ধে বলতে হবে ব'লে ? আমার তাই মনে হত যখন তাকে কখনো কখনো কৃষক-আন্দোলনের পক্ষে দু'একটা মন্তব্য করতে শুনতাম। অথচ বীরেনদা রাজনীতি করত না। তার কোনো কোনো বন্ধু কমিউনিস্ট দলে নাম লেখালেও সে লেখায়নি। বীরেনদা তাদের জোতজমির কী করেছিল ? নিজের অংশটা কি বেচে দিয়েছিল ? সে-কথাও আমার পক্ষে তাকে জিগ্যেস করা কোনোদিন সম্ভব হয়নি। তবে যে-গাঁয়ে তার বাবা খুন হয়েছিলেন, সেখানে সে আর গিয়েছে ব'লে কখনো শুনিনি।

বীরেনদার সঙ্গে পিটারের যা মিল তা ঐ কথা বলার ভঙ্গিতে। কিন্তু কথার নিচের যে-অনুভব তা কি ক'রে বলি একরকম ? দুটো মানুষের কি তেমন কখনো হতে পারে ? বীরেনদাকে কখনো কবিতার প্রতি মনোযোগ দিতে দেখিনি, কিন্তু পিটার এক এক সময় কবিতায় মগ্ন হ'য়ে যায়। কবিতা জনেরও এক বড় আকর্ষণ। সে কবিতা লেখেও। আমার সঙ্গে তার পরিচয় তো কবিতারই মধ্যস্থতায়। কিন্তু কবিতা তার এক মত্ততা। জনের ধাঁচটাই আলাদা। তার ভালোবাসা এবং উদার হওয়া আগল-খোলা। কোনো বাস্তবকে তা গ্রাহ্য করে না। ভালোবাসা এবং উদারতা থেকে যখন সে মন ঘুরিয়ে নেবে, তখনও বোধহয় বাস্তবকে একই ভাবে উড়িয়ে দেবে।

একদিন সরবন থেকে বেরোনোর পর সে আমাকে হঠাৎ জিগ্যেস করল: "পলাশ, তুমি এই ফেঁসে-যাওয়া পুরনো কোটটা পরো কেন ?"

আমি উত্তর দিলাম: "যেহেতু নতুন কোট কেনবার পয়সা আমার নেই, অন্তত এখন নেই।"

ও বলল: "তাতে কী, আমার তো এতগুলো কোট রয়েছে, সবগুলো তো আমি একসঙ্গে পরি না। একটা তুমি নাও। তোমায় নিতেই হবে।"

তার দাবি আমি শেষ পর্যন্ত মানিনি। কিন্তু দেবার ঝোঁকটা তার অদম্য হ'য়েই র'য়ে গেল। সেটা টের পেলাম কিছুদিন পরে যখন সে বলল: "পলাশ, এই টাইটা এনেছি, তুমি নাও। আমার একটা স্মরণচিহ্ন হিসেবে আমি এটা দিতে চাই! এ টাই আমি কিনিনি। আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। এরকম টাই এক-একটা আলাদা তৈরি হয়, এর জুড়ি পাওয়া যাবে না।"

নিলাম সেই টাই। ঘোড়া যখন নেব না, তখন অন্তত চাবুকটা আমাকে নিতেই হবে। নইলে জন কষ্ট পাবে।

আর একদিনও বিকেলে আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি। আমার মনটা একটু উদ্বিগ্ন। তার আগে যতবার সরবনের কামরায় জনের উপর নজর পড়েছে, মনে হয়েছে ওর কিছু হয়েছে। মুখটা শুক্‌নো, চোখ দুটো বসা। আমি জিগ্যেস করলাম: "তোমার কী হয়েছে, জন?" প্রথমে উত্তর দিল: "কিছু না।" কিন্তু চেপে ধরতে বলল, সারাদিন কিছু খায়নি ব'লে চেহারাটা ঐ রকম দেখাচ্ছে। যখন প্রশ্ন করলাম, কী অসুখ হয়েছে, বলল, কোনো অসুখ হয়নি।

—"তবে খাওনি কেন?"

—"উপোস করেছি। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে।"

উপোসের কারণ জিগ্যেস করায় বলল: "ছাখো পলাশ, আমি বরাবর শুনে এসেছি ভারতবর্ষের মানে তোমাদের দেশের সব লোক দু'বেলা খেতে পায় না। তোমাদের নেতা মিস্টার গান্ধীরও মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় অনশনের কথা শুনেছি। ভারতীয়দের এই অনাহার আমাকে বরাবরই বিচলিত করেছে, আমি তাদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করেছি। কিন্তু এবার আমার মনে হল আমার সহানুভূতি একেবারে কৃত্রিম। যে-অনুভূতি আমি জানি না, তার সঙ্গে সহানুভূতির মানে কী? আমি জীবনে কখনো না-খেয়ে থাকিনি, কাজেই না-খেয়ে থাকার কষ্ট আমার অজানা ছিল। সেটা জানবার জন্যে আমি উপোস করেছি। সত্যি খুব কষ্ট হয়, পলাশ, খুব। মনে হচ্ছে আমি বুঝি এক্ষুনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যাব।"

আমি নীরবে তার কথাগুলো শুনলাম। তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলাম এক রেস্তোরাঁয়। সেখানে আমরা দু'জনে কিছু খেলাম। জনের জন্যে আমিও ইচ্ছে ক'রে হালকা খাবারই খেলাম।

জনের উচ্ছ্বাসের যেমন সীমা নেই, তেমনি বিষাদেরও। সেদিন সঁ্যা ঝ্যারমঁ্যা দেপ্রে'র কফিখানায় সবার সঙ্গে দেখা। এলেনি, পিটার এবং অন্য কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত। জনও রয়েছে। কিন্তু কথা সে তেমন বলছে না। পৃথিবীর যত বিতৃষ্ণা ও যন্ত্রণা তার মুখে জড়ো-করা। আমি এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম: "কি হল আবার তোমার?"

ও জবাব দিল: "মানুষ এত খারাপ হয়! মানুষের প্রতি বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলছি, পলাশ।"

আমি প্রশ্ন করলাম: "কেন? কি ঘটেছে?"

তাতে বলল: "না, আমাকে কিছু বলতে বোলো না। বলতে গেলেই সব আবার আমার মনে আসবে এবং আমি আরো যন্ত্রণা পাব।"

তখন আমি অন্যদের দিকে ফিরলাম এবং তাদের কাছ থেকেই ঘটনাটা শুনলাম। আগের দিন রাত্তিরে ওরা সবাই এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিল। বেশ ভালোই খানাপিনা চলছিল। এমন সময় ওদের পাশের টেবিলে এসে বসল একটি লোক, পরনে মলিন পোশাক, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি হয়েছে মুখে। লোকটা খাদ্য নিল সামান্য। সকলের নজর তার উপর পড়ল, বিশেষ ক'রে জনের। আহা, বেচারার খুব খিদে পেয়েছে, অথচ যথেষ্ট খাবার মতো পয়সা নেই। জনের যেই তা মনে হওয়া, অমনি উঠে যাওয়া। লোকটার কাছে গিয়ে ক্ষমাটমা চেয়ে তাকে তাদের টেবিলে এসে খেতে বলল। সে একটু আমতা-আমতা ক'রে শেষ পর্যন্ত উঠে এল। তারপর জনের সঙ্গে তার কথাবার্তা বেজায় জ'মে গেল। জন জানতে পারল তার খাবার পয়সা তো নেই-ই, শোবার জায়গাও নেই। তাকে জন তার নিজের ঘরে আশ্রয় নেবার আমন্ত্রণ জানাল। অন্যেরা

তাকে ঠারেঠোরে বারণ করেছিল, কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। হোটেলে নিয়ে গিয়ে লোকটাকে জন খাটে শোয়াল এবং নিজে শুল মেঝের উপর কম্বল পেতে। পরোপকারের প্রসন্নতায় জনের নিদ্রা নিশ্চয় অত্যন্ত সুখকর হয়েছিল। সকালে বেশ দেরিতে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল তার রাতের অতিথি নেই। এবং নেই তার ঘড়ি, পার্স, হ্যাঙারে ঝোলানো স্যুট, এমনকি তার বিছানার কম্বল ও চাদর যা হোটেলের সম্পত্তি।

এই হল জন। এই জন্যেই তার সম্বন্ধে আমার অনিশ্চয়তা।

৩

ডলার ধ্বংসের অনুষ্ঠানটা জমেছিল বেশ। ইম্‌রে তো একাই একশো। হাঙ্গারীর ছেলে, চোখা মুখ-চোখ, গান জানে, অনর্গল বলতে পারে গোটা পাঁচেক ভাষা। কখনো ইংরিজী কখনো ফরাসী কখনো জার্মান তার মুখে খইয়ের মত ফুটছিল। ছোটবেলায় আমার বয়েসী বাঙালী ছেলেদের মুখে ইংরিজী শুনলে আমার খুব শ্রদ্ধা হত। ইংরিজী বলছে ব'লে নয়। আমার গেঁয়ো মনে দোআঁশলা ইংরিজী-নবিশিকে ঠাঁই দেবার মতো কোনো সভ্য জায়গা ছিল না। শ্রদ্ধা হত দুটো ভাষা বলতে পারে ব'লে। অন্য ভাষার উপর কারো দখল দেখলে আমি চমৎকৃত হতাম। ইম্‌রের ভাষা-বিহারে আমি ছোটবেলার সেই শ্রদ্ধা বোধ করি। ও যেন এক জাদুকর। মনে হয় ওর মাথার মধ্যে অনেকগুলো সুইচ রয়েছে। কখন একটা টিপে দেয়, অমনি বেরোয় ইংরিজী; আবার কখন আমাদের অজান্তে সেটা বন্ধ ক'রে আরেকটা টেপে, অমনি বেরোয় ফরাসী বা ইতালীয় বা জার্মান। একটার সঙ্গে আরেকটা কখনো জট পাকিয়ে যায় না। আহা, ইম্‌রে যদি বাংলা বলতে পারত! কিন্তু বললে কী হত কে জানে। তাহলে আমি হয়তো ওকে পুজো করতাম। জাদুকর না-ভেবে ওকে ভাবতাম ভগবান। একরকম

ভালোই হয়েছে ও বাংলা জানে না। ওকে মানুষ ব'লেই ভাবতে পারছি।

আমি ঘরে ঢুকতে বিবিধ সম্বোধন কানে এল। একাধিক কণ্ঠ বলল: "পল, এসো এসো।" একটি কণ্ঠ বলল: "লাশ, কোথায় পালিয়ে ছিলে তুমি?" একটি কণ্ঠ বলল: "পলাশ, কখন তুমি আসবে তাই ভাবছিলাম।"

শেষের কণ্ঠটি পিটারের, মাঝখানেরটি ফ্রাঁসোয়ার স্ত্রী ওদেতের, বাকীগুলো অন্য সবার।

আমার নাম পলাশ। এদের অধিকাংশের মুখে সেটা হ'য়ে গিয়েছে: পল। প্রথমে কেউ কেউ যখন আমাকে পল ব'লে ডাকবার ইচ্ছে জানিয়েছিল, আমি ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়েছিল সেন্ট পলকে। তাঁর নামটা নিতে আমার দ্বিধা হয়েছিল। শুনেছিলাম তিনি নাকি দামাস্কাসের পথে অকস্মাৎ এক দিব্যজ্যোতি দেখেছিলেন, যার ফলে তাঁর চিন্তা ও জীবনধারা একেবারে বদলে গিয়েছিল। তিনি অনমনীয় খ্রীস্ট-বিরোধী থেকে প্রবলতম খ্রীস্ট-প্রচারকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি আমার চোখ দুটোর শক্তি খুবই সীমাবদ্ধ, কোনো প্রতিবন্ধ তারা ভেদ করতে পারে না, তারা কেবলই আট্‌কে যায় মাটিতে মাংসে হাড়ে। আমি জানি পথ চলতে চলতে কোনো দিব্যজ্যোতি তারা কখনো দেখতে পাবে না। কিন্তু আমার আপত্তি করার কোনো অর্থ ছিল না। এই নাম এদের মুখে সহজে আসে, এবং এই নাম এদের মধ্যে এত প্রচলিত ব'লে তার মাধ্যমে এরা বোধহয় আমার সঙ্গে একটা নৈকট্যও বোধ করতে চায়। আমি তাতে বাধা দেব কেন? ক্লোদ, ইম্‌রে, ফ্রাঁসোয়া এবং আরো অনেকে আমাকে পল বলে। এমনকি এলেনিও।

কিন্তু প্রথম পরিচয়ে ফ্রাঁসোয়া যখন বলেছিল পলাশকে পল বলাই সুবিধে, তখন ওদেৎ মুচ্‌কি হেসে মন্তব্য করেছিল: "কেন, 'লাশ' মন্দ কিসে?" ফরাসীরা এবং ফরাসী-জানা ছেলেমেয়েরা

হেসে উঠেছিল। দু'একজন আমেরিকান জিগ্যেস করেছিল মানেটা কী। তখন আমিই উদ্যোগী হ'য়ে বলেছিলাম: "মানে দু'রকম হয়। এক রকম বাংলায়, আরেক রকম ফরাসীতে। চল্‌তি বাংলায় এর মানে হল মৃতদেহ। সেই অর্থে কি নামটা আপনি ব্যবহার করতে চান, মাদাম?"

ওদেৎ ব'লে উঠেছিল: "না, না।"

আমি বলেছিলাম: "আমার কিন্তু আপত্তি নেই। কারণ আমি অনেক সময়ই বুঝে উঠতে পারি না আমি বেঁচে আছি, না, ম'রে গিয়েছি। এমন সব কাণ্ড আমার চারদিকে আমি প্রায়ই দেখি যা দেখলে একজন জ্যান্ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হল হৈচৈ করা, মারামারি করা, ভাঙচুর করা। কিন্তু আমি চুপচাপ চ'লে যাই। সুতরাং আমি মৃতদেহ ছাড়া কী?"

ওদেৎ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে আমারই কথার জের টেনে আমি বলেছিলাম: "আর এই একই ধ্বনির ফরাসী শব্দের মানে হল ভীরু। (এইখানে ওদেতের ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দিয়েছিল এবং তার দাঁতগুলো ঝকঝক ক'রে উঠেছিল)। এই অর্থে যদি শব্দটা ব্যবহার করেন, তাতেও আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, মাদাম। বাস্তবিকই আমি ভীরু, অত্যন্ত ভীরু। আপনার মতো সুন্দরী মেয়েদের কাছে যেতে আমি ভয় পাই। আমার ইচ্ছে হয়, কিন্তু ভয় পাই। সব সময় মনে হয়, আমাকে আপনারা আদর করতে করতেই ঝকঝকে দাঁত দিয়ে কুটিকুটি ক'রে ফেলবেন। তারপর আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিসেই-বা আমি ভীরু নই? চুরি জোচ্চুরি জালিয়াতি ক'রে বড়লোক হতে আমার খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাই আমি ধরা প'ড়ে যাব। অতএব আমি সততার কথা ব'লে থাকি। একটা হারেম রাখার ভীষণ সাধ আমার হয় মাঝে মাঝে, রাত্তিরে কখনো কখনো জোর ক'রে তার স্বপ্নও দেখি। কিন্তু দিনের বেলায় একটা মেয়ের দিকেও আমি হাঁ ক'রে তাকাতে পারি না। ভয় চেপে ধরে এইবার বুঝি

প্যাঁদানি খেয়ে মরব। কাজেই আমি সচ্চরিত্র হবার উপদেশ দিয়ে থাকি, যদিও সচ্চরিত্র বলতে কী বোঝায় তা আমি ঠিক জানি না। সত্যিই আমি ভীরু, মাদাম। আপনার ভাষাতেই আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে 'লাশ' ব'লে ডাকবেন।"

আমার এই ভলত্যারী বক্তৃতা শুনে সকলেই আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কিন্তু ওদেতের মৃদু হাসি লেগেই ছিল এবং সে বলেছিল: "আপনি যখন অনুমতি দিলেনই তখন আমি ঐ ব'লেই ডাকব।"

শুধু দুইজন আমাকে আমার পুরো বাঙালী নামে ডাকে, জন আর পিটার। না, দুইজন নয়, আরো কয়েকজন। তারা আমাকে পল ব'লে স্বপ্নেও ডাকতে পারে না।

ম্যাক্স ও ক্লারার সঙ্গে পরিচয় হল। দিলখোলা ছেলে ম্যাক্স, বাক্যে ও আচরণে কোনো জড়তা নেই, স্প্যানিশ গিটার বাজাতে পারে ভালো। ক্লারা একটু গম্ভীর প্রকৃতির, তবে গোমড়া-মুখ নয়। আর ইম্‌রের কাছে কি কারো বিরসবদন থাকবার উপায় আছে! সে এক-একটি মেয়ের কাছে গিয়ে এক-এক ভাষায় অন্য মেয়ে সম্বন্ধে তার মনোবাসনা ব্যক্ত করছিল। যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে। প্রথমে ওদেৎকে ফরাসীতে বলায় বুঝলাম। ক্লারাকে দেখিয়ে বলল: "ঐ মেয়েটাকে আমার বড্ড ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।" এলেনির কাছে ওদেৎকে দেখিয়ে একটু রকমফের ক'রে ইংরিজীতে সেই একই বাসনার প্রকাশ। ক্লারাকে যখন জার্মানে বলল এলেনির দিকে ইঙ্গিত ক'রে, তখন ক্লারার মুখে হাসির উদ্ভাস দেখলাম। জন মন্তব্য করল: ভাঁড়। তাতে ইম্‌রের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এ-সবের মাঝে মাঝে গান চলছিল, বিভিন্ন ভাষায়। তবে সঙ্গীতটা স্বভাবত একই জাতের। এরা সবাই গাইতে পারে, যেমন পারে নাচতে। এক সময় সবাই আমাকে চেপে ধরল, গাইতে হবে। আমি অক্ষমতা জানাতে বলল: "যেমন পারো, গাও।" আমি বললাম: "না, তা গাইব না। কারণ তাতে বাংলা গানের উপর

তোমাদের অশ্রদ্ধা হবে, অথচ বাংলা গান মোটেই অশ্রদ্ধার নয়।"
তখন পিটার প্রস্তাব করল: "পলাশ, তুমি বাংলা কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাও।"

সকলের প্রবল অনুমোদনের ফলে আমাকে আবৃত্তি করতেই হল। তাছাড়া পিটারের অনুরোধ উপেক্ষা করতে আমার মন সরে না। আবৃত্তি করলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা। প্রতিক্রিয়া নানারকম। পিটার, ওদেৎ ও ফ্রাঁসোয়া শুনে চুপ ক'রে রইল, মনে হল যেন আবিষ্ট হ'য়ে আছে। ক্লারার গাম্ভীর্য আবিষ্টতার, না, স্বভাবের, বুঝলাম না। অন্য সবাই উসখুস ক'রে বলল: "বেশ বেশ।" শুধু জন হুম ক'রে ব'লে বসল: "এ যেন কিচির-মিচির।" পিটারের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল আর ফ্রাঁসোয়া এবং ওদেতের মুখে দেখা দিল ভ্রূকুটি। আমি জনের দিকে তাকিয়ে খালি বললাম: "ইংরিজী শুনলে ইংরিজী না-জানা বাঙালীরাও তাই মনে করে বোধহয়।"

বাংলা কবিতা আবৃত্তি আমি কেবল এখানেই করিনি, অন্য অনেক জায়গায় করেছি। ফরাসী শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া সব সময়ই একরকম, সব সময়ই তা বিশিষ্ট। আশ্চর্য এই জাতের কান। আর কবিতার বেলায় কান মানেই মন। একবার আমার আবৃত্তির পর এক মহিলা এসে জিগ্যেস করলেন যে-কবিতাটা পড়লাম তার প্রতি স্তবকে ক'টা ছত্র। আমি লেখাটার অনুলিপি বের ক'রে গুণতে যাব তার আগেই তিনি জানালেন, তাঁর ধারণা সাতটা। আমি যখন গুণে দেখলাম তাই, অবাক হ'য়ে গেলাম। তিনি বললেন আমার কবিতা পাঠের সময় ধ্বনি থেকে তাঁর ঐ ধারণা হয়েছিল, এখন ধারণাটা ঠিক জেনে তিনি খুশী। আর একবার এক ফরাসী যুবসঙ্ঘের মহিলা সেক্রেটারি এসে অনুরোধ করলেন, তাঁদের আসন্ন বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমি যদি দয়া ক'রে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করি। আমি যখন ইতস্তত ক'রে বললাম, তাদের শ্রোতৃমণ্ডলী বাংলা তো কিছু বুঝবে না, তিনি দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করলেন, তাতে কিছু আসে যায় না, তারা বাংলা কবিতার শব্দসঙ্গীতে অভিভূত হবে।

আমার চিত্রকর-বন্ধু আঁদ্রের প্রতিক্রিয়া তো সবার উপরে। আমি সেদিন বৃহৎ জন-সমাবেশে আবৃত্তি করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী'। প্রথমে ফরাসী ভাষায় কয়েকটি বাক্যে একটি সংক্ষিপ্তসার পাঠ। তারপর সেই সুদীর্ঘ কবিতার আবৃত্তি। আবৃত্তি যখন শেষ হল, মঞ্চ থেকে নেমে এসে আঁদ্রেকে জিগ্যেস করলাম, কেমন লাগল। উত্তরে সে বলল : "আমার স্ত্রীর জন্যে দুঃখ হচ্ছে, সে আসেনি, এমন একটা জিনিস সে শুনতে পেল না।" আমি বললাম : "কিন্তু ফরাসীতে মাত্র কয়েকটা কথা বলেছি। পুরো কবিতাটা তুমি বুঝতে পারোনি এই আমার মনস্তাপ।" আঁদ্রে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল : "না, পল, না, আমি প্রত্যেকটা ছত্র, প্রত্যেকটা শব্দ বুঝতে পেরেছি।" সন্দেহ প্রকাশ করলাম : "তা কি ক'রে হয় ?" বলল : "হ্যাঁ, তোমার চোখমুখ হাতের ভঙ্গি, তোমার কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়া প্রত্যেক শব্দ ও ছত্র আমার কাছে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। বাংলা কবিতা পড়তে আমাদের বাড়ি একবার তোমায় যেতেই হবে।" যেতে হয়েছিল আঁদ্রের বাড়িতে, তার স্ত্রীকে এবং সেই সঙ্গে তাকে ও কয়েকজন কবি-বন্ধুকে বাংলা কবিতা শোনাতে হয়েছিল।

কবিতা আবৃত্তি অবিশ্যি সব সময় আবৃত্তিতেই শেষ হয় না। সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। আমার পক্ষে করেছে। মোনিককে আমার বাংলা শেখাতে হচ্ছে। সপ্তাহে দু'দিন তাদের শিক্ষিকা-নিবাসে যেতে হয়। বাঙালী সংস্কৃতির এমন অনুরাগিণীকে ঠেকাই কোন্ প্রাণে ? কাল ছিল তাকে পড়ানোর দিন, নইলে এদের সঙ্গে যাওয়া যেত ফোলিব্যারঝ্যার-এ। এরা কয়েকজন গিয়েছিল, আমার যাবার উপায় ছিল না ব'লে আমাকে আর খবর দেয়নি।

লেগে গেল তর্ক ফোলিব্যারঝ্যার নিয়ে। গান কবিতা তো অনেকক্ষণ হয়েছে। ফ্রাঁসোয়াদের উদ্দেশ ক'রে ইম্‌রে বলল : "আহা, তোমরা ন্যাংটো মেয়েমানুষদের নিয়ে যা শিল্প বানিয়েছো, একেবারে স্বর্গীয় !"

ফ্রাঁসোয়ার মুখটা রক্তিম হ'য়ে উঠল। সে জবাব দিল : "ও সব

তোমাদের ব্যাপার। তোমরা বিদেশীরা প্যারিসে এসেই ওখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ো। ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো জীবনে কালই প্রথম ওখানে গেলাম।"

ম্যাক্স জোরালো গলায় জিগ্যেস করল: "আচ্ছা, মেয়েদের সামনের দিকটায় আধ বিঘৎ একটা আচ্ছাদন ছিল কেন?"

ইম্‌রে বলল: "তা বুঝলে না? ওটা হচ্ছে জ্ঞান বৃক্ষের পাতা। ফলটা যে খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে তারই প্রতীক।"

—"না থাকলে কী হত?" আবার ম্যাক্সের প্রশ্ন।

—'কিছুই হত না, ছবি আঁকতে হত।" মন্তব্য করল পিটার। "চিত্রকরদের আৎলিয়েতে মেয়ে মডেলরা শরীরের কোনো অংশই ঢাকে না।"

এবার আমি আলোচনায় মাথা গলিয়ে বললাম: "না, থানাপুলিস করতে হত। ফরাসী আইন-প্রণেতারা যথেষ্ট শিল্পরসিক। তাঁদের বিশ্বাস ঐটুকু আবরণ না-থাকলে দেখাবার মতো সচল শিল্প হয় না।" অতঃপর মন্তব্য করলাম: "কিন্তু এ নিয়ে তোমরা এত সব কথা বলছো কেন বুঝতে পারছি না। আমি ফোলিতে এর আগে গিয়েছি। আমাকে তো প্রত্যেকটি মেয়ের শরীর মুগ্ধ করেছে। কী সৌষ্ঠব, কী স্বাস্থ্য! বাছাই ক'রে ওদের নেওয়া। চোখের পক্ষে এমন প্রীতিকর দৃশ্য কমই হয়।"

জন এতক্ষণে মুখ খুলল: "কিন্তু একটা দৃশ্য আছে যেখানে একটা বেঁটে বুড়ো তার প্রাণের দুঃখ জানাতে গিয়ে কেঁদে ফ্যালে আর এক যুবতী তার স্তন দিয়ে বুড়োর চোখ মুছিয়ে দেয়। এটা কি শিল্প! জঘন্য!"

এলেনি তাকে সমর্থন ক'রে বলল: "অশ্লীল।"

আমি বললাম: "আবার সেই বস্তাপচা তর্ক। কোনটা শ্লীল, কোনটা অশ্লীল, কে রায় দেবে? অনেকখানিই তো নির্ভর করে যে ছাখে তার উপর। ঐ যে দৃশ্যটার জন উল্লেখ করল, ওটাকে তো বাৎসল্যরসের প্রকাশ হিসেবেও দেখা যায়। আমার বিশ্বাস,

দর্শকদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তিমান কেউ যদি থাকত, তাহলে ঐ দৃশ্য দেখে মা মা ব'লে কেঁদে ভাসাত।"

এই সময় ফ্রাঁসোয়া ব'লে উঠল: "কেন, পল, তোমাদের মন্দিরের গায়ে···"

আমি তাকে শেষ করতে না-দিয়ে বললাম: "সেই কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। তোমরা হয়তো কোনারক এবং অন্য প্রাচীন মন্দির-গাত্রের ভাস্কর্য-চিত্রণের কথা শুনেছো। হ্যাঁ, এ-সব অলঙ্করণ সাধারণ অর্থে নিশ্চয় শ্লীল নয়, বলতে পারো চরম অশ্লীল। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে তার জন্যে মন্দিরের কাছ থেকে বিতৃষ্ণায় ফিরে আসতে দেখিনি বা শুনিনি। তাছাড়া, ও-সব কেন ধর্মস্থানে খোদাই করা হল, তার নানারকম ধার্মিক ব্যাখ্যাও আছে। কাজেই এ তর্কের কোনো মীমাংসা নেই, চুপ ক'রে থাকাই ভালো।"

মন্দির-গাত্রের মূর্তিগুলো বাস্তবিক খুব মুখর। তারা কিন্তু কখনো আমার কানে ধর্মকথা বা দর্শনতত্ত্ব বলেনি। এইসব প্রাচীন মন্দির যারা দেখতে যায়, তারা তো আমারই মতো মানুষ, কামনা-বাসনায় ভরা সাধারণ মেয়েপুরুষ। দার্শনিক ব্যাখ্যার বর্ম প'রে তো তারা যায় না। কিংবা বিজ্ঞ শিল্পরসিকের দৃষ্টি নিয়ে। তাহলে তারা কী চোখে ছাখে মূর্তিগুলোকে এবং দেখে তারা কী ভাবে? মনে পড়ে একবার আমি গিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয়ের সঙ্গে কোনারকে। মন্দিরের একেবারে কাছে গিয়ে পৌঁছতেই চোখে পড়ল সেই সব আশ্চর্য জীবন্ত মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেউ কাউকে কিছু না-ব'লে আপনা থেকেই দু'দলে ভাগ হ'য়ে দুই পথে চ'লে গেলাম। এক পথে আমি ও আমার বন্ধুরা, অন্য পথে আমাদের দিদি বৌদি মাসীরা। সকলেই সব দেখেছিল; কিন্তু একসঙ্গে ফেরার সময় বা পরে সে-সম্বন্ধে একটি কথাও কেউ প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেনি। মেয়েরা দেখে কী ভাবে আমার জানতে কৌতূহল হয়। কিন্তু আমি জানি তা কিছুতেই জানা যাবে না। কোনো মেয়ে কি স্বামীর কাছেও মনের সব কথা বলে, বলতে পারে?

জনদের বাড়ির কঁসিয়েঝ এসে ভদ্রভাবে সময়টা জানিয়ে গেল। অনেক রাত হয়েছে। এবার সভা ভাঙার পালা। শুনলাম ক্লারা দু'দিন বাদে জার্মানীতে ফিরে যাবে। ম্যাক্স থাকবে আরো কিছুদিন। পিটার আমাকে হঠাৎ জানাল সে এক সপ্তাহের মধ্যেই প্যারিস ছেড়ে জেনিভায় পাড়ি দিচ্ছে। সেখানে সাংবাদিকের কাজ পেয়েছে। এখন তার চাকরি করা দরকার। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

৪

এলেনি গ্রীসের মেয়ে। ক্ষীণাঙ্গী, কিন্তু রোগা বললে তার শরীরকে অপমান করা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেশ একটা পরিপূর্ণতা আছে; সরু কোমর সেটা যেন আরো ফুটিয়ে তুলেছে। পাৎলা ঠোঁট, খাড়া নাক আর টানটান কপালের জন্যে তার মুখটা এক-এক সময় মনে হয় যেন তীক্ষ্ণ রেখায় আঁকা একটা ছবি। ঠোঁট দুটো যদি একটু পুরু হত আর নাকটা যদি অত চিকন না হত, তাহলে ঐ কপাল নিয়েও তার মুখ গ্রীক মূর্তির মতো দেখাত। কথাটা একদিন এলেনিকে সাবধানে বলেছিলাম। সে উত্তর দিয়েছিল: "না-দেখাক স্ট্যাচুর মতো, জ্যান্ত মানুষের মতো দেখায় তো। তাহলেই হবে।" তারপরই জিগ্যেস করেছিল: "কেন, এই রক্তমাংসের নারীটিকে তোমার বুঝি ভালো লাগে না?"

হঠাৎ তার এই প্রশ্নে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তবে সাম্‌লে নিতে দেরি হয়নি: "তা তুমি গ্রীক মেয়ে, স্ট্যাচুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?"

এলেনি কাটাকাটাভাবে জবাব দিল: "স্ট্যাচুর সঙ্গে না-মিললে বুঝি গ্রীক হল না। খোদাই-করা স্ট্যাচুর মতো না-হই, এই যে জার্মান ফরাসী মার্কিন ইংরেজ মেয়েগুলোকে দেখে থাকো, তাদের মতনও তো নই।" তারপর একটু থেমে বলল: "মোটেই কি

বোঝা যায় না আমি অন্য জাতের মেয়ে? জানো বোধহয় আমরা এদের সভ্যতা দিয়েছিলাম।"

ও, জাতের অহঙ্কার! তুমি আর কী অহঙ্কার দেখাচ্ছো, এলেনি, আমি মনে মনে বলেছিলাম, আমি ভারতীয়, অহঙ্কারের প্রতিযোগিতায় তুমি আমার কাছে হেরে যাবে। ভারতের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আমি তোমাকে এমন বক্তৃতা ঝাড়তে পারি যে তোমার ভিরমি লেগে যাবে। তোমার দুর্ভাগ্য, এ যাবৎ কোনো ভারতীয়ের মুখ থেকে তা শোনোনি। সেই ঐতিহ্য ও অবদানের ফিরিস্তি শুনলে তুমি অধোবদন হতে, অন্তত আমার সামনে জাঁক করতে না। অবিশ্যি এখন আমাদের অবস্থাটা একটু ঝামরে গিয়েছে। সে তো তোমাদেরও গিয়েছে। তাছাড়া, বাইরের কাজ-কারবার দেখে কিছু বিচার করতে যেয়ো না। আমরা মনে করি ভেতরটাই আসল। তা যদি না-হত, তাহলে পুলিসের দারোগা কি কখনো চুপিচুপি গুরুর কাছে মন্তর নিত, না, তাঁর পাদোদক খেত?

এরপর একদিন আমি আমাদের আড্ডাস্থলে পৌঁছে এলেনিকে একটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলাম। ভণিতা দিয়ে শুরু করলাম: "জানো এলেনি, আজ আমি ভীষণ গর্বিত।"

ও জিগ্যেস করল: "গর্বের কারণটা জানতে পারি কি?"

—"কারণ", আমি জবাব দিলাম, "এক ব্যক্তি আমাকে আজ গ্রীক মনে করেছে।"

—"কি রকম?"

—"আজ আমি যখন গে-লুসাক রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ফরাসী ব'লেই মনে হল, আমাকে জিগ্যেস করলেন: 'এই অঞ্চলে একটা চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে, সেটা কোথায় বলতে পারেন কি?' আমি জানতাম, সুতরাং ব'লে দিলাম। কিন্তু তিনি তক্ষুনি গেলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, বললেন। তিনি আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন আমার দেশ পূর্বাঞ্চলে। আমি সায় দিলাম। তখন তিনি সোৎসাহে

আমার দেশের শিল্পসাহিত্যের গুণকীর্তন শুরু করলেন। নাম শুনলাম মাইকেল এঞ্জেলো, দান্তে, দা ভিঞ্চির। বুঝলাম, তিনি ভেবেছেন আমি ইতালীয়। তখন আমি সবিনয়ে জানালাম, আমি ইতালীর লোক নই। তাতে তিনি মোটেই অপ্রস্তুত হলেন না। বরং জোর দিয়ে বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, আপনি আরো পূবের।' ব'লেই তিনি আবার আমার দেশের ভাস্কর্য নাটক মহাকাব্য ইত্যাদির প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হলেন। আবার নামোল্লেখ। বুঝলাম, এবার তিনি ধ'রে নিয়েছেন আমি গ্রীক। কিন্তু এবার আমি তাঁর ভুল ভাঙলাম না।"

এলেনি জিগেস করল, কেন?

—"কেন? যেহেতু তিনি আমাকে গ্রীক ভেবে জাতে উঁচু ক'রে দিলেন। এমন মহত্ত্ব যখন ফোকোটে জুটে গেল, ছাড়ব কেন? হাঙ্গারি-টাঙ্গারি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু গ্রীস যে আমার স্বপ্ন। আমার কী সৌভাগ্য লোকে আমায় ভুল ক'রেও গ্রীক ভেবেছে। তাই তোমার একজন কল্পিত দেশবাসী হিসেবে আমার গর্বের কথাটা তোমাকে শোনাতে ছুটে এলাম।"

এলেনি বিরক্ত হয়েছিল, না, কৌতুক বোধ করেছিল বুঝতে পারিনি। মন্তব্য করেছিল: "তুমি খুব রসিক হয়েছ, পল।"

আর ফরাসীরাও বেশ। যাকে-তাকে ইতালীয়, গ্রীক, ফরাসী ধ'রে নিলেই হল। ফ্রান্সের দক্ষিণ থেকে কোনো লোক হয়তো এসেছে প্যারিসে, পথঘাট ভালো চেনে না, রাস্তায় আমাকেই হদিস জিগেস করল ফরাসী মনে ক'রে। অবিশ্যি আমার কথা শুনে তার ভুল ভাঙতে নিশ্চয় দেরি হয় না, তবে তার মুখ দেখে তা বোঝা যায় না। আর আমি ইত্যবসরে কিছু আত্মপ্রসাদও অনুভব ক'রে নিই, কারণ তার কথায় ফরাসী-বাঙাল টান!

কাউকে ফরাসী মনে করতে এদের বাধে না। ফরাসী সাম্রাজ্যের সব লোকই ফরাসী, এই নীতির জন্যে বোধহয়। এবিষয়ে এরা ইংরেজের উল্টো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তোমাকে সমঝে দেবে

তুমি তার আশ্রিত দাস। আর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। তা আজকাল একটু গোলমাল বাধে। অত পিতৃস্নেহ সবাই সহ্য করতে পারে না। এই সেদিন যেমন পারল না আলজিরীয় ছাত্র মহম্মদ খেরাউন।

খেরাউন এসেছে প্যারিসে ডাক্তারী পড়তে। আলজিরিয়ার ফরাসী ইস্কুলে সে ছোটবেলা থেকে পড়েছে, চোস্ত ফরাসী বলে। প্যারিসে এসে সে যখন ছাত্র-তত্ত্বাবধায়কের দপ্তরে নাম রেজিস্ট্রি করাতে গেল তাকে ওরা একটা ফর্ম ভরতি করতে দিল। ফর্মে যেখানে জাতিত্ব লিখতে হবে, সেখানে ও লিখে দিল, আলজিরীয়। মহিলা সেক্রেটারী দেখে বললেন : "এখানটায় ফরাসী লিখতে হবে, আপনি ভুল করেছেন।" খেরাউন জবাব দিল : "আমি ভুল করিনি। আমার জাতিপরিচয় যা তাই লিখেছি।" সেক্রেটারী সাহেবা আবার বললেন : "ওখানটায় ফরাসীই লিখতে হবে।" খেরাউনের জবাব : "আমি আলজিরীয়, ফরাসী লিখতে যাব কেন ?" মহিলার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আরক্ত হল, বললেন, নিয়ম অনুসারে তাই লেখা আবশ্যক। খেরাউন বলল : "না, তা লিখব না।"

আমি খেরাউনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ভারতীয় কানে এ কথোপকথন যেন মধুবর্ষণ করছে। অতঃপর সেক্রেটারী সাহেবা পাসপোর্ট নিয়ে সেটা খুলে দেখালেন, এই তো লেখা আছে ফরাসী। খেরাউন জবাব দিল : "তা থাকতে পারে, তবে আমি আলজিরীয়।" সেক্রেটারী চেপে ধরলেন : "কিন্তু পাসপোর্টে তো লেখা ফরাসী। সেটা কী ?" উত্তর : "পাসপোর্ট আমি লিখিনি। যারা লিখেছে তারা ভুল করেছে। তাদের ভুলের জন্যে আমি দায়ী নই।" আবার দাবী : "না, ওতে যা আছে আপনাকে তাই লিখতে হবে।" আবার জবাব : "নিশ্চয় না, মিথ্যে কথা আমি লিখব না।" সুর চড়তে লাগল, ভিড় জমতে শুরু করল। তখন অন্য করণিকরা এসে ব্যাপারটা মেটালেন। অর্থাৎ খেরাউনের লেখাই মেনে নেওয়া হল, যদিও পাসপোর্টে রইল অন্যরকম।

ফরাসীরা দেখি কালাধলা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এর মূলে, কি তাদের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ, না, ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য? কি জানি। কিন্তু প্যারিসের রাস্তায় কালা নিগ্রোর সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে ধলা ফরাসিনী যখন আমার সামনে দিয়ে চ'লে যায়, আমি শিউরে উঠি। ভারতীয় শহরের রাস্তা যদি হত আর সঙ্গিনীটি যদি হত ভারতিনী, তাহলে হয়তো নিগ্রো চামড়াটি খুলে নেওয়া হত। বিয়ের বিজ্ঞাপনে ফর্সা মেয়ের জন্যে যে-রকম গণদাবী থাকে, তাতে কি ক'রে বলি বর্ণবিদ্বেষে আমরা মার্কিনীদের ছাড়িয়ে যাই না? এ রকম প্রকাশ্য অনাচার কি আমরা সহ্য করতে পারতাম?

এলেনির চোখ দুটো আমি মাঝে মাঝে লক্ষ করি এবং কেমন একটা বিভ্রান্তি বোধ করি। এক-এক সময় তার চোখে যেন ঈজিয়ান সাগরের রোদ-ঝলমল জলের প্রতিবিম্ব। আবার সেই চোখে অকস্মাৎ এক সময় বরফের শীতলতা। আড্ডার মধ্যেও কতবার এই রকম দেখেছি। তখন মনে হয় এলেনির চোখ যেন হিসেব করতে শুরু করেছে। জনের দিকে, জনের বন্ধুদের দিকে সে ঠাণ্ডা ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে। যেন হিসেব করছে কখন কোথায় জনের মুখের লাগামে টান দেবে। যেন হিসেব করছে কার কাছ থেকে কী আদায় করবে। আমার কাছেও কি ও কিছু আদায় করতে চায়? কী? আমার বড় অস্বস্তি লাগে এই সময়। এতদিনেও এ অস্বস্তি গেল না।

হিসেব মেয়েরা অবিশ্যি একটু-আধটু ক'রেই থাকে। ওদেৎ কি আর করে না? তাকে লক্ষ করলেও সেটা বোঝা যায়। কিন্তু সে-হিসেবটা অন্য জাতের মনে হয়। স্বামীকে অপাগণ্ড প্রমাণ করতে, পোশাক গয়না আদায়ের ফাঁক খুঁজতে, স্বামীর বন্ধুদের আলগোছে খেলাতে যে-হিসেবের দরকার হয় তাই। আমি ভাবি এলেনি যদি আমাকে 'লাশ' বলত, তাহলে কিভাবে বলত। মনে হয়, বলত দাঁতে দাঁত চেপে, ওদেতের মতো স্নিগ্ধ হাসি মাখিয়ে নয়।

এলেনি কিন্তু আশ্চর্য নাচতে পারে। জনও খুব ভালো নাচে। যৌথ নৃত্যের অনুষ্ঠানে ওরা দু'জনে যখন নাচে তখন অন্যদের নাচ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সকলের দৃষ্টি ওদের উপর পড়ে। এলেনির শরীরটা ঔজ্জ্বল্য আর লাবণ্যের কতরকম রেখাচিত্র যে তৈরি করে তার ঠিক নেই। নাচ ওর এবং জনের এত স্বাভাবিকভাবে আসে যে তার জন্যে কোনো প্রস্তুতির বা কোনো আয়োজনের দরকার হয় না। ওরা এক-এক সময় রাস্তাঘাটেও নাচ আরম্ভ ক'রে দেয়। এই তো কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমরা ট্রেনে ক'রে শহরতলিতে যাব বিকেলে, প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছি, ট্রেনের দেরি আছে। এলেনি ব'লে উঠল: "এসো, নাচা যাক।" অম্‌নি জনের সঙ্গে ওর নাচ শুরু হ'য়ে গেল প্ল্যাটফর্মে। ফরাসীরাও রসিক। তারা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বাহবা দিতে লাগল। বাহবা দেবার মতোই বটে! কী ছন্দলয়, কী গতিময় দেহভঙ্গি! এলেনি যখন নাচে, তখন ও যেন আমার চোখে সম্পূর্ণ বদ্‌লে যায়। তখন আমি ওর মুখ দেখতে পাই না, মনে হয় আমার সামনে এক আলোর বিচ্ছুরণ এবং আমি এক পতঙ্গ। যখন ও নাচে না তখন ওর মুখের দিকে তাকালে আমার ভালো লাগে না।

আমি কখনো কখনো এলেনির মুখের জায়গায় অঞ্জলির মুখটা বসিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু গোলমাল হ'য়ে যায়। আমার ইচ্ছে থাকে, এলেনির মুখটা ঐ রকম বুঝবার মতো সহজ হোক, ঐ রকম স্বচ্ছ হোক। কিন্তু জন-এলেনির সম্পর্ক এবং আমার-অঞ্জলির সম্পর্ক এক পর্যায়ের ব'লেই কি আর এই ধরনের ওলটপালট ক'রে কিছু মেলানো যায়? অঞ্জলি যদি আমার সঙ্গে এখানে আসত, তাহলে এই মেলাতে যাওয়ার দরকারই হত না। তখন কি আর এলেনির মুখ আমি ভাবতাম?

অঞ্জলি কি ক'রে আসবে আমার সঙ্গে? আমাদের তো অত টাকা নেই। তাছাড়া বিয়ে না ক'রে আসার কোনো প্রশ্নই ছিল না। এদের ওসব অসুবিধে নেই। এলেনি পড়তে গেল আমেরিকায়,

ভাব হল জনের সঙ্গে, একসঙ্গে চ'লে এল ফ্রান্সে। এবার বিয়ে করবে। আমি তো অঞ্জলিকে বিয়ে ক'রেই আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অঞ্জলি রাজী হয়নি। বলেছিল: "তুমি ফিরে এস, তখন যা করবার করা যাবে।" অথচ বাঙালী বাপ-মা তো বিয়ে দিয়েই ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্য অবিশ্যি পুত্রের চরিত্র রক্ষা নয়; উদ্দেশ্য, বিদেশিনীকে পুত্রবধূ রূপে ঘরে না-আনা। অঞ্জলি রাজনীতি-করা মেয়ে। সে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছে। কেন সে মনকে চোখ ঠারবে? অন্য মেয়েকে আমার বিয়ে করা আর শয্যাসঙ্গিনী করা তার কাছে একই। অঞ্জলি বোধহয় আমার অগ্নিপরীক্ষা চায়। শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সীতার প্রতিশোধ, বিয়ে ক'রে নয়, বিয়ের আগেই। ওহে শ্রীরামচন্দর, তোমায় হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

৫

রাতটা ছিল পূর্ণিমার। ম্যাক্সের হোটেলের জানলা দিয়ে চাঁদ দেখতে পেয়েই আমরা পাগল হ'য়ে গেলাম। একেবারে চন্দ্রাহত। তক্ষুনি নৈশ আড্ডা ভেঙে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। জন, এলেনি, পিটার, ম্যাক্স এবং আমি। জেনিভা যাত্রার আগে প্যারিসে সেটাই পিটারের শেষ রজনী। আমরা সবাই সমস্বরে বললাম: চলো, জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তখনি সন্দেহ হল, জ্যোৎস্না কি দেখা যাবে রাস্তায়। এলেনি বলল: "আমরা গাছের তলা দিয়ে যাব যেখানে বিজ্‌লি আলো আড়ালে পড়ে। পাতার ফাঁক দিয়ে নিশ্চয় কিছু জ্যোৎস্না পাব।" ম্যাক্স তুলে নিল তার গিটার, আমাদের বলতে হল না। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সেন নদী পার হ'য়ে রু্য দ্য রিভোলি ধ'রে আমরা পৌঁছে গেলাম প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ। তখন রাত হয়েছে বেশ। অবিশ্যি ঘড়ির হিসেবে। প্যারিস তো লণ্ডন নয় যে আটটা বাজতে না-বাজতেই

সব শুমশাম। আটটার পর থেকেই তার জোয়ার শুরু। কেবল ভরশীতের সময়টা ভাটার টান লাগে। প্যারিসে রাতের খাওয়ার পরই সিনেমা থিয়েটার কনসার্টে যাওয়া, বেড়াতে বেরোনো, এমনকি সভায় যোগদান। আমরাই তো সম্প্রতি সাল্ প্লেইয়েল-এ শান্তি-সম্মেলন দেখে এসেছি রাত্তির বেলায়।

কঁকর্দ থেকে আমরা শাঁজেলিজে সরণির দিকে এগিয়ে চললাম। কি আশ্চর্য, এ যে কোজাগরী পূর্ণিমা! গাছের উপর রূপোলি ঢল দেখে, আকাশে চাঁদের রূপ দেখে আপনা থেকেই মনে হল। অনেক দিনের চেনা একটা রাত যেন হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে চিনতে না-পারা কি সম্ভব? বাড়িতে পঞ্জিকা নেই, বাংলা কাগজও পাই না, বাংলা মাসের খেয়ালও করি না। তবু টের পেলাম এ সেই বাংলাদেশের পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হিসেব ক'রে মনে মনে বললাম: হ্যাঁ, আজ কোজাগরী।

শাঁজেলিজের সমস্ত কৃত্রিম আলো যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে। গাছের ডালপাতা বেয়ে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেয়ে, হাওয়া থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জ্যোৎস্না গ'লে পড়ছে রাস্তার ধুলোর উপর। আমরা আপনা থেকেই একসঙ্গে তরুবীথির নিচে রাস্তার ধারে মাটির উপরে ব'সে পড়লাম। ম্যাক্স গিটার বাজাতে আরম্ভ করল। তার যন্ত্রের কাঁপা স্বর মন্থরভাবে ঘুরতে লাগল। কখনো গুঞ্জন, কখনো দূরের আহ্বান।

সামনের শাঁজেলিজে তরঙ্গসঙ্কুল হ'য়ে উঠেছে। আমি বুঝি ভৈরব নদের তীরে ব'সে আছি। আমি এবং আমার কৈশোর-সঙ্গীরা। আমরা বাড়ি থেকে পালিয়েছি। বোম্বাইতে গিয়ে ছবির নায়ক হবার জন্যে নয়। তখন আর কোথায় ছিল এই ফিল্মী রাজধানী এবং অমুককুমার তমুককুমারের জৌলুষ আর তারকাদের জ্বলজ্বলে হাতছানি? না, তা, নয়। আমরা পালিয়েছি দেশভ্রমণের ঝোঁকে। মাত্র দিন তিনেকের প্রোগ্রাম। ঠাকুমাকে গিয়ে বললাম, খুলনায় বেড়াতে যাব। বাবা-মা উপস্থিত নেই, এই যুক্তিতে ঠাকুমা

তা নাকচ ক'রে দিল। অতএব পলায়ন। রাত্তিরে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেনে চেপে বসেছি। বিনে টিকিটে। সকালে খুলনায়। দিনভর হট্টি হট্টি ক'রে বেড়ানো। সন্ধের পর ভৈরবের ধারে এসে ব'সে পড়েছি ঘাস-মাটির উপর। উঃ, কী জ্যোৎস্না! আমি জ্যোৎস্নার ঢেউ দেখছি, জ্যোৎস্নার শব্দ শুনছি। ভৈরব বুঝি অর্ধনারীশ্বর। হঠাৎ তার মোহিনী মূর্তি আমার দিকে ঘুরেছে। তার অসংবৃত যৌবন ঝল্‌কে উঠেছে আমার সামনে। আমি নিশ্চল হ'য়ে আছি, শুধু আমার নিশ্বাসের ওঠাপড়া টের পাচ্ছি। কী ভাবছিলাম আমি তখন? আমার কিশোর বয়সের ভাবনা পরিষ্কার কিছুই মনে পড়ে না। পরিষ্কার কি কিছু ছিল? চেতনায় শুধু এইটুকু আছে যে, এক জট-পাকানো অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। জীবনের সঙ্গে লিপ্ত থেকেও আমি আলাদা হ'য়ে গিয়েছি, এই মাধুর্যের মুহূর্ত এক অনিশ্চয়তার শূন্যে দুলছে, এইরকম একটা অনুভূতি। কতক্ষণ বিভোর হ'য়ে ছিলাম জানি না, সুজনের ডাকে চমক ভাঙল: "এই পলাশ, এবার ফেরা যাক। একটু ঘুমিয়ে না নিলে চলবে না। কাল ভোরেই নদী পার হ'য়ে বাগেরহাট যেতে হবে।"

সুজন ছিল, মতি ছিল। বীরেনদাও ছিল। কিন্তু ছিল না মানিকদা। কি ক'রে থাকবে? আমাদের যাত্রা যে রাত্তিরে। হোক না শুক্লপক্ষ, তবু তো রাত্তির। মানিকদার যত বীরত্ব সন্ধে পর্যন্ত। গাছে চড়া, সাঁতার, মারামারি, সব কিছুতে সে দুর্ধর্ষ ততক্ষণ যতক্ষণ দিন থাকে। মহীরাবণ যেমন মাটি ছুঁলেই পরাক্রান্ত হত, মানিকদা তেমনি বীর হ'য়ে উঠত রোদ ছুঁলে। কিন্তু সন্ধে নামলেই মানিকদা শিশু। তখন তার ভীষণ ভূতের ভয়। বাড়ি থেকে এক-পা বেরোতে চায় না। দল বেঁধে ফলমূল চুরির লোভে অবিশ্যি কখনো কখনো বেরোত, তাও দিনের আলো একেবারে না থাকলে রাজী হত না।

একবার তাকে কী ভয়ই না পাইয়েছিলাম আমরা। একবার

মানে সেই শেষবার। তারপর দল আর কতদিনই-বা ছিল? নিজেদের মধ্যে সড় ক'রে বিকেলবেলায় তাকে গিয়ে আমরা বললাম: "চলো, গ্রামের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি। সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব।" সে সরল বিশ্বাসে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। গল্পে গল্পে আমরা অনেকখানি পথ পেরিয়ে এক গ্রামে পৌঁছলাম। তখন সূর্য ডুবুডুবু। গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারে এক প্রকাণ্ড দীঘি। জল টলটল করছে, অনেক উঁচু পাড়। জল দেখলে মানিকদা আর স্থির থাকতে পারে না, ছোঁবার জন্মে আকুলি-বিকুলি করে। দীঘি দেখেই বলল: "তোরা একটু দাঁড়া, আমি মুখ-হাত-পা ধুয়ে আসি।" ব'লেই নেমে গেল। আমরা এই সুযোগই খুঁজছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দৌড় দিলাম। নিঃশব্দে। দৌড়তে দৌড়তে মাইল খানেক দূরে শহর আর শ্মশানের মাঝখানের পাকা রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মানিকদা আর আসে না। তখন মানিকদার জন্মে আমার কষ্ট হতে আরম্ভ করল। হয়তো সে ভীষণ ভয় পেয়েছে, হয়তো অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছে। কিংবা মানিকদা হয়তো কাঁদছে। মানিকদার কান্না কল্পনাতেও কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, তবু আমার নিজেরই কান্না পেতে লাগল। এমন সময় দূরে গ্রামের দিক থেকে একটা লণ্ঠন দুলতে দুলতে আসছে দেখা গেল। আরো কাছে এলে ঠাওর হল তিনজন লোক। তারা আরো কাছে আসতে গলার স্বর শোনা গেল, একটা মানিকদার। মানিকদা গাঁয়ের লোক জোগাড় ক'রে তাদের পাহারায় বাড়ি ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে দ্রুত পরামর্শ। কোথায় গেল আমার কষ্ট! ঠিক হল বীরেনদা উঠে যাবে রাস্তার ধারে গাছের মাথায়। সেখানে সে ভূত হ'য়ে থাকবে। আমরা অন্ধকারে গাছের পেছনে লুকোব।

লণ্ঠন নিয়ে তিনজন পাকা রাস্তায় এসে উঠল। তারা বড় গাছটার তলা দিয়ে যাওয়ার সময় উপর থেকে আওয়াজ এল: "এঁই

তোঁর্‌া কোঁথ্‌ঁায় যাঁচ্ছিঁস ?” অম্‌নি “ওরে বাবারে” ব’লে মানিকদা সঙ্গী দু জনকে জড়িয়ে ধরল। তারা এক মুহূর্ত থম্‌কে গিয়েছিল, কিন্তু তক্ষুনি চমক কাটিয়ে বলল : “বাবু, ও নিশ্চয় আপনার বন্ধুদের কেউ। আচ্ছা, কি রকম ভূত আমরা দেখছি।” এই ব’লে তারা ঢিল কুড়িয়ে উপরে ছুঁড়তে লাগল। দুটো ঢিল ছুঁড়তেই বীরেনদা চেঁচিয়ে উঠল : “ঢিল মেরো না, আমি নামছি।” নেমে এল বীরেনদা, আমরাও আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। গাঁয়ের লোক দু’জন হেসে অস্থির। আর মানিকদার সে কী অভিমান, তার প্রতি বন্ধুদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তার কল্পনাতীত ছিল। হায় মানিকদা, তোমার কল্পনা যে কত ছোট ছিল তার আরো প্রমাণ পেতে তোমার দেরি হয়নি। কারণ আমাদের নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ভাঁড়ার তখনো ফুরোয়নি।

আমরাই মানিকদাকে বাড়ি পৌঁছে দেব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাঁয়ের লোক দুটিকে বিদায় করলাম। তারা চ’লে যেতেই আমরা বললাম, আমরা শ্মশানে যাব। মানিকদা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানাল, সে যাবে না। ও, তাহলে সে একা বাড়ি ফিরুক। দুটোই মানিকদার পক্ষে সমান কঠিন, প্রায় অসম্ভব। আমরা শ্মশানমুখো হাঁটা দিলাম। মানিকদা আমাদের গা-ঘেঁষাঘেষি ক’রে চলল আর বাড়ি ফেরার জন্যে অনুনয় করতে লাগল। তার গলা কাঁপছে। কিন্তু আমরা তার কথায় কর্ণপাত করছি না, যদিও তার জন্যে তখন আমার আবার কষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। এরপর মানিকদা এমন এক কাণ্ড ক’রে বসল, যা তার কাছ থেকে আমরা স্বপ্নেও প্রত্যাশা করতে পারতাম না। সে হঠাৎ নিচু হ’য়ে বীরেনদার পা দুটো জড়িয়ে ধরল, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল : “তোরা আমায় বাড়ি পৌঁছে দে।” আমরা ফিরলাম। আমাদের নিষ্ঠুরতার পুঁজি ফুরিয়ে গিয়েছে। সারা পথ মানিকদা চুপচাপ। বাড়ির দরজায় পৌঁছে আমাদের দিকে ফিরে শুধু বলল : “কোন্‌ শালা আর তোদের সঙ্গে বেড়াতে যায়।”

বেড়াতে মানিকদা আর যায়নি। কিন্তু আমাদের সে

ভালোবাসত। নিজের বিয়ের সময় জেদ ধরেছিল আমাদের সকলকে তার সঙ্গে বরযাত্রী যেতে হবে, নইলে সে বিয়ে করবে না। অবিশ্যি তার শেষের কথাটা আমরা বিশ্বাস করিনি। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই যখন সে বিয়ের সিদ্ধান্ত করেছে, তখন আমরা না গেলে সে বিয়ে করবে না কেন? এ তো একেবারে অযৌক্তিক কথা। যাই হোক, তার মধ্যে বন্ধুত্বের একটা আবেগ যে জীবন্ত রয়েছে তা টের পেয়েছিলাম। কিন্তু মানিকদা যখন নিজের বিয়ের খবরটা দিল, আমরা আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলাম। মানিকদা বর সেজে একটা মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসবে, এটা তার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। আমরা আরও আশ্চর্য হয়েছিলাম তার মুখটা দেখে। মুখে কেমন লজ্জা-লজ্জা ভাব। গেছুড়ে, সাঁতারু, লড়ুয়ে মানিকদার সঙ্গে এটা মেলাতে পারিনি। যেমন তার আগে পারতাম না দিনের মানিকদার সঙ্গে রাত্তিরের মানিকদাকে মেলাতে।

মানিকদা বিয়ে করবে শুনে আমরা প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়ে হৈচৈ ক'রে উঠেছিলাম। ফূর্তি দেখিয়ে নানান্ মন্তব্য করেছিলাম। কিন্তু সত্যি কি আমরা খুশী হয়েছিলাম? মানিকদা চ'লে গেলে আমরা সবাই গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলাম, নিজেদের মধ্যে বেশী কথাবার্তা আর বলিনি। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল মানিকদা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার এটা প্রতিশোধ নাকি?

জনের ডাক কানে এল: "পলাশ, তুমি যে একেবারে মস্ত্ হ'য়ে গিয়েছ। মাথায় কবিতা এসেছে বুঝি। ওঠো, হাঁটা যাক।" আমরা উঠলাম। চাঁদের আলোয় প্যারিসকে অচেনা লাগছে। অচেনা কিন্তু খুব আপনার। ঘরবাড়ি লোকজনগাড়ি সব মুছে গিয়েছে। আছি শুধু আমরা ক'জন আর আমাদের সামনে অনন্তকাল ধ'রে হাঁটবার পথ। উধাও শাঁজেলিজের মাঝখানে আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ম্যাক্সের গিটার। জন আর এলেনি অমনি

হাত ধরাধরি ক'রে নাচ শুরু করল। দীর্ঘ নাচ নয়, গিটারের ছোট ছোট সুরের সঙ্গে টুকরো টুকরো নাচ। নানান ছন্দে। একটু থামা আবার হাঁটা। অবশেষে পৌঁছে গেলাম আর্ক-দ্য-ত্রিয়ঁফ-এর গোড়ায় এতোয়ালে। এই নক্ষত্র থেকে আর কোনো নক্ষত্রে আমরা যেতে পারব না।

জ্যোৎস্না চিরে মেয়েলি কণ্ঠস্বর আমাদের হুঁশ ফিরিয়ে আনল। এলেনি এখন বাড়ি ফিরতে চায়, তার অভ্যস্ত হোটেলে। তার সঙ্গে আমরাও ফিরব যে যার ডেরায়। পিটার এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার আমার দিকে ফিরে বলল: "পলাশ, পারো তো কাল একবার এসো আমার ওখানে। কাল বিকেলে আমি চ'লে যাব।"

৬

ইরেনদের বাড়ি থেকে বেরোতে অনেক রাত হয়েছিল। বাইরে এসে টের পেলাম কী প্রচণ্ড শীত পড়েছে। হেঁটেই ফিরলাম আমার ডেরায়, ট্যাক্সি পাওয়া তখন শক্ত। এত ঠাণ্ডা যে হাঁটা বলতে যা বুঝি তার জো নেই, সারা রাস্তা আমাকে দৌড়োতে হল। তীব্র শীতের সময় তাই করতে হয় সকলকে। ভূগর্ভ ট্রেন থেকে বেরিয়ে বা গরম বাস থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত সবাই ছুটে চলে। একটু আস্তে চললেই ঠাণ্ডা একেবারে জাপটে ধরে। দেখা যায়, রাস্তায় যত লোক সব দৌড়োচ্ছে। একবার গিয়েছিলাম কলঁব্ স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে। ফ্রান্স আর স্পেনের মধ্যে ফুটবল ফাইনাল। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের হাত ঘষা শুরু হল। নইলে হাত ঠাণ্ডায় কনকন করে। সূর্য যখন আরো চলল, তখন আরম্ভ হল পা দাপানো। কারণ পা বেয়ে তখন ঠাণ্ডা উঠছে। তাতেও বেশীক্ষণ কুলোল না। অতঃপর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল খেলার মাঠ ঘিরে হাজার তিরিশেক লোক একসঙ্গে নাচছে। নাচতে

নাচতেই 'সাবাস সাবাস' 'হায় হায়'। এমন লোকনৃত্যের দৃশ্য তার আগে কখনো দেখিনি। আমার মতো আনাড়ী মানুষও তাতে ভিড়ে পড়েছিল।

ঠাণ্ডা যে এমন বাড়বে তা আমার অনুমান ছিল। কিন্তু ইরেন-দের তাতানো ঘরের মধ্যে ব'সে গল্পের মৌজে সেটা আর মনে ছিল না। দু'দিন আগে তুষারপাত হয়েছে। আকাশ থেকে পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়তেই গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে ছুটে গিয়েছি বাইরে, আপাদমস্তক সাদা হ'য়ে বাড়ি ফিরেছি। আগের বছরগুলোতেও তাই করেছি। ছোটবেলায়, এমনকি বড় হ'য়েও, প্রথম বৃষ্টি পড়লে যেমন করতাম। বৃষ্টিই পড়ুক আর তুষারই ঝরুক, হৃদয় ময়ূরের মতো একই রকম নেচে ওঠে। এ বড় আশ্চর্য। আকাশ এবং মাটির মধ্যে আমি যেন এক সংযোগ হ'য়ে যাই। আমার শরীরের রস আর রক্তের প্রবাহ ধ'রে তাদের ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়। অথচ তুষার তো বৃষ্টির বিপরীত। তাতে অঙ্কুর গজায় না, চাপা পড়ে। শীতের পর যে বসন্ত, এই বোধটা হয়তো সক্রিয় হয়। তুষার পড়তে বুঝেছিলাম ঠাণ্ডা এবার বাড়বে, তুষারের বাসা তাপযন্ত্রের একেবারে নিচে নয়। দু'দিন পরের প্রভাতী কাগজে দেখলাম তাই। তাপ হিমাঙ্কের নিচে আটে নেমে গিয়েছে। রাত্তিরে নিশ্চয় তা আরো নেমেছে। শূন্য ডিগ্রীর নিচে নামলে আমি এমনিতেও টের পাই, কান ঝাঁঝাঁ করে, শব্দগুলো যেন কম্বলের তলায় সেঁধোয়, বাঁধানো রাস্তার খাঁজগুলো সাদা-সাদা দেখায় যেন সেখানে কেউ ময়দা ছড়িয়ে দিয়েছে, আর লোকজনকে অনেক দূর লাগে, মনে হয় আমি এক তেপান্তরে রয়েছি।

যেই-না দেখা তাপ মাইনাস আট, অমনি আমি ছুটে গিয়েছি পার্ক মঁসুরিতে। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। সমস্ত সরোবরটা হয়েছে শক্ত বরফের এক আস্তরণ, তার উপর দিয়ে হাঁটা যায়। বাচ্চারা এখনই সেখানে স্কেটিং করতে আসবে। আর ফোয়ারার

জলধারাগুলো জ'মে নিথর হ'য়ে আছে। মোমবাতির গায়ে গলা মোম যেমন নানা ছাঁদে লেগে থাকে ঠিক তেমনি। গাছ-গুলোর ঘুম এসে গিয়েছে মনে হল। তারা যেন দীর্ঘকাল আর চোখ খুলবে না। অথচ এই সব গাছপালা অন্য সময় কত সজাগ থাকে, এই জল কত ছায়াঘন থাকে। অন্য সময় আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তারা আমার ছেলেবেলার দিনগুলোকে নিয়ে এসে আমাকে খেলতে দেয়। আমি চান করবার জন্যে আমাদের কালো জলের পুকুরে নামি। মানিকদা হাঁক দিয়ে বলে: "ঐ দিকটায় যাস নে, ওখানে শাপ্‌লা আর কল্‌মীর জঙ্গলে সাপ আছে।" জলের নিচে পায়ে কোনো লতানো ডাঁটা জড়িয়ে গেলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, এই বুঝি সাপ। তাড়াতাড়ি হাত-পা ঝাঁপিয়ে স'রে আসি।

মানিকদা ডুবসাঁতার শেখায়: "বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে ডুব দিবি, তারপর জলের ভিতরে হাত-পা চালিয়ে যতদূর পারিস চ'লে যাবি। যেই দেখবি বুকে কষ্ট হচ্ছে, ভুস ক'রে ঠেলে উঠবি। দেখবি অনেক দূর চ'লে এসেছিস।" মানিকদা কায়দাটা দেখায়। অসাধারণ ক্ষমতা মানিকদার। তার সাঁতারের সঙ্গে তুলনা চলে শুধু তারই গাছে চড়ার। এক বুক নিশ্বাস নিয়ে মানিকদা ডুব দিল। আমরা চেয়ে আছি তো আছিই, ওঠে না। আমাদের বুকটাই যেন নিশ্বাসের চাপে ফেটে যেতে আরম্ভ করে। হঠাৎ এক সময় পুকুরের ওপার থেকে চিৎকার: প-লা-শ। কি ক'রে পৌঁছল অতদূর! আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। জলের উপরে যখন সাঁতার কাটে, তখনো মানিকদার বাহাদুরি আমাদের তাজ্জব বানিয়ে দেয়। তার হাত দুটো বৈঠার মতো উঠতে পড়তে থাকে, কালো চুল ভরতি একটা মাথা ঝড়ের মেঘের মতো ছুটে চলে। আমরা তার গতিটা লক্ষ্য করি। সঙ্গের সাঁতারুদের কখন যে মানিকদা ছাড়িয়ে গিয়েছে টের পাওয়া যায় না। তাদের সঙ্গে তার আবার দেখা হয় প্রায় মাঝপথে যখন সে অন্য পাড় ছুঁয়ে

এসে বিজ্ঞভাবে হেসে বলে: "এই তোরা আর একটু হাত-পা চালা।"

ঝাঁপাইজুড়ি শেষ হলে আমরা গাছপালার ছায়ায় বাড়ির পথ ধরি। ভিজে কাপড় অনেকটা নিংড়ে। তবু ফোঁটায় ফোঁটায় ক্রমাগত জল প'ড়ে মাটির রাস্তাটা ভিজে যায়। ফেরার সময় আমরা আর বেশী কথা বলি না। আমাদের শরীর ঝিমঝিম করে। এতক্ষণের মাতামাতি নেশার মতো আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। রাস্তার ধারে বৈঁচি আর আসশ্যাওড়ার পাতাগুলো নাগালের মধ্যে এলে আমাদের আঙুল অন্যমনস্কভাবে সেগুলো ছেঁড়ে। নেশার ঘোরে আমার মনে হয় পৃথিবীর মস্ত বেলুনটা আমাকে নিয়ে শূন্যে ভেসে চলেছে।

ইরেনদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া সকাল সকালই মিটে গিয়েছিল। আমরা রাত করলাম কথাবার্তায়। আমরা মানে চারজন: ইরেন, মাদ্লেন, ইরেনের ভূতপূর্ব স্বামী শার্ল্ আর আমি। নানা বিষয়ে কথা হয়েছে: রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব। শার্ল্ ও ইরেন এমন যুক্তিবিচার দেখিয়ে, এমন মাত্রাজ্ঞান নিয়ে কথা বলেছে যে আমি ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত হয়েছি। মাদ্লেন বলেছে অল্প, শুনেছে বেশি। সে সব সময় আমাদের প্রয়োজনের দিকেই নজর রেখেছে, ফাইফরমাস খেটেছে। সেবা যে তার স্বভাবধর্ম সেটাই প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ পেয়েছে।

ইরেনের বিবাহ-বিচ্ছেদ যদিও হ'য়ে গিয়েছে, তবু শার্ল্ মাঝে মাঝে আসে বন্ধুর মতো। শার্ল্কে আমার ভালো লাগে। বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়বত্তা, দুইয়েরই ছাপ তার প্রতি কথায় ও আচরণে। ইরেনও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং অন্যের সম্বন্ধে তার বিবেচনার পরিচয় পেয়ে আমি এক-এক সময় মুগ্ধ হ'য়ে যাই। অথচ ওরা একসঙ্গে থাকতে পারেনি। ওরা আমাদের সঙ্গে ব'সে যখন কথাবার্তা বলে, বোঝাও যায় না পরস্পরের স্পর্শ ওদের সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সনৎবাবু আর তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কটা ঠিক এই চেহারা নেয়নি। ক'জন

দম্পতিরই বা নেয়? কিন্তু কোথায় যেন একটা মিল আছে মনে হয়। সব স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেই এই মিলটা আছে যেন।

সনৎবাবু আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। আমি যখন ইস্কুলের ছাত্র, তাঁর কাছে কিছুদিন পড়েছিলাম তাঁর বাড়িতে গিয়ে। তিনি পয়সা নিতেন না, বাবার বন্ধু ছিলেন ব'লে বন্ধুপুত্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতেন। স্নেহশীল মানুষ ছিলেন সনৎবাবু। শুধু আমাকে নয়, কাউকেই তিনি রূঢ় কথা বলতেন না। পড়াবার সময় নিজের খালি গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আমাকে বোঝাতেন।

সনৎবাবুর স্ত্রীকে তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট মনে হত। বেশ সুন্দরী ছিলেন। আমার প্রতি তাঁরও স্নেহ ছিল স্পষ্ট। কথা বলার সময় তাঁর মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠত। কিন্তু সেই হাসি উবে যেত যে-মুহূর্তে তিনি স্বামীর সঙ্গে কথা বলতেন, যে-কোনো কথা। তখন তাঁর চোখে দেখতাম আগুনের ঝলক। এক-এক সময় আমিই উপলক্ষ্য হ'য়ে পড়তাম। সনৎবাবু হয়তো আমাকে বললেন: "পলাশ, তুমি আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেরোবে। তোমাকে এখানকার কয়েকটা ঐতিহাসিক জায়গা দেখাব।" সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে গৃহকর্ত্রী ঝড় তুলে এলেন এ ঘরে, ঝাঁঝালো স্বরে বললেন: "না, ও যাবে না। আমি আজ ওকে নিয়ে দর্জির কাছে যাব, ওর পাঞ্জাবির মাপ দিতে হবে।" বুঝলাম আমাকে উপহার দেবেন এবং সেটা তখনই স্থির করেছেন। সনৎবাবু চুপ ক'রে গেলেন। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন না। যেন আগুনটা আঁচ ক'রে নিয়েছেন।

তাঁরা দু'জন এক অবিরাম সংঘর্ষের মধ্যে আছেন, আমার মনে হত। কিন্তু কি কারণে বুঝতাম না। অনেক কাল পরে আমার মনে হয়েছে, এই বিরোধের মূলে হয়তো ছিল শরীর। সনৎবাবুর বয়স্ক ঢিলে-ঢালা শরীরটাকে তাঁর স্ত্রী সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর শারীর সত্তা যখনই প্রকাশ পেত, কণ্ঠস্বর বা চোখের দৃষ্টি বা অন্য যে-কোনো কিছুর মাধ্যমে, তখনই সেই রমণী জ্ব'লে উঠতেন।

ক্রমে তাঁর অভ্যেসই হ'য়ে গিয়েছিল স্বামীকে নিরন্তন প্রতিহত করার।

কিন্তু শরীর যেখানে কর্মঠ, উভয় পক্ষে যেখানে প্রচুর সজীবতা, সেখানে এত বিরোধ দেখেছি কেন? শার্ল্ ও ইরেনই তো তার দৃষ্টান্ত। ওরা কেউ তো স্তিমিত নয়, না শরীরে না মনে। তবে? তখন আমার ভাবনা অন্য এক নাড়া খেয়েছে। হঁ্যা, শরীর দিয়েই বিরোধ মেটে, কিন্তু যতক্ষণ তার নেশাটা থাকে ততক্ষণ। যখন নেশা কাটে, তখন আবার সংঘাত। সেই সময়টার মধ্যে যদি মমতা তৈরি করা যায়, যদি সুবিধে-অসুবিধেগুলো খতিয়ে পারস্পরিক স্বার্থের একটা ভিত গড়া যায়, তাহলে বন্ধনটা টেঁকে, একটা সুখী-সুখী ভাবও আনা যায়। তবে কি মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক মূলত শত্রুতার? শত্রুতাকে দাবিয়ে রাখাই কি সফল দাম্পত্য জীবন?

আমি শার্ল্ আর ইরেনকে দেখে ভাবি, এত বুদ্ধি এদের, তবু কেন দেহের বাইরে বায়ুমণ্ডলের ফাঁকটা এরা ভরাতে পারেনি? কেন পারেনি ভালোবাসাকে দাঁড় করাবার জন্যে মনের মধ্যে কয়েকটা জায়গা ঠিক করতে? শার্ল্ ও ইরেনের সন্তান হয়নি। হ'লে হয়তো বাবা-মা হিসেবে তাদের একসঙ্গে থাকার কাজটা সহজ হত। এখন তারা বন্ধুর মতো কথাবার্তা বলে। টান-টান ভাব নেই। কিন্তু একেবারেই কি নেই? শার্লের বাক্যে ও আচরণে তার চিহ্ন দেখি না বটে, কিন্তু ইরেন সামান্য কোনো কথায় এক-এক সময় উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। সে-কথা শার্ল্ই বলুক বা তার বোন মাদ্‌লেন বলুক অথবা আমিই বলি। তবে কি বিরোধের স্মৃতি তার স্নায়ুতে জ'মে আছে? নাকি বিরোধের চক্র থেকে বেরিয়ে স্বামীকে বন্ধুতে বদ্‌লে নেওয়ার অর্থহীনতা তাকে যন্ত্রণা দেয়? এখন কি সবটাই তার কাছে একটা ফাঁক? ইরেন খুব সিগারেট খায়। আমি যদি বলি: "এত সিগারেট খাও কেন, ইরেন? এত ধূমপান ভালো নয়", ও উত্তর দেয়: "সিগারেট না-খেলে সে-সময়টা

আমি করব কী?" ইরেন তাহলে ধোঁয়া দিয়ে ফাঁক ভর্‌তি করতে চায়।

শত্রুতা দমন করা দরকার, আমি ভাবি। বিরোধের ভেতরে থেকে মন মানিয়ে নেওয়া দরকার। অঞ্জলি কি আমার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? কিন্তু অঞ্জলিকে বিবস্ত্র কল্পনা করতে এখনো আমার সঙ্কোচ হয়।

৭

আমি জনদের কতদিন বলেছি, চলো, তোমাদের সঙ্গে ইরেন মাদ্‌লেনের পরিচয় করিয়ে দিই, আলাপ করলে তোমরা খুশী হবে। কিন্তু ওরা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এখন আমি আর বলি না। ওরা ফরাসীদের সঙ্গে তেমন মিশতে চায় না। আমি লক্ষ্য করেছি ওরা আমাকে যত আপন মনে করে, ফরাসীদের তত করে না। সেটা একদিক থেকে স্বাভাবিক। ফ্রান্স আমারও বিদেশ, ওদেরও। শত্রুর শত্রু যেমন মিত্র হয়, এও তেমনি। নতুন দেশে আমার এবং ওদের মধ্যে মুগ্ধতা, ক্ষোভ, বিস্ময় ও কৌতুকের একটা সমীকরণ হয়। নানান্ সাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলে।

আর ফরাসীরাও যেন কেমন আল্‌গা-আল্‌গা। স্বদেশবাসীর প্রতি মানুষের যেমন কৌতূহল থাকে না, এরা তেমন কৌতূহলহীন। অন্তত রাস্তাঘাটে দোকানবাজারে সাধারণভাবে। বিদেশীকে বুঝি এরা বিদেশী মনে করে না। ফরাসী কাস্টমস্ কর্মচারী ভদ্রলোকও তো সেইরকম আমাকে বুঝিয়েছিলেন। আমি একবার জার্মানী থেকে ফিরছিলাম। কাস্টমস্ কর্মচারীটির কী সন্দেহ হয়েছিল, লুকোনো জিনিসের সন্ধানে আমার শরীর-তল্লাসী করেছিলেন। না-পেয়ে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলেছিলেন: "কিছু মনে করবেন না। আপনি তো অনেকদিন আছেন ফ্রান্সে, আপনাকে ফরাসী ব'লে ধ'রে

নিয়েই তল্লাস করেছি।" গোপন করব না, সে-কথা শুনে তাঁর স্বদেশবাসী হিসেবে তাঁর গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করবার ইচ্ছে আমার হয়েছিল।

লণ্ডনে ইংরেজকে যখন রাস্তার হদিস জিগ্যেস করেছি, না জানলে সে নিজের থুঁতনি মুঠো ক'রে চিন্তাকুল স্বরে বলেছে: "লে মি সী।" তারপর আমাকে ট্রাফিক পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়ে হদিস জেনে ব'লে দিয়েছে। তার ভাবটা যেন এই: "তুমি আমাদের অতিথি, এবং আমরা এক মহৎ জাতি। আমাদের সেই মহত্ত্বের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তোমাকে সাহায্য না-ক'রে আমি পারি না, কারণ সেটা আমার কর্তব্য।" অবিশ্যি এই মহানুভবতা এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী সমৃদ্ধির কল্যাণে। সাম্রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার পর মহানুভবতা কিছু কিছু কমেছে নিশ্চয়।

প্যারিসের রাস্তায় যখন গন্তব্য সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করি, প্রায়ই কাঁধ-ঝাঁকুনির সঙ্গে উদাসীন উত্তর পাই: "সে পা" (জানি না)। ফরাসী ব্যক্তিটি যেন বুঝিয়ে দেয়: "তুমি আমারই মতো একজন, তোমার সম্বন্ধে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। অতএব আমার উত্তর হল—আমি জানি না, তুমি কেটে পড়ো।" নাকি বিদেশী সম্বন্ধে তাদের এই ঔদাসীন্য এসেছে যুদ্ধ ও পরাধীনতার বুকভাঙা অভিজ্ঞতা থেকে?

ইরেন ও মাদ্‌লেন কিন্তু নিজেরাই এই অনাগ্রহ সম্বন্ধে সচেতন। তবে তারা এটা ব্যাপক ব'লে মানে না, অন্তত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তা তো বটেই, নইলে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হবে কেন? কেনই বা আমার কাছে বাংলা শিখতে চাইবে মোনিক? আর আমাদের অনুষ্ঠানেই বা ফরাসীরা এত ভিড় করবে কেন?

ইরেন মাদ্‌লেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। ভাবলে এখনো আমি অবাক হই। আমার অসুখ করেছিল, দিন কয়েকের জন্যে ভরতি হয়েছিলাম হাসপাতালে। তরুণী নার্সরা দিনরাত রোগীদের তদ্বির-তদারক করত। ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে

যা করণীয় ঠিক ঠিক ক'রে যেত। নিয়মমতো খাওয়ানো, শোওয়ানো ওষুধ দেওয়া, দরকার হলেই ডাক্তারকে ডাকা, এ সবই তারা হাসিমুখে করত। কখনো তাদের বিরক্ত হতে দেখিনি, কাউকে ধম্‌কাতেও শুনিনি। এই নার্সদের মধ্যে একজনকে দেখতাম বয়সে কিছু বড়, কিন্তু মুখে তার অমলিন মাধুর্য। সে রোগীদের কাছে এসে পরমাত্মীয়ের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করত। কষ্টের কথা শুনলে তার স্বাভাবিক স্মিতহাসি উবে গিয়ে মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠত। তাকে দেখলেই আমার ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে আসত। সেই প্রথম দেখলাম সেবার মূর্তি।

মাদ্‌লেন প্রথম দুদিন অন্য রোগীদের সঙ্গে আমার প্রতিও মনোযোগ দিয়েছিল নিরপেক্ষভাবে। কিন্তু তার নিরপেক্ষতা ভাঙল তৃতীয় দিনে। আমাকে ওষুধ খাওয়াতে এসে হঠাৎ জিগ্যেস করল: "আচ্ছা, আপনি কি বাঙালী?"

আমি বিস্ময়ে উঠে বসলাম। আমি যে ভারতীয় তা কার্ডে লেখা আছে, কিন্তু আমার বাঙালী সত্তা সাত সমুদ্দুর পারের এই অপরিচিত ফরাসী সেবিকার দৃষ্টিতে কি ক'রে ধরা পড়ল? ঘোর কাটলে উত্তর দিলাম: "হ্যাঁ, কিন্তু কেমন ক'রে জানলেন আপনি?"

সে বলল: "আপনার নাম থেকে। আপনার নাম তো বাঙালী নাম।"

আমি জিগ্যেস করলাম: "কিন্তু কোন নাম বাঙালী এবং কোন্ নাম নয়, এ জ্ঞান আপনার কি ক'রে হল?"

সে বলল: "রবীন্দ্রনাথ তাগোরের, না আমার বলা উচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প'ড়ে। তাঁর যত উপন্যাস, নাটক ও কবিতার অনুবাদ হয়েছে ফরাসী অথবা ইংরিজীতে, সমস্ত আমি পড়েছি। আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।" ব্যস্, হ'য়ে গেল আত্মীয়তা। পাঁচদিন পরে আবার বিস্ময় এবং আরো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। মাদ্‌লেন এসে বলল: "আপনার

বান্ধবীর নাম বুঝি অঞ্জলি, যে আপনার জন্যে ভারতবর্ষে অপেক্ষা ক'রে আছে ?"

আমি হতবাক! মাদ্‌লেন কি দৈবজ্ঞ? আমার বিমূঢ়তা দেখে হেসে বলল: "আমি কি ক'রে জানলাম তা ভেবে আপনার দিশেহারা হওয়ার দরকার নেই। দৈবী ক্ষমতায় আমি কিছু জানিনি। ব্যাপারটা খুব সরল। আমাদের এক বাঙালী বন্ধু লণ্ডন থেকে এখানে এসেছিলেন, কথায় কথায় আপনার নাম বলতে তিনি জানালেন এই নামে একজনকে তিনি কলকাতায় চিনতেন, যার সঙ্গে একটি মেয়ের প্রণয় ছিল, যে-মেয়েটির নাম অঞ্জলি। যাক, এখন বোঝা গেল তিনিই আপনি। এই পরিচয় আবিষ্কার ক'রে আমরা আনন্দিত।"

অতঃপর একটু উচ্ছল হ'য়ে মাদ্‌লেন বলল: "দাঁড়ান, আমার দিদিকে ডেকে আনি। হাসপাতালেই তার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। নইলে আপনাদের পরিচয় হতে দেরি হ'য়ে যাবে।"

জিগ্যেস করলাম, কেন। সে তখন জানাল, তার দিদিও এই হাসপাতালে কাজ করে, রাসায়নিক বিভাগে; কিন্তু আজই তার কাজের শেষ দিন, কারণ সে ইস্তফা দিয়েছে, তার আর এ কাজ ভালো লাগছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইরেনকে নিয়ে এল মাদ্‌লেন। দুই বোন একেবারে বিপরীত। ইরেনের চেহারায় মাদ্‌লেনের প্রশান্তি নেই। তার ভাবভঙ্গি একটু অস্থির। মুখের ছাঁদেই যেন দু'জনের পার্থক্য চিহ্নিত। ঠোঁটের উপর ও নিচের অংশ এবং দু'পাশের গাল নিয়ে মাদ্‌লেনের মুখচ্ছবি সুডোল। ইরেনের লম্বাটে মুখে নাক ও থুঁতনি চোখা, কপালটা উঁচু। মাদ্‌লেনের কথা সব সময় হাসিতে গ'লে যায়। ইরেন কথা বলে ঝোঁক দিয়ে এবং তাতে একটা ঝাঁঝ ফুটে বেরোয়। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কর্কশতা নেই, যেন ভেতরের কোনো জ্বালা তাকে তীব্র ক'রে দেয়। পরে দেখেছি তার এই তীক্ষ্ণতা একেবারে নরম হ'য়ে যায়, কান্নায় ভেঙে পড়বার

মতো হয় যখন কারো কোনো ব্যক্তিগত কষ্টের কথা সে শোনে। আমার সঙ্গে হাসপাতালে প্রথম আলাপেও তার আভাস পেলাম। প্রিয়জনদের, বিশেষত অঞ্জলির কাছ থেকে দূরে আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি, এই ঘটনা নিজেই উল্লেখ ক'রে সে বেদনার্ত দৃষ্টি আমার উপর মেলে ধরল। সে উচ্চারণ না-করলেও আমি শুনতে পেলাম : আহা!

তারা স্বভাবতই হাসপাতালে বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। ইরেন যাবার সময় বলল, আমি যেন সুস্থ হ'য়ে অবশ্যই তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করি। মাদ্‌লেন জানাল, বাড়িতে যাবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে সে ছাড়বে না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই গিয়েছিলাম ইরেনদের বাড়ি। সেই থেকে সেখানে আমার ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা। কখনো তারা আমার কাছ থেকে দূরে ছিল এমন আমার আর মনেই হয় না। তারাও আমার ভালোমন্দের সঙ্গে যেন পারিবারিকভাবে সংশ্লিষ্ট। আমার একটু সর্দিকাশি বা জ্বরজ্বারি হলেই ইরেন বলে : "পলাশ তুমি আমাদের বড্ড ভাবিয়ে তোলো।" অথবা "অঞ্জলিকে লিখে দেব তুমি একদম শরীরের যত্ন নাও না।" মাঝে মাঝে সে ছুটে আসে আমার হোটেলে, কাছেপিঠে কোথাও বেড়াতে যাবার প্ল্যান করেছে, আমাকে সহযাত্রী করতে চায়। তাদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাই। একদিন রেঁধেছিলামও।

আমি রেঁধেছিলাম শুনলে অঞ্জলি নিশ্চয় হাসত। রান্না সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা নিয়ে তার বিদ্রূপের অন্ত ছিল না। তাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে ব্যঞ্জন আমি না-রাঁধতে জানি, পায়েস কি ক'রে রাঁধতে হয় তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে, মিষ্টির প্রতি ভালোবাসাই আমাকে তা শিখিয়েছে। অঞ্জলি সে-কথা কখনো মানেনি এবং আমার যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগও দেয়নি। সে বোধহয় চায় আমার যা কিছু শেখবার তা যেন তার কাছ থেকেই শিখি। এবং সেই সূত্রে তার বক্তব্য বোধহয় এই যে, সে জানে

এমন জিনিস তার কাছ থেকে যদি আমি না-শিখে থাকি তাহলে আমি তা জানি না। অঞ্জলি যে কেন এত অধৈর্য হয় বুঝি না। অনেক কিছুই তো তার কাছে আমার শেখবার আছে, অনেক কিছুতেই তো আমার হাতে খড়ি হবে তার কাছে।

ইরেনদের বাড়িতে আমি পায়েস রেঁধেছিলাম। অসুবিধে তো নেই। সস্তায় খাঁটি দুধ যথেষ্ট পাওয়া যায়, চিনিও অঢেল, চালও সুলভ। দু'সের দুধ জ্বাল দিয়ে এক সের বানিয়ে তার পায়েস। বলা বাহুল্য খেতে খুব সুস্বাদু হয়েছিল (অঞ্জলির হাসি কিন্তু আমি আবার শুনতে পাচ্ছি)। ইরেন মাদ্‌লেনের তারিফ আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। অবিশ্যি ইরেন যা বলেছিল একদিক থেকে তা খুব গর্বের নয়। সে বলেছিল : "খেতে অতি চমৎকার হয়েছে, পলাশ। দুধ চাল চিনি দিয়ে বানানো এরকম জিনিস এর আগে কখনো খাইনি। কিন্তু আমার এই প্রথম খাওয়াই আমার শেষ।"

আমি বিস্মিত হ'য়ে কারণ জিগেস করেছিলাম। তাতে সে উত্তর দিয়েছিল : "খেতে যতই ভালো হোক, যা রাঁধতে এত সময় লাগে তা আমার কাছে বরণীয় নয়। আমি নিজে কখনো অত সময় একটা রান্নায় দিতে পারব না এবং আমি চাই না যে তুমিও অত সময় নষ্ট করো।"

ইরেন তো জানে না বাঙালী মেয়েরা পতিকূলকে প্রসন্ন রাখার জন্যে জীবনের অর্ধেকটাই এ যাবৎ রান্নাঘরে কাটিয়ে এসেছে। তবেই না সৃষ্টি হয়েছে এই পরমান্ন-শিল্প।

মাদ্‌লেন সব সময় ঘাড় নেড়ে দিদির কথায় সায় দেয়।- বেশী তর্কাতর্কি সে করে না। তার আগ্রহ কথার চেয়ে কাজেই বেশী। যেমন তাকে দেখেছি হাসপাতালে, ঠিক তেমনি দেখি বাড়িতে। কোনো তফাত নেই। দিদির কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না, যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের কখন কি চাই, এই দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। দিদিকে সে যেন এক আহত শিশুর মতো ছাখে। মাদ্‌লেন

আমাদের মধ্যে কতবার যে এসে বসে আর উঠে যায় তার ঠিকানা নেই। এবং সব সময়ই মুখে সেই নরম হাসি। এত আনন্দিত শক্তি সে কোথা থেকে পায় তাই ভাবি। কেবল বেশী রাত সে জাগে না। আমরা যখন বাদ-প্রতিবাদে মত্ত, হঠাৎ সে উঠে পড়ে, ক্ষমা চেয়ে বলে: "যাই, শুতে যাই। কাল সকালে হাসপাতালের ডিউটি আছে।"

মাদ্‌লেনের ভেতরের রক্তমাংসের মানুষটাকে এক-এক সময় আমার জানতে ইচ্ছে হয়। আমি একদিন পরিহাসের ছলে জিগ্যেস করেছিলাম: "মাদ্‌লেন, আর কত দিন একলা থাকবে? এইবার স্বয়ম্বরা হও। বিয়ে না-করলে কি মানুষ সম্পূর্ণ হয়?"

সে উত্তর দিয়েছিল: "সম্পূর্ণতা নিয়ে মাথা না-ঘামানোই ভালো। একজনের ধারণা কি অন্যজনের সঙ্গে কখনো মিলবে? তা ছাড়া..." ব'লে একটু থেমে আবার বলেছিল: "তাছাড়া, স্ত্রীলোকের দেহটা বড় বিশ্রী, অত্যন্ত ক্লেদাক্ত। এই যে বাইরে এত চটক তোমরা গ্যাখো, তার তলায় কী পঙ্কিলতা। ভালো নয়, ভালো নয়।"

এ কি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারিণীর বিতৃষ্ণা? নাকি দিদির জীবনের প্রতিক্রিয়া? সে কি দাম্পত্য জীবনে শার্ল্‌ ও ইরেনের আচরণকে দুই ভিন্ন স্তরে সক্রিয় দেখেছে এবং তার পক্ষপাত কি শার্লের প্রতি? অথচ দিদির প্রতি তার অসীম মমতা। তাহলে মাদ্‌লেনও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে অপরিহার্যরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে দেহজ মনে করে। ঘুরে ফিরে সেই শরীর আর শত্রুতা।

৮

"সহজপাঠ"-এর কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মোনিকের চোখ দুটো বাংলাদেশের দীঘির মতো টলটল করে। তার উপর যেন বাঁশবনের ছায়া পড়ে। ভিজে মাটির গন্ধে তাকে আচ্ছন্ন দেখায়। কখনো সে মৃদুস্বরে কখনো বা চমক ভেঙে উচ্ছলভাবে ব'লে ওঠে:

"কি সুন্দর তোমাদের দেশ।" সে তার হাত ছ'খানা এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যেন স্বপ্নের রাজ্যে উড়ে যাবার জন্যে ডানা মেলেছে।

জনের ভাবনা মোনিকের মনে আসে না। অনাহার, দারিদ্র্য, রোগ ও শোষণের কোনো ছবি সেখানে ফোটে না। তার কল্পনার ভারতবর্ষ তাকে ঋষির তপোবনে ডাকে, বিশ শতকের মাঝখানে প্রকৃতির স্নেহ-লালিত শান্ত সুখী মানুষদের চলাফেরায় তাকে সঙ্গী করে। অথচ মোনিক খবরের কাগজ পড়ে, নানারকম বই কেনে। আমি যতই তাকে বলি, "তুমি যে-দিকটা দেখছ তার উল্টো একটা দিক আছে, সেটা ভীষণ নিষ্ঠুর, ভীষণ রক্তাক্ত, কিন্তু সেটাই বাস্তব এবং সেখানেই আমরা আছি," ততই সে মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়, "না, তার চেয়েও বাস্তব তোমাদের মহত্ত্ব; তোমরা নিজেদের মহত্ত্ব বুঝতে পারো না।" আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের দেশটা তোমার একবার গিয়ে দেখে আসা দরকার, মোনিক।

মোনিকদের শিক্ষিকা-নিবাসে যেতে এখন আমি আর অস্বস্তি বোধ করি না। সেখানকার অধিবাসিনীদের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হ'য়ে গিয়েছে। বাঙালীত্বের গৌরবে বিহ্বল হ'য়ে বিনে পয়সায় গুরুগিরি যে কবুল করেছিল, সে এখন গণ্ডী ডিঙিয়ে বন্ধুত্বের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সপ্তাহে ছ'দিন পড়ানো ছাড়াও আমাকে ওখানে মাঝে মাঝে খেতেও হয়। প্রথম আমন্ত্রণটা করেছিলেন শিক্ষিকা-নিবাসের পরিচালিকা। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। চারিদিকে মেয়ে, যেন প্রমীলা রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। আজন্মের ভারতীয় অভ্যেস আমাকে আড়ষ্ট ক'রে ফেলেছিল। আমার ভালো ক'রে কথা সরছিল না। কিন্তু আমন্ত্রণ-কর্ত্রী কথা শুরু করতেই বরফ গ'লে জল হ'য়ে গেল। অতি সহজভাবে তিনি খাওয়া-দাওয়ার রীতির কথা পাড়লেন এবং জিগ্যেস করলেন ভারতবর্ষে সেটা কী রকম। তখন আমি বেশ স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রশ্নটা সংশোধন করলাম, বললাম, এ ব্যাপারে ভারতীয় রীতি ব'লে একটা কোনো রীতি নেই, এক-এক অঞ্চলে এক-

এক রকম। ব'লে আমি খাওয়াদাওয়ার কিছু বিবরণ দিলাম। তা থেকে এসে গেল বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার প্রসঙ্গ। অর্থাৎ বাঙালীয়ানা কোনোমতেই এড়ানো গেল না ; বিশেষ ক'রে মোনিকের উৎসাহই তাকে শেষ অব্দি জিইয়ে রাখল। অন্য মেয়েরাও এই কথাবার্তায় সহজভাবে ভিড়ে গেল। তাদের প্রশ্নে ও মন্তব্যে কৃত্রিমতার লেশ ছিল না। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হল, তখন দেখি আমরা অতঃপর একজন ভদ্রলোক এবং কয়েকজন ভদ্রমহিলা নই, আমরা সবাই বন্ধু।

ভাষাশিক্ষার মারফত ও যে কত মহান এক সংস্কৃতির শরিক হচ্ছে, সেটা প্রমাণ করবার জন্যে মোনিক অস্থির। আমার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কবিতার কিছু পরিচয় মোনিক পেয়েছিল। এখন তার মাথায় চাপল একটা কবিতার নির্বাক অভিনয় করাতে হবে বাচ্চাদের দিয়ে। এ-বিষয়ে অভিজ্ঞা আমার স্বদেশিনী মল্লিকাদির সঙ্গে তার যোগাযোগ ক'রে দিলাম। ফরাসী শিক্ষিকারাও উৎসাহী। ফলে এক সন্ধ্যায় জীবন্ত ছবিতে রূপায়িত হল রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ'। সাজসজ্জা করালেন মল্লিকাদি। মোনিকের ফরাসী অনুবাদে কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়। বাচ্চারা দারুণ উৎসাহে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করল। ভারতীয় বেশে মেয়েগুলোকে দেখাচ্ছিল চমৎকার।

আমার ছিল দুই কাজ : পরামর্শ দেওয়া আর দেখা। দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। যে-মেয়েটি বীরপুরুষের পার্ট করল, খুব ফুটফুটে চেহারা তার। কাছা এঁটে কাপড় প'রে সে কী মোহন রূপ। অভিনয়ের পর আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। নাম জিগ্যেস করতে বলল, ক্রিস্তিন।

"বাঃ, সুন্দর নাম তো তোমার।" নরম লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হ'য়ে উঠল। তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব জ'মে গেল। আমি তাকে জিগ্যেস করলাম : "ক্রিস্তিন, আমাদের দেশে যাবে তুমি?" সে বলল : "হ্যাঁ যাব যদি আমার মা যায়।"

ক্রিস্তিনকে আমার বড় আপন মনে হচ্ছিল। ওর মুখের ছাঁদ অনেকটা ঝুনুর মতো। যেন ঝুনুরই মেয়ে ও। কিন্তু তা কি ক'রে হবে? ঝুনুর মতো গেঁয়ো মেয়ে কি ফরাসী বিয়ে ক'রে ফ্রান্সে বসবাস করতে পারে? তার বিন্দুমাত্র সম্ভাব্যতা নেই। ঝুনু বড় জোর বাংলাদেশের গেঁয়ো শহর থেকে বড় শহরে গিয়ে শহুরে মেয়ে হ'য়ে যেতে পারে। তবু আমার ইচ্ছে হল ক্রিস্তিনকে একবার জিগ্যেস করি, তোমার মা'র নাম কী। কত রকম ইচ্ছে যে আমার হয়।

ঝুনু এখন কোথায় কে জানে। অথচ একদিন তার সব খবরই আমি রাখতাম। না-রাখাটাই অস্বাভাবিক ছিল। ঝুনু আমার খেলার সাথী তো ছিলই, উপরন্তু তার বয়সটা ছিল প্রায় কাঁটায় কাঁটায় আমার বয়সের সমান। এক ঝড়ের রাতে আমরা আমাদের মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে পৃথিবীর অন্ধকারে এসেছিলাম। সেই রাতের স্মৃতিতে তার বাবা তার পোশাকী নাম রেখেছিলেন, ঝঞ্ঝা : ঝঞ্ঝা দাশ-গুপ্তা। বাঙালী মেয়ের এমন নাম হয় নাকি? কিন্তু ঝুনুর তো হয়েছিল। তার বাবা নিশ্চয় কবি ছিলেন। আমরা অবিশ্যি তাকে ঝুনু ব'লেই ডাকতাম। সেটা বোধহয় ঝঞ্ঝারই ঘরোয়া সংস্করণ। তবে কেউ কেউ তাকে ক্ষেপাবার জন্যে ডাকত, ঝঞ্ঝাট। তা ঝঞ্ঝাটই বটে, অন্তত বাপ-মা'র পক্ষে। ঝুনু মেয়েদের সঙ্গে খেলত না, খেলত আমাদের সঙ্গে। দৌড়ঝাঁপে, মারামারিতে আমি এবং অন্য ছেলেরা তার সঙ্গে এঁটে উঠতাম না। কথায় কথায় তার সঙ্গে দৌড়োনোর প্রতিযোগিতা হত। কখনো তাকে হারাতে পেরেছি ব'লে মনে পড়ে না। প্রায়ই দেখতাম তার বাবা রোদ্দুরে ছাতা মাথায় বেরিয়েছেন তাকে ধ'রে আনতে। কখনো কখনো তার মাকে দেখতাম দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকদের উদ্বিগ্নভাবে জিগ্যেস করছেন, তাকে কেউ দেখেছে কিনা। তাকে নিয়ে সব সময়ই যেন ঝড় ঘুরত। একই ঝড়ের রাতে আমিও জন্মেছিলাম, কিন্তু আমার নাম কেন রাখা হল পলাশ? আমার বাবা বোধহয় ঝুনুর বাবার চেয়েও বড় কবি ছিলেন।

আমার জন্ম-সাথী কিন্তু বেশীদূর পর্যন্ত আমার পাশে থাকেনি। বছরগুলো যত এগিয়ে চলল সে ততই পেছিয়ে পড়তে লাগল। দশ বছর পর্যন্ত সে রোজ আমাদের সঙ্গে খেলতে এসেছে, তারপর আর রোজ আসত না। ক্রমে তার আসা বেশ ক'মে এল। বছর তিন বাদে একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেল। শেষের দিকে যখন সে আসত, তাকে কেমন যেন গম্ভীর-গম্ভীর দেখাত। আমি তাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করতাম আর খানিকটা বিভ্রান্ত হ'য়ে আগের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করতাম। আমার দৃষ্টি তার মুখ থেকে বুকের উপর নামলে সে একটু ঘুরে দাঁড়াত এবং ঘোরার সময় তার বুকটা মুখের মতো গম্ভীর আর রহস্যময় মনে হত। তখন যে-কদিন সে আসত, আমাদের সঙ্গে আর আগের মতো খেলত না। আমাদের সঙ্গে খেলার চেয়ে আমাদের খেলা দেখাটাই তার বেশী আগ্রহের মনে হত। আমরা তাকে জোর ক'রে খেলায় নামাবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে থমকে যেতাম। সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকত এবং আস্তে বলত, "না"। আর আমরা তার গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারতাম না। অথচ তার সঙ্গে আগে কত ঝটাপটি করেছি। আগেকার খেলার সাথী ছেলে-দের উপর আমি তেমনই ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু ঝুনুকে আর জাপটে ধরতে পারি না।

সম্পর্কটা কি ক'রে এমন বদ্‌লে গেল, আমি অস্পষ্টভাবে ভাবতাম। "এই ঝুনু, তুই আজকাল আসিস না কেন রে?" এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলত: "মা বারণ করেছে।" তার উত্তরের ধরনে মনে হয় তার মা'র বারণে তার অনুমোদন রয়েছে, তার ভেতর থেকেই যেন কেউ তাকে টেনে ধরেছে। তারপর একদিন সে একেবারেই আমাদের চোখের আড়ালে চ'লে গেল।

ঝুনুটা যে কোথায় গেল জানি না। ঝড় তাকে বাংলাদেশ থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ফ্রান্সে নামিয়ে দেবে, এটা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ক্রিস্তিনকে তার মা'র নাম শেষ পর্যন্ত আর জিগ্যেস করতে পারা গেল না।

'বীরপুরুষ'-এর সাফল্যে আমার চেয়েও মোনিকের গর্ব বেশী। ও যেন তুই সংস্কৃতির মধ্যে এক সেতুবন্ধন ঘটিয়ে দিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেন ওরই আবিষ্কার। বাংলা শেখার উৎসাহ ওর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মানে আমার গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার সময়টা বাড়ল। ভাষা-জননীর মুখ চেয়ে এ পরিশ্রম আমি অম্লানবদনে বরণ ক'রে নিলাম।

কিন্তু মোনিকের আগ্রহ সম্বন্ধে আমার এক-এক সময় সন্দেহ হয়। সে তো প্রত্নতাত্ত্বিক নয়। যে-জাতির ভাষা সে শিখছে সেই জাতির সুখ-তুঃখ সম্বন্ধে এমন উদাসীন সে কী ক'রে থাকে? অবিশ্যি আমার ব্যক্তিগত সুখ-তুঃখের খবর সে নেয়। তবে কি তার জীবন্ত আগ্রহ ভাষা সম্বন্ধে ততটা নয় যতটা ভাষা-শিক্ষক সম্বন্ধে? আমার ভাষা যদি বাংলা না হ'য়ে মারাঠী হত, সে কি সমান আগ্রহেই মারাঠী শিখত না? পড়তে পড়তে মোনিক এমনভাবে তাকায় যেন শেখবার সব কিছু আমার মুখে জমা হ'য়ে আছে। আমি আগে মাঝে মাঝে অঞ্জলিকে এইভাবে আমার দিকে তাকাতে দেখেছি। আহা, বেচারা মোনিক, ও জানে না ওই রকম ক'রে তাকালে আমার অঞ্জলিকে মনে পড়ে।

৯

ইরেনকে পাগলামিতে পেয়েছে। তাকে দেখে গোড়া থেকেই আমি মনে মনে বলেছি, পাগল। তবে জনকে যেভাবে বলতে চেয়েছি সেভাবে নয়। স্নেহবশে নয়। ইরেনের জন্যে কষ্টবোধ করেছি ব'লে! এখন তার পাগলামি যেন আরো বেড়েছে, বাড়ছে। আমার চোখের সামনেই তার স্নায়ুগুলো কেমন তুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, মাদ্‌লেন তার অফুরন্ত মাধুর্যের উৎস থেকে ওকে ছিটেফোঁটা শান্তিও দিতে পারেনি। ওর উত্তেজনা, ওর অস্থিরতা এক এক সময় আমাকে বড্ড পীড়িত করে। অথচ কত বুদ্ধিমতী ইরেন।

বুদ্ধিমতী এবং অনুভূতিশীল। বুদ্ধি আর অনুভূতির সঙ্গে কী না থাকলে মানুষ ভারসাম্য হারায়? আমিও যদি ভবিষ্যতে ভারসাম্য হারাই! ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। মনকে থেঁৎলে থেঁৎলে পাগল বানাবার কল তো পাতাই রয়েছে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন আমি গিয়েছিলাম ইরেনদের ওখানে। মাঝে শুধু একদিন ইরেনের দেখা পেয়েছিলাম। ওদের ওখানে না গিয়ে আমি পারি না। থেকে থেকে মনে হয়, যাই দুই বোনকে দেখে আসি। ইচ্ছেটা ক্রমে প্রবল হ'য়ে ওঠে। তখন যেতেই হয়। যেদিন ইরেনের সঙ্গে দেখা হল, ও বাইরের ঘরে ব'সে ছিল। মাদ্‌লেন ভেতরে কোনো কাজ করছিল। ইরেন কী যেন ভাবছিল। তার মুখটা কিঞ্চিৎ আরক্ত, যদিও বিষণ্ণ। আমি ঢুকতেই বলল: "এসো পলাশ, বোসো। আশা করি এখনই পালাবে না। রাত্তিরে খেয়ে যেয়ো।"

আমি বললাম: "খেতে আমার আপত্তি নেই। পয়সার অভাবে খাওয়া তো তেমন জোটে না। তোমরা দু'জন আছ ব'লে ভালো-মন্দ খেতে পাই। সেইজন্যেই তো ঘন ঘন আসি।"

"বাচালতা করতে হবে না।" ইরেন মন্তব্য করল, "এখন বোসো, গল্পসল্প করা যাক্। কথা বলা যায় এমন লোকই তো বিরল।"

বললাম: "গল্প করা ভালো, কিন্তু বেশী চিন্তা করা ভালো নয়। তোমাকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। আজকাল তুমি বড় ভাবো দেখি। কেন? এত ভাববার কি প্রয়োজন?"

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ইরেনের কণ্ঠে উত্তেজনা ভর করল: "কী বলো তুমি, প্রয়োজন নেই? আমার নিজের পরিস্থিতি, চারদিকের পরিস্থিতি, আমার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং হচ্ছে, এ সব নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই? জীবনের দিকে আমি কি চোখ বন্ধ ক'রে থাকব?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তখন ও আস্তে আস্তে নরম হ'য়ে গেল। বলল: "পলাশ, তুমি আমাদের পুরো পরিচয় জানো না।"

আমি বললাম : "তার মানে ? এতদিন ধ'রে তোমাদের যেমন দেখছি সেটাই তো তোমাদের পরিচয়। তার বেশী পরিচয় থাকে নাকি মানুষের ?"

ও জবাব দিল : "থাকে বৈকি। আমরা কী রকম পরিবার থেকে এসেছি, আমাদের জীবনের পটভূমি কী, এ তথ্যগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।"

আমি বললাম : "তা দিয়ে মানুষের আচরণ ও মনোভাব অনেক-খানি ব্যাখ্যা করা যায় ঠিকই ; কিন্তু তা না-জানলে চলে না এমন নয়। আমি যাকে যেমন দেখছি, সেটাই আমার কাছে আসল।"

ইরেন আর তর্ক করল না, গম্ভীরভাবে বলল : "তুমি নিশ্চয় জানো না যে আমরা খাঁটি ফরাসী নই।"

আমি উত্তর দিলাম : "জানি। মাদ্‌লেনের কাছে শুনেছি।"

—"ও, মাদ্‌লেন তাহলে ইতিমধ্যে তোমায় বলেছে।"

—"কেন, ব'লে কি সে অন্যায় করেছে ?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ইরেন আমার মুখে বিষণ্ণ দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বলল : "না, মাদ্‌লেন কোনো অন্যায় করতে পারে না। অন্যায় যা করার, আমিই করি।" তারপর বলল : "মাদ্‌লেনের কাছ থেকে কতখানি কী জেনেছো তুমি ? শুনলে আমার সুবিধে হবে।"

বললাম : "আমি জেনেছি যে তোমাদের বাবা ফরাসী, কিন্তু তোমাদের মা ইয়োরোপের অন্য দেশের মেয়ে।"

আর কী জেনেছি জিগ্যেস করায় আমি ব'লে চললাম : "তোমাদের মামার বাড়ির দেশেই তোমাদের শৈশব কেটেছে, তোমার যৌবনেরও অনেকখানি। মাঝে মাঝে তোমরা অবিশ্যি ফ্রান্সে আসতে, কিন্তু আবার সেখানে ফিরে যেতে। অবশেষে একদিন আজন্মের গৃহ তোমাদের ত্যাগ করতে হল।"

ইরেন মন্তব্য করল : "গৃহত্যাগই বটে। কারণ শুনেছো ?"

আমি উত্তর দিলাম : "হ্যাঁ, তাও শুনেছি। তোমাদের বাবা সেই দেশে গিয়েছিলেন ফরাসী অধ্যাপক হ'য়ে। সেখানে তাঁর

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তোমাদের মা'র সাহচর্য তাঁকে জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণ নির্বিকারভাবে দেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর ফলেই তোমাদের শেষ পর্যন্ত চ'লে আসতে হল।"

ইরেন বলল: "শুধু এর ফলে? কেন, বাবা-মা নানাভাবে নির্যাতিত হওয়ার পরেও তো ছিল সেখানে। শেষ দিকে বাবা তো সেখানকার অধিবাসীর ছদ্ম পরিচয়েই ছিল।"

আমি একটু অপ্রস্তুতভাবে বললাম: "আরো কিছু বলেছে মাদ্‌লেন। সেটা কিঞ্চিৎ জটিল। আমি যতদূর বুঝেছি, শাসকশ্রেণীর হাতে দৈহিক পীড়ন ছাড়াও তাঁদের মনের উপর এক ধরনের পীড়ন শুরু হয়েছিল যা তাঁরা সহ্য করতে পারেননি।"

এবার ইরেন আবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। বলল: "সেটাই আসল। সে-পীড়নের আস্বাদ আমিও পেয়েছি। মাদ্‌লেন তখন ছোট ছিল বটে, কিন্তু আমি বড় হয়েছিলাম। মা-বাবার পাশে আমিও রাজনীতিতে ভিড়েছিলাম।" তারপর একটু থেমে বলল: "দৈহিক পীড়ন সব মানুষকে ভাঙতে পারে না। বাবা-মাকে পারেনি। কিন্তু মনের উপর যদি অপ্রত্যাশিত আঘাত আসতে থাকে, তাহলে সমস্ত জোর নিঃশেষ হ'য়ে যায়। এ রকম আঘাত হানতে পারে বন্ধুরা, শত্রুরা নয়।"

আমি মাদ্‌লেনের কাছ থেকে তার কিছু আভাস পেয়েছিলাম। এখন চুপ ক'রে শুনতে লাগলাম ইরেনের বিবরণ।

ইরেন ব'লে চলল: "একই আদর্শে একই সংগ্রামে যারা আমার সাথী, তাদের মধ্যে যখন দেখি অন্যায়, কথার সঙ্গে কাজের আকাশ-পাতাল তফাত, তখন অসহ্য লাগে। আর মেরুদণ্ডটা ভেঙে দু'টুকরো হ'য়ে যায় যখন তার প্রতিবাদ করতে গেলে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাসঘাতক! কে বিশ্বাসঘাতক? যে আদর্শ-বিরোধী আচরণ করে সে, না, যে সেই আচরণ প্রতিরোধ করতে যায় সে?"

ইরেনের গলার চামড়ার নিচে দুটো সরু নীল শির ফুটে উঠেছে।

আমি তাকে একটু শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বললাম: "কিন্তু সকলেই নিশ্চয় সে-রকম নয়।"

সে খানিকটা নরম স্বরে বলল: "না, সকলে নয়। অধিকাংশই নয়। কেউ কেউ। কিন্তু সেটাই মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ তাদের বিষ উপর থেকে ছড়িয়ে সারা শরীর জর্জর ক'রে দেয়।"

আমি মন্তব্য করলাম: "কিন্তু দোষেগুণেই তো মানুষ। দেবতা হ'য়ে কেউ জন্মায়নি। সুতরাং কি ক'রে প্রত্যাশা করব যে, কারো স্বভাবে কোনো ত্রুটি থাকবে না?"

ইরেন জবাব দিল: "পলাশ, তুমি আমাকে ছেলে-ভুলোনো ক'রে বুঝিয়ো না। ত্রুটি থাকা এক কথা, আর জেনেশুনে অন্যায় ক'রে যাওয়া আর এক কথা। আমার বাবা-মা ভীষণ অপরাধ করেছিল, কারণ তারা এই অন্যায় সহ্য করতে পারেনি। তারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, প্রতিবাদ সংগঠনের চেষ্টা করেছিল। শুধু তাই নয়, তারা নীতিগত ভ্রান্তিও দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই জন্যে তারা চিহ্নিত হল গুপ্তচর ব'লে। আজন্মের বাসভূমি ছেড়ে-আসা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর রইল না। অভিযোক্তাদের হাতে যদি রাষ্ট্রক্ষমতা থাকত, তাহলে হয়তো চ'লে আসা যেত না, ঐখানেই দেহরক্ষা করতে হত। তবে বাবা-মা ফ্রান্সে চ'লে এসেও খুব বেশীদিন বাঁচেনি। তাদের জীবনের সম্বল ফুরিয়ে গিয়েছিল।"

ইরেন হাঁপাচ্ছে। তার গলার শির দুটো আবার দপদপ করছে।

শৃঙ্খলার প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল। কিন্তু আমি তা তুললাম না। অনুমান করলাম ইরেন তাহলে নিশ্চয় বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে, ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করবে: "শৃঙ্খলা! মনুষ্যত্বের চেয়ে শৃঙ্খলা বড়! সততার চেয়ে শৃঙ্খলা বড়! দল কি একটা প্রাণহীন যন্ত্র যার দাসত্ব করবার জন্যে মানুষের জন্ম? আমাকে বোকা বোঝাতে এসো না, পলাশ।"

আর একটা প্রশ্নও আমার মনে উঠেছিল। বাবা-মার মতো প্রিয়তমজন যে-ক্ষেত্রে জড়িত, সে-ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বক্তব্য যথার্থ কিনা তা ঠিকভাবে বিচার করা কি সম্ভব ? কিন্তু এ-প্রশ্ন ইরেনের পক্ষে মর্মান্তিক হত। সুতরাং আমি চুপ ক'রেই রইলাম।

ইরেন, মনে হল, এখন ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখ দুটো বুজে এসেছে।

ইরেনের অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতা নয়, তার যন্ত্রণা আমার যন্ত্রণা নয়। তবু সমবেদনায় আমার মন টনটন ক'রে উঠল। বিশেষ ক'রে আমার যন্ত্রণা হতে লাগল তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। ব্যক্তিগত দুঃখের আঘাত সে সামলাতে পারেনি। সে-চোট এসে পড়েছে তার আদর্শের উপর। তার নিজের জীবনও সেই সঙ্গে তাকে এক বৃহৎ ব্যর্থতাবোধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, আমার মনে হল। তার জীবনের মূল বিশ্বাস ছত্রখান হ'য়ে গিয়েছে। এখন তার পায়ের তলায় কোনো জমি নেই। এই নিরালম্বতা তাকে কোন্ বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে যাবে ? সে কি উন্মাদ হ'য়ে যাবে, না, শত্রুকে মিত্র ব'লে আঁকড়ে ধরবে, না, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে নিজেকে সঁপে দেবে ? কিন্তু যুক্তির কোনো কথা আমার মনে এল না। আমি শুধু মনে মনে বলতে থাকলাম : আহা, ও যেন শান্তি পায়। সেদিন নৈশভোজনের পর এই শান্তি-কামনা নিয়েই আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এরপর যে-দু'দিন গিয়েছি, ইরেনকে বাড়িতে পাইনি। কোথায় গিয়েছে জিগ্যেস করায় দু'দিনই মাদ্‌লেন মাথা হেলিয়ে ম্রিয়মাণ ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে, গুপ্তাকে নিয়ে সে বেরিয়েছে প্যারিস দেখাতে। মাদ্‌লেন কোনো মত প্রকাশ না-ক'রে মৃদুভাবে একটা দুঃখসূচক শব্দ করেছে। বুঝতে পেরেছি, দিদির আচরণ যে স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয় তাই ভেবে তার কষ্ট হচ্ছে।

গুপ্তা ছেলেটি নবাগত। মরিশাস দ্বীপ থেকে এসেছে, সেখানেই তার জন্ম। ইংরিজী ও ফরাসী দুটোই সে বলতে পারে। হিন্দী

ছাড়া বাংলাও কিছু জানে। সেটা আশ্চর্য। সে বলে তার মা নাকি বাঙালী ছিলেন, কাশীর মেয়ে। সেখান থেকে তার উত্তরপ্রদেশী বাবার সঙ্গে মরিশাসে চ'লে আসেন। বাংলাভাষা তার মা'র কাছ থেকে ছোটবেলায় কিছু শিখেছিল, তবে মা মারা যাওয়ার পর চর্চার অভাবে ভুলে-ভুলে গিয়েছে। গুপ্তা বেশ রূপবান ও গুণবান। সে ছবি আঁকতে পারে, আসর জমিয়ে গল্প বলতে পারে এবং গান গাইতে পারে। বাংলা গানও সে অনেক জানে। বাঙালীয়ানা মেশানো এত গুণ ইরেনকে আগ্রহান্বিত না ক'রে পারে না। গুপ্তার এক-একটা দক্ষতা যখন প্রকাশ পেয়েছে, ইরেন উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। যেন এতদিন পরে একজন আদর্শ পুরুষ আবির্ভূত হল। লোকের সঙ্গে এমন সগর্বে গুপ্তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যেন এই মহাপ্রতিভা তার এক নবলব্ধ সম্পত্তি। গুপ্তাকে নিয়েই সে এখন আছে। তাকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ানো, তাকে নিয়ে জাদুঘরে চিত্রশালায় যাওয়া, তার নানান্ দরকারে সাহায্য করা। পুরনো বন্ধুবান্ধবরা ইরেনের চোখের সামনে এখন নেই।

গুপ্তাকে যে আমার খারাপ লাগে তা নয়। বরং তার সঙ্গ আমি অনেক সময় বেশ উপভোগ করি। বিশেষত সেই সময়টায় যখন কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না, কোনো গুরুতর কাজ করতে ইচ্ছে করে না, শুধু ইচ্ছে করে বেড়িয়ে বেড়াতে, কথার খাতিরে কথা বানাতে, একটু সুরে আর একটু রঙে দিনটাকে বাহারে ক'রে দেখতে। কিন্তু গুপ্তার মতো বহির্মুখী মন আমি এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ আমার মনের কাছে রাখতে পারি না। আমার শরীর খারাপ লাগে। এবং আমার সন্দেহ যে এই রকম লোক নিজের প্রতি ছাড়া আর কারো প্রতি আসক্ত হয় না, দরকার ফুরোলেই নিজেকে ভীষণ অচেনা ক'রে ফেলতে পারে। অথচ ইরেন তাকে মহৎ মনে করছে। তাতে আমি বিস্মিত নই। আমি বেশ বুঝি এ মহত্ত্ব ইরেনেরই আরোপিত। ইরেন বোধহয় কিছুই আর ভাবতে চায় না, কিছুই আর করতে চায় না।

আহা, ইরেন শান্তি পাক, এই কথা মনে মনে বলতে বলতে আমি দু'দিনই ওদের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছি।

১০

দক্ষিণ ফ্রান্সে রওনা হওয়ার আগে জন আমাকে ব'লে গেল রোজ একবার এলেনির খবর নিতে, যদি কোনো দরকার-টরকার হয়। তাছাড়া আমার সাহচর্য নাকি এলেনির ভালো লাগবে। অর্থাৎ এলেনিকে আমার সঙ্গ দিতে হবে। উভয়েরই তাই বাসনা। আমার উপর জনের এই দায়িত্ব অর্পণে আমি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। আরো তো বন্ধু ছিল জনের, মার্কিন এবং ফরাসী। তাদের বাদ দিয়ে সে বিশ্বাস ন্যস্ত করল এই ভারতীয়ের উপর। নিশ্চয় তার মনে হয়েছে আমি তাদের থেকে কোথাও আলাদা। কেন তার এই ধারণা হল? আমার আচরণে আমি তো কোনো বৈশিষ্ট্য টের পাই না। অবিশ্যি আমি টের পাব কি ক'রে? অন্যেরা আমাকে যেভাবে দ্যাখে, আমি তো সেভাবে নিজেকে দেখতে পাই না। বোধহয় ছোটবেলা থেকে স্ববর্ণদের অভ্যেস ও আচরণ সম্বন্ধে জনের মনে একটা ফর্মুলা তৈরি হয়েছে। সেই ফর্মুলা আমার ক্ষেত্রে ও খাটাতে পারে না। আমি অন্য পৃথিবীর লোক। সেই জন্যে ও মনে করে আমি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু দুই আধখানা নিয়েই তো গোটা পৃথিবী এবং সেই এক পৃথিবীরই মানুষ আমি। আমার ভেতরটা আলাদা হবে কি ক'রে? যেটুকু আলাদা, সে তো বাইরের অন্ধ অভ্যেসের, বাইরে থেকে চাপানো সামাজিক আচারের। ভালোত্ব আর মন্দত্বের নয়। তবু জন আমাকে আলাদা ক'রে দেখেছে ব'লে আমি খুশী হলাম।

আমার এই খুশী হওয়া নিশ্চয় এক ধরনের জাত্যভিমান অথবা ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতার মোহ। কিন্তু তা কতদিন স্বভাবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

জন বরদোতে গেল ছুটির সময় বেড়াতে। তার এক বান্ধবীর আমন্ত্রণে। এলেনিকে সেই বান্ধবী আমন্ত্রণ করেনি। করার কারণও ছিল না। এলেনি এখনো জনের স্ত্রী নয়, সেও একজন বান্ধবী, যদিও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। দুইজনকে এক সঙ্গে আর এক অবিবাহিত বান্ধবী ডেকে নিয়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিকতা এক-এক সময় ভয়ানক সাংঘাতিক হতে পারে। এক্ষেত্রে যেমন এলেনির পক্ষে। এই স্বাভাবিকতা প্রতিরোধের জন্যে সে কী করেছিল আমি জানি না। শুধু জনের যাত্রার আগে লক্ষ্য করলাম, এই প্রসঙ্গ উঠলে এলেনি চুপ ক'রে যাচ্ছে যেন এটা অন্যের ব্যাপার যার সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট নয়। এলেনির উৎসাহী স্বভাবের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্য-হীন। আর জনের মুখটা হাসি-হাসি থাকলেও মাঝে মাঝে অন্য-মনস্ক হচ্ছে।

জন যখন এলেনির তত্ত্বতল্লাসের ভার আমাকে দিল, তখন আমি তাকে জিগ্যেস করলাম: "এলেনিকে প্যারিসে রেখে অন্য মেয়ের কাছে যে যাচ্ছ, এতে সে আপত্তি করেনি?"

জন উত্তর দিল: "কেন, আপত্তির কী আছে? আমি তো সে-মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না।"

তার গলার স্বরটা ঈষৎ ঝাঁঝালো। বুঝলাম এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তাকে এর আগেই যেতে হয়েছে। আমি তখন বললাম: "বিয়ে করাটাই তো সব সম্পর্কের লক্ষ্য নয়। বন্ধুত্ব-টন্ধুত্বের প্রতিক্রিয়া-গুলো সব সময়ই জটিল হয়, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে।"

ও বলল: "বাঃ, এ তো বেশ মজার! যেহেতু আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করছি, সেই হেতু আমি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারব না!"

মজা তোমাকে আরো নিশ্চয় দেখতে হবে, জন। হয়তো তোমাকেও, রামচন্দর। মুখে বললাম: "কিন্তু মজার ব্যাপার হয়। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। আমাদের দেশে কোনো গৃহিণীর ইহলোক-ত্যাগের পর প্রায়ই

যেমন কাগজে বেরোয় তিনি দানশীলা ছিলেন, উদারহৃদয়া ছিলেন, ধর্মপরায়ণা ছিলেন, সে-রকম নয়। এ মহিলা সত্যিই নিষ্ঠাবতী ছিলেন। গোটাকয়েক পুত্রকন্যা প্রসব করার পর তিনি যৌবনে ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে গেলেন। স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় আর শুতেন না, এমনকি এক ঘরেও না। স্বামী বেচারীর কষ্টটা একবার ভেবে ছ্যাখো। অভ্যেস বদ্‌লানো কি চারটিখানি কথা! কিন্তু এ হেন ধর্মপরায়ণা পত্নী অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে স্বামীর আলাপ-পরিচয় সহ্য করতে পারতেন না।"

জন এবার হোহো ক'রে হেসে উঠল, বলল: "না, না, এলেনি তা করবে না।"

আমিও হেসে বললাম: "সে আমি জানি। এলেনি অত নিষ্ঠাবতী নয়।"

এলেনি জনের দক্ষিণ ফ্রান্স ভ্রমণে কতটা কি আপত্তি করেছিল তা ঠিক বলতে পারি না। তবে এটা ধ'রে নিতে পারি যে তার একাধিপত্য আহত হয়েছিল। জনকে নিয়ে তার খুশীর খেলা খানিকটা ভণ্ডুল হয়েছিল। তার হিসেব-কষা চোখ দুটো মনে পড়তে আমার বোধ হল তারা যেন এখন আরো বড় এবং আরো মোক্ষম হিসেবে লেগে পড়েছে।

আমি যখন একা ইয়োরোপে আসি, তখন অঞ্জলি কিন্তু আপত্তি করেনি, যদিও এটা প্রায় অবধারিত ছিল যে, এখানে কয়েক বছর অবস্থানকালে আমার নতুন বন্ধু-বান্ধব হবে যাদের মধ্যে কিছু মেয়েও থাকবে। বরং অঞ্জলি আমাকে সোৎসাহে বিদায় দিয়েছিল। অনেকটা 'জয়যাত্রায় যাও হে' ভাব। অবিশ্যি বিভুঁই-বিদেশে যাওয়া আর একই দেশের অন্য জায়গায় যাওয়া, এ দুটো ঠিক এক ধরনের ব্যাপার নয়। বিশেষত, জলজ্যান্ত একটি মেয়ের বিদ্যমান থাকায় এবং না-থাকায় তফাত আকাশ-পাতাল।

অঞ্জলির মধ্যে কোনো হিসেবী মানুষও আমি কখনো দেখিনি। বরং আবেগের আবহাওয়ায় নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দেবার একটা

ঝোঁক তার দেখেছি। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তার চেহারা পরিষ্কারভাবে আমার কল্পনায় আসে না। কখনো কখনো মনে হয় আমি এক অজানা রাজ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। সেখানকার নিয়মকানুন বিধিবিধান সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোন্ কথা বা কোন্ কাজের জন্যে যে আমার বেত খাওয়ার সাজা হবে বা ফাঁসি হবে, তা আমি জানি না। আমার হঠাৎ কেমন অস্বস্তি লাগে। তবু অঞ্জলি আমার কাছে ভীষণভাবে কাম্য। সে কাছে এলে তাকে আমার আরো কাছে পেতে ইচ্ছে করে।

১১

আমাকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানাবার সম্পর্ক আমার সঙ্গে এলেনির নয়। কিন্তু প্রথম দিন গিয়েই আমি অভ্যর্থনা অনুভব করলাম তার দৃষ্টি থেকে, তার একার প্রতীক্ষা থেকে। আমি কর্তব্য হিসেবে জিগ্যেস করলাম তার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। সে হেসে মাথা নাড়ল, মন্তব্য করল: "কিসের আবার প্রয়োজন?" তারপর যোগ করল: "তোমার সঙ্গে গল্প করাই একটা প্রয়োজন।" আমাকে কফি খেতে অনুরোধ করল। আমি 'না' বলাতেও শুনল না। জল গরম ক'রে কফি বানাতে বসল। কফি খাওয়া শেষ হ'লে এলেনি প্রস্তাব করল: "চলো পল, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।" আমার হাতে কিছু সময় ছিল, আমি রাজী হলাম।

ভেবেছিলাম এলেনির মন খারাপ, সে বোধহয় শান্ত জনবিরল কোনো এলাকায় বেড়াবে। তা না, সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল কোলাহলের মধ্যে। যেখানে রাস্তায় লোক গিসগিস করছে, দোকানপাট আলোয় ঝলমল, রেস্তোরাঁ কফিখানা ফূর্তিতে উপ্‌চে পড়ছে, আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেইখানে। মঁপারনাসের এক পানভোজন-মুখর কাফেতে আমরা ঢুকলাম। মানে এলেনি আমাকে

নিয়ে ঢুকে পড়ল। সে ভালো খাবারের অর্ডার দিল, এবং উৎকৃষ্ট লাল মদের। খাদ্যপানীয়ে আমার তখন উৎসাহ ছিল না। আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব, একটা লেখা শেষ করতে হবে। তাই উসখুস করছিলাম। কিন্তু এলেনির সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এক বোতল ভ্যাঁ রুঝ্ শেষ হতে জিগ্যেস করল এবার কোন্ মদ আমি খেতে চাই। বললাম আমি আর খাব না। তবু এলেনি পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আপত্তি মেনে নিয়ে বলল: "তাহলে চলো, ওঠা যাক।" আমি ভাবলাম ও হয়তো বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু ওর মুখে কোনো বিরক্তির ছায়া দেখলাম না। বরং হিসেবী চোখ দুটো ঠাণ্ডাভাবে তাকিয়ে আছে দেখলাম। পুরুষ আর মেয়ে একসঙ্গে খেতে গেলে সামাজিকতা অনুসারে পুরুষেরই দাম দেবার কথা। আমি বিলটা নিতে এলেনি সেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিল। স্পষ্ট গলায় জানাল পয়সা সে দেবে। আমি তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যখন বিদায় নিলাম, সে বলল: "কাল এসো, পল। এসে কিন্তু তাড়াতাড়ি পালাবার জন্যে ছটফট কোরো না।"

পরের দিন যেতে এলেনি বলল: "আজ আমার এখানেই তুমি খাবে। আমি ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।"

আমার আর কি আপত্তি? কতদিনই তো জনের সঙ্গে ওর ওখানে খেয়েছি।

খানিকক্ষণ আমাদের গল্প চলল। কথা বলল এলেনিই বেশী। আমি শুনছিলাম আর মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য ও প্রশ্ন গুঁজে দিচ্ছিলাম। দু'একবার জনের কথা পাড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এলেনি তা এড়িয়ে গেল।

এলেনি সবিস্তারে গ্রীসের বিবরণ দিতে লাগল। ওর জন্মভূমি যে সমুদ্র, সূর্য আর পর্বত নিয়ে কত সুন্দর তার বর্ণনায় মুখর হ'য়ে উঠল। আমাকে বলল আমি যদি গ্রীসে গিয়ে থাকতাম, তাহলে আরো ভালো কবিতা লিখতে পারতাম। আমি তখন মনে মনে

বললাম, তোমার ধারণা ভুল, এলেনি। আমার যেটুকু ক্ষমতা জন্ম থেকে আছে, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রীস আমাকে দিতে পারত না। ভালো কবিতার উৎস তো রোদ জল পাহাড় নয়। সে আমার হৃদয়, আমার বোধ ও বুদ্ধি। প্রকৃতি হয়তো কখনো কখনো অঙ্কুশের কাজ করে। কিন্তু তার জন্যে তোমার দেশে যেতে হবে কেন, আমার দেশেই তো প্রকৃতির অজস্র বৈচিত্র্য রয়েছে। তাই ব্যবহার করলেই চলে। কিন্তু ব্যবহার করা যাবে কি ক'রে যদি প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেবার উপায় আমার না থাকে, যদি অন্নের চিন্তা আমাকে অহর্নিশি উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে রাখে? তার চেয়ে আরো সহজ ও স্বাভাবিক প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা, আরো সহজ ও স্বাভাবিক তার নিষ্ঠুরতার কথা বলা, আরো সহজ ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের পাশে মানুষের গ্লানি ও অভাবের ছবি আঁকা।

এসব আমি মনে মনেই ভাবলাম। এলেনির সঙ্গে তর্ক করিনি। আজেবাজে তর্ক ক'রে লাভ কি? কবিতাই হোক আর যাই হোক, কোনো কিছুর উৎকর্ষ কি তর্ক ক'রে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? ইংরেজরা যেমন বলে, পুডিং-এর গুণ চেখেই বুঝতে হয়।

আটটা বাজার আগেই এলেনি খাবার আয়োজন ক'রে ফেলল। রাজকীয় ভোজ নয়, সাধারণ খাওয়া। কিন্তু অত্যন্ত উপাদেয়, অন্তত আমার কাছে। মাছের ফিলেট, মাখন দিয়ে সাঁৎলে লালচে-করা গোটা গোটা আলু, মাংসের স্টেক, চেরি ও ক্রীম। তৃপ্তি ক'রে খাওয়া গেল। আসব ছিল একাধিক রকমের: লাল এবং সাদা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে ব'লে কাল তেমন খাইনি, আজ খেলাম।

অ্যালকহলের আমি ভক্ত নই, কিন্তু ওয়াইনের প্রতি আমার অসীম অনুরাগ। রিভিয়েরায় যখন ছিলাম, আমাদের বিশ্রাম-নিবাসে দুপুরের খাওয়ার সঙ্গে ওয়াইন দিত। খেতে বসার ঠিক আগে ভূমধ্যসাগরের নীল জলে ঘণ্টাখানেক মাতামাতি ক'রে এসেছি। শরীর বিবশ, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। খালি গায়েই

ব'সে পড়েছি খাবার টেবিলে। আমি এবং আমার সঙ্গীরা। তখন সামনে এসে গেল অনাড়ম্বর খাদ্য : ছোট ছোট ব্রাউন রঙের কাঁচা মূলো, আলু-ভাজা, রোস্ট-করা মাংস, রুটি এবং পেয়ার বা পীচ বা আঙুর আর এক বোতল ক'রে ভ্যাঁ রুঝ্। খাদ্যের সঙ্গে সেই ওয়াইন চুমুক দিতে দিতে মনে হত অমৃত আস্বাদন করছি। ক্রমে শরীর চাঙ্গা হ'য়ে উঠত, মন পুলকে ভ'রে যেত। খাদ্যের স্বাদ অপূর্ব লাগত। আহারে যে স্বর্গসুখ আছে, সেই আমি প্রথম বুঝেছিলাম।

খাওয়া শেষ হলে এলেনি তার ছবির অ্যালবাম বের করল। ডিভ্যানে আমার পাশে ব'সে নানান্ জায়গায় তোলা নিজের নানান্ রকম ফোটো দেখাতে লাগল। মাঝে মাঝে গ্রীস ও অন্য দেশের সুন্দর নিসর্গ-দৃশ্য। ঝুঁকে প'ড়ে এলেনি অ্যালবামের পাতা ওল্টাচ্ছে, এক-একটা ছবি দেখিয়ে বিবরণ দিচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর আর উচ্চগ্রামে নেই, মৃদু হ'য়ে এসেছে। এক-এক সময় প্রায় ফিসফিসের মতো। তার মুখ আমার মুখের পাশে, দু একটা চুল উড়ে উড়ে আমার গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছবির পাতার উপর তার আঙুল ঢেউয়ের মতো আমার আঙুলে এসে লাগছে, স'রে যাচ্ছে, আবার এসে লাগছে। আমি তার বুক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুকের ওঠানামা টের পাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে। আমার যেন নেশা হয়েছে। কিসের নেশা ? মদের, না, আর কিছুর ?

হঠাৎ অ্যালবাম বন্ধ ক'রে এলেনি বলল : "এসো পল, তোমাকে নাচ শেখাই।"

আমি নাচ জানি না, কিন্তু নাচ আমার অতি প্রিয়। জন যখন নাচে, আমার ঈর্ষা হয়। আমি যদি ঐ রকম নাচতে পারতাম। বিনে বাধায় মেয়েদের জড়িয়ে ধরবার সুযোগের জন্যে নাচ শেখবার ইচ্ছে আমার কখনো হয়নি। শরীর দিয়ে অবলীলায় ছবি আঁকার, ছন্দ ফোটানোর যে-ক্ষমতা, সেটাই আমাকে আকৃষ্ট করে। মেয়েদের সঙ্গে যুগল নাচও আমার কাছে ঐ জন্যেই আকর্ষণের। তাতে দুই প্রস্থ সচল রেখার সমন্বয়ে, সম্মিলিত ছন্দের সামঞ্জস্যে যেন নতুন নতুন

সৃষ্টি। আর এ তো জানা কথা, যৌবনের আবেগ আপনা থেকে প্রকাশ পায় অঙ্গের সঞ্চালনে। তার সবচেয়ে সুন্দর স্বাভাবিক রূপ যৌথ নাচ। সুতরাং কেউ যদি সামাজিকভাবে নৃত্য প্রবর্তনের কথা বলে, আমি তাকে ষোল আনা সমর্থন জানিয়ে দিই। তবে এ নাচের ফর্ম সহজ করতে হবে, যাতে সবাই তার শরিক হতে পারে। আমিও হতে পারি। জন এলেনির মতো নিপুণ না-হলেও চলে। সে তো জন্মগত ক্ষমতার ব্যাপার। মোটামুটি জানাই যথেষ্ট। সেটা আমারও ক্ষমতার মধ্যে। আমি শিখতে ইচ্ছুক। এবং এলেনির মতো ভালো শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে? কতদিন ও আর জন আমাকে বলেছে নাচ শিখতে। এ যাবৎ সুযোগই হয়নি। আজ হল।

এলেনি উঠে রেকর্ড চালিয়ে দিল। তারপর আমাকে ডাকল। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বলল: "তুমি ডান হাতে আমার এই হাত ধরো, আর তোমার বাঁ হাত রাখো আমার কোমরে।" শুরু হল পদ-সঞ্চার, কখনো সামনে, কখনো পেছনে, কখনো-বা পাশে। সেই সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া কথায় এলেনির নির্দেশ সামনে এগোবার, পেছনে হটবার, ডানে-বাঁয়ে সরবার। একবার বলল: "আরো কাছে স'রে এসো। অত আলগা হ'য়ে থেকো না।"

এলেনির গলার স্বর আবার মৃদু হ'য়ে এসেছে। আবার যেন তা আমার কানে ফিসফিস করছে। আমি তার শরীরের উষ্ণ কোমলতা অনুভব করছি। তার অঙ্গের আন্দোলন আমার পেশীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার বুকের বর্তুল চাপ একবার নরম হ'য়ে আমার বুকের উপর পড়ল। তার মুখ আমার সামনাসামনি। তার নিশ্বাস আমার মুখে লাগছে। ঘন নিশ্বাস। ঘরের নীলাভ আলো সোজাসুজি তার মুখের উপর পড়েনি, একরাশ চুলের ছায়া রয়েছে সেখানে। আমি তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবু বুঝতে পারছি তার ঠোঁট দুটো একটু খোলা এবং তার চোখের মণি কাঁচের মতো চকচক করছে।

এলেনির অস্ফুট স্বর আবার কানে এল: 'পল'। অমনি আমি

কেঁপে উঠলাম। আমার আচ্ছন্নতা খানখান হ'য়ে গেল। আমার হঠাৎ কেমন ভয় করতে লাগল। মনে হল জন আমাদের দেখছে, আর মনে হল আমার সামনে এক জমাট অন্ধকার কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে এবং এলেনির চকচকে চোখ দুটো তার মধ্যে থেকে আমাকে ভীষণভাবে টানছে। আমার পালাবার ইচ্ছে প্রবল হ'য়ে উঠল। ঠিক যেমন মঞ্জুবৌদির কাছ থেকে পালাবার ইচ্ছে হয়েছিল। পালিয়েওছিলাম।

তখন আমার বয়স কত হবে, এই বছর কুড়ি। পরেশদার সঙ্গে একদিন দেখা হ'য়ে গেল রাস্তায়। পরেশদা চেঁচিয়ে উঠলেন: "আরে, পলাশ না? তোর সঙ্গে কতকাল দেখা নেই। আমি তো আজকাল আর দেশের বাড়িতে যেতেই পারি না। সময় কোথায়? তা তুই কবে এলি কলকাতায়? কি করছিস?"

সংক্ষেপে জানালাম, আমি অনেকদিন হল কলকাতায় এসেছি পড়বার জন্যে। তিনি তখন বললেন: "চল আমার বাসায়। তোর বৌদির সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দি। সে খুব খুশী হবে।"

পরেশদা যে বিয়ে করেছে তা এই প্রথম জানলাম। তাঁর সঙ্গে গেলাম তাঁর বাসায়। দরজার গোড়া থেকেই হাঁকডাক: "মঞ্জু, ছাখো কাকে ধ'রে এনেছি।" মঞ্জুবৌদি বাইরের ঘরে এলে পরেশদা বললেন: "এ হল পলাশ। আমার দেশের ছেলে। চমৎকার ছেলে। লেখাপড়ায় খুব ভালো।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন: "ইস্কুলে তো তুই খুব ভালো রেজাল্ট করতিস্। এখনো নিশ্চয় সেই রকম করিস্।" আমি চুপ ক'রেই থাকলাম। স্ত্রীকে তিনি আগের কথার জের টেনে বললেন: "লেখাপড়ায় ভালো তো বটেই। তাছাড়া, পলাশ আবার কবিতা-টবিতা লেখে। তোমার সঙ্গে খুব জমবে।" মঞ্জুবৌদি একটু হাসল।

সুন্দরী না-হ'লেও মঞ্জুবৌদি মোটামুটি দেখতে ভালো। বেশ স্বাস্থ্যবতী। রং শ্যামলা, মুখের ছাঁদটা গোল, নাক সামান্য চাপা,

ঠোঁট দুটো একটু পুরু, কিন্তু ভারী চোখের পাতার নিচে বেশ মানানসই। বয়স মনে হল আমার চেয়ে কিছু বেশী।

মঞ্জুবৌদি কথাবার্তায় সহজ, সপ্রতিভ। আমার লাজুক স্বভাবের ভেতর থেকে আমাকে টেনে বের করতে তার দেরি হল না। পরিপাটি ক'রে আমাকে সে খাওয়াল। আমি চ'লে আসার সময় পরেশদা আমাকে বললেন: "যখনি সময় পাবি চ'লে আসবি। আমি তো বাইরে বাইরেই ঘুরি। তোর বৌদির সঙ্গীর বড় দরকার।" ব'লে হ্যাঃ হ্যাঃ ক'রে হাসলেন পরেশদা।

আমি মাস ছয়েক ধ'রে যতবার তাদের বাড়ি গিয়েছি, পরেশদার সাক্ষাৎ পেয়েছি, যদিও আমাদের সঙ্গে কদাচিৎ তিনি এসে বসতেন। কাছ থেকে তাঁকে যত দেখেছি, তত আমার মনে হয়েছে মানুষটা আমার ছোটবেলার আবছা ধারণা থেকে অন্যরকম। আমার চেনা-জানা আর সব লোক থেকে অন্যরকম। কী কাজ তিনি করেন, তারও হদিস আমি পাইনি। দু'এক সময় বলতেন তাঁকে ব্যবসা ক'রে খেতে হয়, সাহিত্য-ফাহিত্য তাঁর ধাতে সয় না। কী ব্যবসা তা কিন্তু বলতেন না। মঞ্জুবৌদিও না। একবার সন্ধের সময় আমাকে দেখেই পরেশদা হৈহৈ ক'রে বললেন: "এসো ব্রাদার। তোমার বৌদি যে তোমার জন্যে হাপিত্যেশ ক'রে রয়েছে। এখেনেই থেকে যাও না রাত্তিরে। সুখে থাকবে, ব্রাদার।" পরেশদার কথা জড়ানো, মুখ থেকে গন্ধ পাচ্ছিলাম। পরেশদা মদ খেয়েছে।

বেলা এগারোটায় একবার গিয়েছিলাম। পরেশদা তখনো বিছানায়। অসুখ করেছে কিনা জিগ্যেস করায় বৌদি বলল: "কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি, ভোরে এসে ঘুমোচ্ছে।" আমি আর কিছু জিগ্যেস করিনি, বৌদিও বলেনি।

বৌদি ও পরেশদার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ধারণাটাও আমার বোধে ঠিক আসত না। একবার তাদের বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে শুনে ফেললাম বৌদি বলছে: "তুমি যদি এমন বাড়াবাড়ি করো

তাহলে আমি কিন্তু শোধ নেব।" পরেশদা উত্তর দিলেন: "শোধ বলছ কেন? আমি তো চাই তুমিও ফুর্তিটুর্তি করো।" বৌদি বলল: "থাক, বাজে কথা আর বলতে হবে না।" পরেশদা বললেন: "বাজে কথা নয়। তোমার সঙ্গে মিশতে পারলে আমার ইয়ার-দোস্তরা ব'র্তে যাবে।" এর পরই কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল, কারণ আমি পায়ের আওয়াজ করেছিলাম।

আমি গেলে বৌদি খুব আদর-যত্ন ক'রে খাওয়াত, আমার সঙ্গে ব'সে গল্প করত। কবিতায় তার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সে উপন্যাস নাটক খুব পড়ত এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তার একটা সহজ বোধ ছিল। এই আলাপ-সালাপের মধ্যে দিয়ে আমার জড়তা সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল। টেরই পাইনি কখন আমি মঞ্জুবৌদিকে 'আপনি'র বদলে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছি আর আমি হ'য়ে গিয়েছি পলাশ ঠাকুরপোর জায়গায় শুধু পলাশ।

তাদের বাড়ি শেষকালে যে তিন দিন গিয়েছিলাম, পরেশদা ছিলেন না। তারপর আর আমি যাইনি।

প্রথম দিন মঞ্জুবৌদি বরাবরের মতো খাওয়াল, গল্প করল। দ্বিতীয় দিনও তাই। তবে সেদিন সে মাঝে মাঝে আনমনা হ'য়ে পড়ছিল। মনে হল তার মধ্যে যেন কি একটা টানাপোড়েন চলছে। আমি দু'দিন পরে আসব ব'লে কথা দিয়ে এলাম। কিন্তু তৃতীয় দিনে আমার গল্পের পৃথিবীটা গুঁড়িয়ে গেল।

সেদিন গিয়েছি দুপুরে ক্লাসের পর। আমাকে দেখে মঞ্জুবৌদি ভীষণ খুশী হ'য়ে উঠল আর সেই সঙ্গে ব্যস্ত। কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে যেন বুঝতে পারছে না। সেদিন তার আনমনা ভাবটা আর নেই। তার সমস্ত মনোযোগটাই আমার প্রতি নিবদ্ধ। যেন তার কোনো একটা দ্বিধা ছিল যা কেটে গিয়েছে।

আমি বারণ করা সত্ত্বেও সে আমার সামনে এক প্লেট খাবার রাখল, বলল: "খাও, খাও।" গরমে আমার মুখ ঘেমে গিয়েছিল। দেখে সে বলল: "ঈস্, কি ঘেমেছো তুমি!" ব'লেই হঠাৎ তার

আঁচল দিয়ে আমার মুখটা মুছিয়ে দিল। ব্যাপারটা আমার কাছে এত অভাবিত যে, আমি চমকে উঠলাম, তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নিলাম। তখন মঞ্জুবৌদি বলল: "কেন কী হয়েছে আমি মুখ মুছিয়ে দিলে?" নিশ্বাস নিয়ে আবার বলল: "তুমি রোদে তেতে পুড়ে এসেছ, তোমাকে শীতল না-ক'রে কি আমি পারি?"

মঞ্জুবৌদির গলার স্বর মৃদু হ'য়ে গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে। সে আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তার শরীরের উষ্ণতা, তার নিশ্বাসের গভীর বাতাস আমি অনুভব করতে পারছি। আঁচলটা সে আর কাঁধে তুলে দেয়নি, হাত বেয়ে তা নিচে লুটিয়ে পড়েছে।

আবার কথা বলল মঞ্জুবৌদি, কিন্তু এমনভাবে যেন কথা বলতে তার বেগ পেতে হচ্ছে, বাঁ হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: "তুমি তো বলেছিলে হাত দেখতে জানো। ছাখো তো আমার হাতটা।" আমি সম্মোহিতের মতো তার হাতটা ধরলাম। চেটো ঘামে ভিজে-ভিজে। আমি ক্ষীণকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম: "কী বলব?" উত্তর দিল: "দেখে বলো আমি কবে মরব।" এইবার আমি মঞ্জুবৌদির মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটো চকচক করছে যেমন এলেনির করছিল। পুষ্ট ঠোঁট দুটো পরস্পর থেকে একটু স'রে গিয়েছে। সেখানে একটা হাসির আভাস। সে-হাসি আনন্দের, না, যন্ত্রণার বলা যায় না। ভেতরের কোনো অনুভূতি ভাষাকে ছাড়িয়ে গিয়ে দুই ঠোঁটে হাসির মতো এক রেখায় ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ দুপুর আমার কেমন অপার্থিব মনে হল। আমার ভয় করতে লাগল। আমি তার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম: "আমি এখন যাব, আমার কাজ আছে।" মঞ্জুবৌদি দুটো হাত আগ্‌লাবার মতো ওঠাল, কিন্তু আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল না। ভাঙা-ভাঙা গলা আমি পেছনে শুনতে পেলাম: "কেন, কেন?" আমি তখন দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি।

এলেনির চোখ দুটো আমি দেখতে পেলাম। কিন্তু তার মুখের নিচের দিকে ছায়া পড়েছিল ব'লে দেখতে পেলাম না মঞ্জুবৌদির মতো হাসি ফুটেছে কিনা। হয়তো ফুটেছিল, হয়তো ফোটেনি। কিন্তু মঞ্জুবৌদির গাঢ় কণ্ঠস্বরে যে-মমতা ছিল, তা এলেনির কথায় টের পাইনি। বোধ হয় দু'জনের গলায় দুই ইতিহাস কথা বলছিল ব'লে। এলেনির অস্ফুট বাক্যে আমি যে শুধু ভয় পেলাম তাই নয়, এক অকথ্য বিতৃষ্ণা আমাকে তার কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে তফাতে দাঁড়াতে সে অবাক হ'য়ে তাকাল। সে কিছু বলবার আগেই আমি বললাম: "এলেনি, আমার শরীর খারাপ লাগছে! আমি বিদায় নিচ্ছি।"

তার বিস্ময় কেটে গিয়ে যেন বাস্তববোধ ফিরে এল। সে বলল: "শরীর খারাপ লাগছে তো এখানে বিশ্রাম করো। সুস্থ হ'লে যেয়ো।"

আমি বললাম: "না। আমার ভালো লাগছে না।"

সে এইবার আমার মুখ চোখ ভালো ক'রে দেখল, তারপর বলল: "বেশ।"

আমি চৌকাঠ পার হওয়ার সময় পেছন ফিরে বললাম: "জন এলে তাকে বোলো আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।" আমার কথায় এলেনি নিশ্চয় বুঝতে পারল জন না-ফেরা পর্যন্ত আমি আর আসব না এবং জনের মারফত ছাড়া তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার হবে না। সে আমার কথার কোনো জবাব দিল না। শুধু ঈষৎ হাসল। হাসিটা যেন নিষ্ঠুর এবং হিসেবী।

১২

দিন পনেরো সুইটজারল্যাণ্ড বেড়িয়ে প্যারিসে ফিরে এসেছি।

দেশ ভ্রমণে কিন্তু আমার সুখ নেই। অন্তত বড় হওয়ার পর। আমি যেখানে বাস করি সেখানে আমার শিকড় গজিয়ে থাকতে ইচ্ছে

করে। দৌড়োদৌড়ি ক'রে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যাওয়ার মধ্যে কী রহস্য আছে আমি বুঝি না। ইয়োরোপে দেখি শহরগুলোর চেহারা মোটামুটি একই রকম, লোকজনের চালচলনও বাইরে থেকে একই রকম। লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের দেখে বেড়ালে কি চতুর্বর্গ লাভ হয়? অবিশ্যি লোকের কাছে জাঁক ক'রে বলা যায় আমি হ্যান্ জায়গায় গিয়েছি ত্যান্ জায়গায় গিয়েছি অর্থাৎ আমি কেউকেটা নই, আমি একজন বিশ্বপথিক। আমার তাতে আগ্রহ নেই। আমি যেখানে বাস করছি সেখানকার মানুষদের যদি না-চিনলাম, তাদের সুখ-দুঃখের কথা যদি না-শুনলাম, তবে সেখানে যাওয়া এবং থাকার মানেটা কী?

অবিশ্যি এও হতে পারে যে ভ্রমণে আমার এই বীতরাগের আসল কারণ আমার শারীরিক আলস্য। এই আলস্যকে আমি আমার অজান্তে জীবনদর্শনের মোড়কে ঢেকে সামনে ধরবার চেষ্টা করি। নইলে নিজের দেশেও আমি ভ্রমণে নিস্পৃহ হব কেন? স্বদেশবাসীর জীবনযাত্রা চিন্তাভাবনা তো আমার জানা। নাকি আমি আরো অন্তরঙ্গ পরিচয়ের জন্যে সব সময় উন্মুখ হ'য়ে থাকি? অথচ আমার বন্ধুদের অনেকের পায়েই দেখি দম-দেওয়া চাকা লাগানো। কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার কথা শুনলেই তা খট্ ক'রে মাটিতে ঠেকে আর তারা ছুটতে আরম্ভ করে। কেন, অঞ্জলিও খুব বেড়াতে ভালবাসে। আমি নড়তে চাই না ব'লে সে মাঝে মাঝে বলত: "তুমি বড্ড ঘরকুনো।" ভবিষ্যৎ ভেবে সে শঙ্কিত, এমন ভাব একটা তার দেখতাম। যখন সে এই মন্তব্য করত, আমি হেসে বলতাম: "আমার এই স্বভাবের জন্যে ভবিষ্যতে আমার প্রতি তুমি কৃতজ্ঞতা বোধ করবে" অথবা "ভেবো না, আমার এই স্বভাবটা ভবিষ্যতে তোমার খুব উপকারে আসবে।"

সুইটজারল্যাণ্ডে আমাকে যেতেই হল। পিটার অনেকদিন থেকেই লিখছিল একবার জেনিভা থেকে ঘুরে আসতে এবং সেখানে গিয়ে তার বাড়িতে থাকতে। আমি প্রত্যেকবারই তানানা ক'রে

উত্তর দিচ্ছিলাম। এলেনির ওখান থেকে রাত্তিরে হোটেলে ফিরে দেখি আবার পিটারের চিঠি এসেছে। আবার সে জেনিভায় যেতে লিখেছে। এবার আমার মন প্রবলভাবে সাড়া দিল। প্যারিসের বাতাসে পচন লেগেছে। যাই, খোলা হাওয়ায় একটু নিশ্বাস নিয়ে আসি। তক্ষুনি ঠিক ক'রে ফেললাম পরের দিনই জেনিভা যাত্রা করব। ভোরে উঠে পিটারকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম, আমি যাচ্ছি। কোন্ ট্রেনে গেলে সুবিধে হয়, তার বৃত্তান্ত পিটার আগেই জানিয়েছিল। তার পরামর্শ অনুযায়ী ট্রেনে চেপে জেনিভায় পৌঁছলাম সকালবেলা।

মনের মধ্যে প্রত্যাশা ছিল পিটার স্টেশনে আসবে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখি সে নেই। মনটা একটু দ'মে গেল। সুটকেসেটা হাতে নিয়ে আমি এগোলাম। প্ল্যাটফর্মের ফটক পার হতেই কাঁধে হাত পড়ল, "আরে, এই যে পলাশ, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।" আমি ঘুরে পিটারকে দেখে যেমন বিস্মিত হলাম তেমন আনন্দিত। জিগ্যেস করলাম: "তুমি এ জায়গায় কেন? আমি তো ট্রেন থেকে নেমে ভাবলাম তুমি আসোনি।"

ও বলল: "তুমি কোন্ কামরায় থাকবে জানা ছিল না। ভয় হল তুমি হয়তো প্ল্যাটফর্মে নেমে, আমি দেখতে পাওয়ার আগেই, ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবে আর আমার ডেরা খুঁজে হয়রান হবে। তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এইখানটা দিয়ে তো বেরোতেই হবে তোমাকে। এখানে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে তুমি চ'লে যেতে পারবে না।"

জেনিভায় পত্রিকার রিপোর্টার পিটার। একটা ঘর ভাড়া ক'রে একাই থাকে। ঘরটা বেশ বড়, মাঝখানে পার্টিশন-দেওয়া। দু'পাশে দুটো খাট। ঘরের এক কোণে গ্যাসের স্টোভ, রান্নার জিনিসপত্র রাখার তাক, খাওয়ার টেবিল-চেয়ার এবং মুখ ধোয়ার বেসিন।

আমাকে তার ঘরে তুলে পিটার বলল: "তোমার ইচ্ছেমতো থাকো। আমি তো সারাদিন কাজে ঘুরি। ফিরি রাত্তিরে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমিই ঘরের মালিক।"

আমি বললাম : "তাহলে সকালে ছাড়া তোমার দর্শন পাওয়া যাবে না।"

সে উত্তর দিল : "সাধারণ নিয়মে তাই। কিন্তু তুমি বেড়াতে এসে বড় একলা বোধ করবে মনে হচ্ছে। সে জন্যে ভেবেছি দিন কয়েক আধা-ছুটি নেব। মানে ফিরে আসব সন্ধের দিকে।"

অতঃপর বলল : "তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। আমারও। এখন প্রাতরাশ করা যাক।"

ও রুটি, মাখন, জ্যাম ইত্যাদি বের ক'রে টেবিলে রাখল, গ্যাস জ্বালিয়ে জল ফোটাল, চা বানাল। ও যখন কর্মব্যস্ত, আমি তখন দাঁতমাজা মুখধোয়া সারতে সারতে ভাবছিলাম, পিটার প্রাতরাশ ক'রেই স্টেশনে যেতে পারত, কিন্তু তা করেনি, প্রথম দিনের প্রথম খাওয়াটা একসঙ্গে করার উপর ও এক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নিশ্চয় গুরুত্ব আছে, নইলে আমরা একসঙ্গে খাব জেনে আমার এত আনন্দ হচ্ছে কেন?

টেবিলে ব'সে আমি জিগ্যেস করলাম দুপুর ও রাতের খাওয়া ও কোন্ রেস্তোরাঁয় খায়। ও জবাব দিল : "রেস্তোরাঁয় খেতে যাব কোন্ দুঃখে? বাড়িতেই খাই। দেখছো-না রান্নার সরঞ্জাম?" অতঃপর যোগ করল : "তুমিও এখানেই খাবে। দুপুরের খাবার আমি তৈরি ক'রে যাব। আজ অবিশ্যি ও-বেলাও করব। আজ আমি তাড়াতাড়িই ফিরব। অন্যদিন খাবার তৈরিটা তুমি আমি ভাগাভাগি ক'রে করব।"

দিন দুই পিটার আমাকে রান্নায় হাত লাগাতে দিল না। রান্না আর কী? ডিমসিদ্ধ আলুসিদ্ধ। তাছাড়া হ্যাম নিয়ে এসে রুটিতে সেঁটে খাওয়া আর কেনা দই বা ফল আহার। কিন্তু আমার পক্ষে এ প্রোগ্রাম বেশ অস্বস্তিকর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল। খাটনি ছাড়াও খরচের একটা প্রশ্ন আছে। সুতরাং আমি রান্না করবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলাম। পিটার সানন্দে রাজী হল। তখন আমি জানতে চাইলাম জিনিসপত্র ও কোথা থেকে কেনে। এবার পিটার

আকাশ থেকে পড়ল। চোখ কপালে তুলে বলল: "জিনিসপত্র কেনার কথা এখন আসছে কিসে? এক গাদা ডিম আর আলু তো আমি এনেই রেখেছি। ওগুলো যখন ফুরোবে তখন দেখা যাবে। আর রুটি তো আমার এমনিতে কিনতেই হয়। তুমি যা খাইয়ে তাতে আমার রুটি বাড়ন্ত হবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। তবে তোমার যদি দোকানের শোকেসে কোনো খাবার দেখে খেতে সখ হয়, তাহলে কিনে এনো। কিন্তু ওরকম সখের মানে হয় না।"

বুঝলাম পিটার আমাকে পয়সা খরচ ক'রে কিনতে দেবে না। আমি যখন তার আমন্ত্রিত অতিথি, আমার ব্যয়ভার সে-ই বহন করবে। কিন্তু অবস্থাটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার জন্যে যে পিটারের অর্থব্যয় হচ্ছে এটা আমার মনে সবসময় খচখচ করতে লাগল। অবশেষে আমি জানালাম আমি রেস্তোরাঁয় খাব এবং সেও আমার সঙ্গে খাবে। তাতেও পিটারের ঘোরতর আপত্তি। প্রথমে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল বাড়িতে খাওয়া রেস্তোরাঁয় খাওয়ার চেয়ে কত বেশী স্বাস্থ্যকর। আমি কিছুতেই যখন বুঝলাম না, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল: "তোমার যদি পয়সা হ'য়ে থাকে, রেস্তোরাঁয় তা নষ্ট করতে পারো। সে তোমার অধিকার।"

কিন্তু রেস্তোরাঁয় আমি একদিনের বেশী খেতে পারিনি। পিটারের বিমর্ষভাব আমাকে বিচলিত ক'রে দিল। তাছাড়া, রেস্তোরাঁয় খেয়ে এসে পিটারকে ডিমসিদ্ধ আলুসিদ্ধ খেতে দেখা আমার পক্ষে কঠিন। অতঃপর যে ক'দিন জেনিভায় ছিলাম, পিটারের বিধান মেনেই চলেছি।

খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠালেই পিটার বেড়াতে যাবার কথা পাড়ত। ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম প্রায় রোজই, কখনো সকালে, কখনো সন্ধের দিকে। একদিন সকালে লেমাঁ হ্রদের ধারে পায়চারি করতে করতে শেক্‌স্‌পীয়ার আবৃত্তি ক'রে শোনাল পিটার। ঠিক শোনানো নয়, ও স্বগতোক্তির মতো বলল, আমি শুনলাম। শঙ্কর যেমন বলত আর আমি শুনতাম।

শঙ্কর আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল। প্রথম প্রথম আমি তাকে দাদাই বলতাম। কিন্তু পরে সে আর বলতে দেয়নি। কলকাতায় আমরা দু'জনেই ছিলাম আগন্তুক, একই জায়গা থেকে এসেছিলাম পড়াশোনা করতে। শঙ্কর আমার চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ত। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এমন মেতে থাকতে আর কাউকে দেখিনি। আমার কাছে তার সপ্তাহে দিন চারেক আসা চাই-ই। গম্ভীর মুখে সে আমার ঘরে এসে ঢুকত, যেন গুরুতর কোনো খবর দিতে এসেছে। বিনা ভূমিকায় জীবন সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করত এবং প্রখ্যাত দার্শনিকদের চিন্তার বিবরণ আমাকে দিত। এ আলোচনার আর শেষ ছিল না। না, আলোচনা কথাটা এখানে ঠিক হল না। কারণ, বলবার যা, সে-ই বলত, আমি শুধু সায় দিতাম বা দু'একটা প্রশ্ন করতাম।

তবে সব দিনই সে এ রকম করত না। মাঝে মাঝে তাকে কবিতায় ভর করত। তখন সে কোনো কবিতা, প্রধানত রবীন্দ্রনাথের, নিচু গলায় আবৃত্তি করতে করতে আমার ঘরে ঢুকত। যতক্ষণ সে থাকত, বই টেনে নিয়ে একটার পর একটা কবিতা প'ড়ে যেত এবং এক একবার থেমে আমাকে বোঝাত, কবিতা জীবন-উপলব্ধির কী অমোঘ প্রকাশ।

এক গ্রীষ্মের ছুটিতে শঙ্কর দেশে গেল এবং আর ফিরল না। আমি পরে খবর পেলাম সে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছে। জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে শঙ্কর পথ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। নাকি জীবনকে সে এমনভাবে জেনে ফেলল যে আমাদের এই যুক্তি-তর্কের পৃথিবীটা তার কাছে হাস্যকর হ'য়ে দাঁড়াল? আমার পাগল হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাবতে গেলে, এই দিকটাও ধর্তব্যের মধ্যে নিতে হবে।

আবৃত্তি করতে করতে পিটার তার পকেট থেকে একটা ছোট্ট বাঁধানো বই বের করল। হ্যামলেটের এক ক্ষুদে সংস্করণ। সে বলল: "শেক্‌স্‌পীয়ারের এই সংস্করণটা আমার সবচেয়ে মূল্যবান

উত্তরাধিকার। বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন।" অতঃপর পাতা উল্টে সে দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলো পড়তে থাকল। এবং সেই সঙ্গে হ্যামলেট-চরিত্রের বিশ্লেষণ চলল। মনে হল, পিটার হ্যামলেটকে প্রতিরোধ করছে।

পিটার একদিন বাড়ি ফিরল অনেক রাত্তিরে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘরে ঢুকে সে আমার ঘুম ভাঙাল। আমার সন্দেহ হল মদ খেয়ে তার নেশা হয়েছে। কিন্তু মদের গন্ধ আমি মোটেই পেলাম না। পিটার এমনিতে মদ খেতও না। তবু তাকে কেমন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। আমার ঘুম ভাঙিয়ে সে প্রশ্ন করল: "পলাশ, তুমি কি মনে করো মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট? জাত হিসেবে তারা নিচু স্তরের?"

আমি তখনো পুরোপুরি জাগিনি। রাতদুপুরে এই গুরুতর আলোচনা এড়াবার জন্যে ঘুমজড়ানো স্বরেই উত্তর দিলাম: "আমি এ সম্বন্ধে তেমন কিছু ভাবিনি। কখনো মনে হয়, তারা আমাদের চেয়ে খারাপ, কখনো মনে হয় ভালো।"

পিটার বলল: "এ তোমার ফাঁকিবাজির কথা। এ বিষয়ে নিশ্চয় তোমার একটা মত আছে।"

আমি জবাব দিলাম: "থাকতে পারে। কিন্তু আমার মত আমি সবসময় পরিষ্কার ক'রে প্রকাশ করতে পারি না।"

পিটার তখন বলল: "বুঝেছি, তোমার মত তুমি বলতে চাও না। যাই হোক, যারা মনে করে মেয়েরা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ, আমি তাদের একেবারেই সমর্থন করি না। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কোনোমতেই খারাপ নয়। কেন খারাপ হবে তারা? (কেন যে কে কী হয় তা তুমিও ঠিক জানো না, পিটার, আমিও না)। যেটুকু নিকৃষ্টতা তাদের মধ্যে দেখা যায়, তা পুরুষদের মধ্যেও আছে। আর যে-দোষ শুধু তাদের মধ্যেই আছে, আমাদের মধ্যে নেই, তার জন্যে দায়ী তাদের অবস্থা, তাদের অসহায়তা, তার জন্যে দায়ী পুরুষেরা।"

আমি শুনেই যাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, আজ তোমার কী হয়েছে পিটার।

সে ব'লে চলল: "মেয়েরা মূলত অত্যন্ত ভালো। ওদের ভেতরে এত মমতা থাকে, এত সহানুভূতি থাকে যে, তার নির্গমনের পথ যদি পুরুষেরা খুলে দিতে পারত, তাহলে বিশ্বসংসারের সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। তোমার একটা কবিতা তুমি একদিন অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছিলে। তাতে তুমি সূর্য-চন্দ্রের উপমা এনেছিলে। উপমেয় ছিল পুরুষ ও নারী। মেয়েদের স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যের কথা অবিশ্যি তুমি বলেছিলে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলতে চেয়েছিলে যে তা সূর্যের তাপ থেকে ধার-করা। ভুল, পলাশ, ভুল। সম্পূর্ণ ভুল। স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য মেয়েদের স্বভাবেই নিহিত।"

পিটার এত আবেগের সঙ্গে কথা বলছিল যে, আমার বুঝতে অসুবিধে হল না, সে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে কোনো সাধারণ মত ব্যক্ত করছে না. সব মেয়ে বলতে তার মনশ্চক্ষে একটি মেয়ে রক্ত-মাংসের মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। পিটার আজ জ্যোৎস্নায় স্নান ক'রে এসেছে। তারই নেশায় সে বিভোর।

তার কথা শুনতে শুনতে আমি আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। তার শেষ তিনটে কথার পুনরাবৃত্তি আমার মনে আছে: "মেয়েরা খুব ভালো. মেয়েরা, খুব ভালো।"

প্যারিসে থাকতে দেখেছি, পিটার অন্যদের তুলনায় কম কথা বলে। কিন্তু জেনিভায় এই ক'দিন তার কথার বিরাম ছিল না। তার ভেতরের মানুষটা যে আসলে কী তাই যেন সে আমাকে জানাতে চাইত। এক সন্ধেয় বেড়ানোর সময় সে বলল: "আমি আর আমেরিকায় ফিরব না ভাবছি।"

—"কেন?"

—"যদিও সে-দেশে আমি জন্মেছি, তবু সেখানে নিজেকে আমার বিদেশী ব'লে মনে হয়।"

—"কী কারণে তুমি এমন অনুভব করো?"

—"আমেরিকানদের অনেক রীতিনীতি অনেক কাজকর্ম আমি অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করি। সেগুলোর সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই আমি খাপ খাওয়াতে পারি না।"

—"সে-কথা যদি বলো তাহলে যে-কোনো দেশের যে-কোনো লোকই তা বলতে পারে। স্বদেশকে অস্বীকার করলেই কি অন্যায় ও অযৌক্তিকতার প্রতিকার হ'য়ে যায়? আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।"

পিটার একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "কিন্তু আমেরিকার বাইরে পৃথিবীর চারিদিকে যে-মার্কিন রাজনীতির খেলা চলছে দেখি, আমি তা আদৌ সমর্থন করি না, আমি তার ঘোর বিরোধী। এই আচরণ থেকে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে চাই। অন্তত সেই কারণে আমি দেশে ফিরতে চাই না। এ আমার প্রতিবাদ।"

আমি বললাম: "এ প্রতিবাদের কী সার্থকতা আছে আমি বুঝি না। যে-রাজনীতিকে তুমি গর্হিত মনে করো, স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিলে তুমি যদি তা বদ্‌লাবার চেষ্টা না-করো, তাহলে সেই রাজনীতি চলতেই থাকবে। কথাটা যদিও শুনতে সস্তা, তবু সত্যি। তোমার প্রতিবাদের চিহ্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও দেখা যাবে না। লোকে তো বুঝতেই পারবে না তুমি ইয়োরোপে রয়েছো ক্ষোভ প্রকাশ করতে, না, ফুর্তি করতে।"

পিটার এ নিয়ে আর তর্ক করেনি। তবে অনেকক্ষণ ধ'রে সে বলেছিল স্বদেশ সম্বন্ধে তার হৃদয়ের যন্ত্রণা।

পনেরোটা দিন যে এত তাড়াতাড়ি কেটে যাবে বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্যালেণ্ডারকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বিদায়ের নির্দিষ্ট তারিখ অনিবার্যভাবে এসে গেল। সন্ধের ট্রেনে আমার যাত্রা। সকাল থেকেই আমার মনটা ভারী। এই দিনগুলো যে ফিরে আসবে না তা তো আমার জানা। কিন্তু পিটারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ কি আমি জীবনে আর পাব না?

পিটার দেখলাম কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত। সাধারণত সে তার

পেশাদারী কাজের জের বাড়িতে টেনে আনে না। সেদিন তার ব্যতিক্রম লক্ষ করলাম। মাঝে মাঝে অবিশ্যি আমার সঙ্গে সে কথাবার্তা বলছিল, তবে সেটা হাস্য-পরিহাসের সুরে। বিকেলের দিকে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আবার ফিরে এল। এক সময় সে আমাকে জিগ্যেস করল আমি কবে দেশে ফিরছি। মাসখানেক বাদে, আমি জানালাম। জাহাজে জায়গা রিজার্ভ্‌ড্‌ হ'য়ে গিয়েছিল, সুতরাং তারিখটাও জানিয়ে দিলাম। হঠাৎ সে বলল: "তোমার সঙ্গে পরিচয় হলে মারিয়া খুব খুশী হত।"

মারিয়া! এই প্রথম তার মুখে এ নাম শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে সে বলল: "মারিয়া আমার বিশেষ বন্ধু, ইতালীর মেয়ে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসত, কিন্তু অসুস্থ মা'র শুশ্রূষায় সে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে যে বাড়ি থেকে বেরোবার অবসর পাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি আর মারিয়া তোমার যাবার দিন লণ্ডনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব।"

আমাকে ট্রেনে তুলতে পিটার স্টেশনে এল। ট্রেনে ভিড় একেবারেই ছিল না। যে-কোনো কামরায় উঠলেই চলে। আমরা খানিকক্ষণ প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করলাম, এলোমেলো অনেক কথা বললাম। অবশেষে ট্রেন ছাড়বার সময় হল। আমি কামরায় উঠতে যাচ্ছি এমন সময় পিটার হঠাৎ আমার হাত টেনে ধরল, চেঁচিয়ে ব'লে উঠল: "না, না, এ কামরায় নয়। এ কামরায় তুমি উঠো না।"

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। তখন সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বলল: "এ কামরাটা ইঞ্জিনের ঠিক পরেই। যদি অ্যাক্সিডেণ্ট হয়, তাহলে এটা চুরমার হ'য়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না। ফেরো, পেছনের কোনো কামরায় উঠে পড়ো।"

এই ব'লে আমার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে পিটার উল্টো দিকে দৌড়োল। আমাকেও তার সঙ্গে দৌড়োতে হল। ট্রেনের শেষ দিকের একটা কামরার সামনে এসে সুটকেস আমার হাতে দিয়ে সে বলল: "এইখানে ওঠো।"

আমি উঠে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ার সঙ্কেত হয়েছে। পিটার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তার হাতটা চেপে ধরলাম। তার মুঠোর শক্ত চাপ আমি অনুভব করলাম। ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে। আমি চেঁচিয়ে বললাম: "আমি চ'লে যাবার আগে এসো লণ্ডনে।" পিটার মাথা কাৎ করল।

আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছি। পিটর প্ল্যাটফর্মে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ তার শরীরটা ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। ছোট হতে হতে শিশুর মতো। তারপর মিলিয়ে গেল।

১৩

ইম্‌রের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল রাস্তায়। আমাকে দেখে সে লাফিয়ে উঠল। গলগল ক'রে ব'লে গেল অনেক খবর। তার কাছ থেকে জানলাম ফ্রাঁসোয়ার খুব অসুখ। আরো জানলাম জন এবং এলেনি গ্রীসে চ'লে গিয়েছে। আমি কবে দেশে ফিরছি জিগ্যেস ক'রে যখন সে শুনল দিন প্রায় এসে পড়েছে, তখন ইম্‌রের উচ্ছলতা যেন হঠাৎ থমকে গেল। তার মুখটা নিষ্প্রভ দেখাল। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই আবার তার বাক্যস্রোত ছুটল। বন্ধুদের এইভাবে ছেড়ে যাওয়া যে অন্যায়, এই মন্তব্য ক'রে সে আমাকে প্রশ্ন করল, চ'লে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে কিনা। আমি বললাম, হয়তো হচ্ছে, কিন্তু আমার অনুভূতিগুলো এমন জট পাকিয়ে গিয়েছে যে কোন্‌টা কী আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তাতে সে জোর গলায় ঘোষণা করল যে, আমি বুঝতে পারি আর না-ই পারি, আমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে, এবং তারও হচ্ছে। পরিশেষে আমাকে সে অনুরোধ করল আমি যেন তাকে চিঠি লিখি। সে যে আমার চিঠির জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকবে না এবং আমি চোখের আড়ালে গেলে আমার অস্তিত্বই বেমালুম ভুলে যাবে, আমার এই ধারণাটা আমি আর প্রকাশ করলাম না। আর আমি যে তাকে

চিঠি লিখতে ইচ্ছে বোধ করব না, এ কথাটাও তো বলা যায় না। তাই শুধু বললাম, আচ্ছা। হাত ঝাঁকিয়ে সে রাস্তাতেই আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে দিল।

সেই দিনই সন্ধ্যে হতে না-হতে উপস্থিত হলাম ফ্রাঁসোয়াদের বাড়িতে। আমি বাইরের ঘরে কিছুক্ষণ বসার পর ওদেৎ বেরিয়ে এল। আগের মতোই পরিপাটি সাজ তার। হালকা প্রসাধনে তার মুখ যেন ফুলের মতো ফোটা। তবু ঝড় হ'য়ে যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে সেই মুখে। চোখ দুটো হাসছে, কিন্তু সেই হাসির ভেতরে কোথায় যেন ক্লান্তি জ'মে আছে।

ওদেৎ ঘরে ঢুকেই বলল: "কতদিন তোমায় দেখিনি, লাশ। ভাবছিলাম, আমাদের বুঝি ভুলেই গেলে।"

ফ্রাঁসোয়ার অসুখের কথা জিগ্যেস করলে সে জানাল যে, ফ্রাঁসোয়ার গুরুতর আন্ত্রিক ব্যাধি হয়েছিল, তবে এখন সে আরোগ্যের পথে। অতঃপর আমাকে বলল: "চলো, ভেতরে যাই। ফ্রাঁসোয়া তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

ভেতরে গিয়ে দেখি ফ্রাঁসোয়া শীর্ণ দেহে বিছানায় শুয়ে আছে। মাথার কাছে ছোট টেবিলের উপর ফুলদানিতে একগুচ্ছ গোলাপ। হাল্‌কা গোলাপি রঙের পর্দা দিয়ে জানলার কাঁচগুলো ঢাকা। এই ফুল এই রং তো প্রেমের, আমি মনে মনে বললাম। ঘরের একপাশে একটা নিচু র‍্যাকে বই সাজানো। একটা খোলা বই উপরের তাকে ওল্‌টানো রয়েছে। পরিচ্ছন্নতা ঘরের সর্বত্র, এমন কি হাওয়ায়।

আমি ঢুকতে ফ্রাঁসোয়া বলল: "এসো পল। আমার তো ভয় হয়েছিল, বুঝি আমাদের দেখা না-দিয়েই তুমি দেশে পালাবে।"

আমি হাসলাম। জিগ্যেস করলাম সে কেমন আছে এখন।

ফ্রাঁসোয়া বলল: "মোটামুটি ভালো। ক্রমেই বেশী ভালো বোধ করছি। মৃত্যুর দুয়োর থেকে তো ফিরে এলাম।" ওদেৎকে দেখিয়ে যোগ করল: "ও কিছুতেই যেতে দিল না।"

ওদেতের যে-দৃষ্টিটায় ছোটখাট নানান্ খেলা দেখতাম, সেই দৃষ্টি এখন অত্যন্ত কোমল মনে হল। কোমল আর গভীর। সে ফ্রাঁসোয়ার দিকে মুখটা তুলল। তাতে যেন সলজ্জ আনন্দের রং ধরল।

ফ্রাঁসোয়া তার কথার জের টেনে ব'লে চলল: "ডাক্তাররা আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওদেতের আপত্তিতে পারেননি। পথ্য ও শুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা যে এই রোগে একান্ত দরকার সেই যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ওদেৎ জানিয়েছিল তার পূর্ণ দায়িত্ব সে নিচ্ছে, ডাক্তাররা দেখুন-না তার কোনো ত্রুটি হয় কিনা।

আমি মন্তব্য করলাম: "কিন্তু হাসপাতালে পাঠানোই তো এ দেশের রেওয়াজ।"

ফ্রাঁসোয়া বলল: "সে-কথা ওদেৎকে বলা হয়েছিল। ও জবাব দিয়েছিল, তা ও জানে। কিন্তু আমাকে হাসপাতালে পাঠালে সেই সময়টা ও কী করবে? ভ্যারেণ্ডা ভাজবে? তারপর দিন নেই রাত নেই, ওর সে কী পরিশ্রম। কিছুতে এক বিন্দু গাফিলতি কখনো হয়নি। ডাক্তাররা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর সে-সময় আমি দেখেছি ওদেৎ সর্বক্ষণ সজাগ। রাত্তিরে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি উঃ আঃ করতেই ধড়মড় ক'রে উঠে আমার কাছে এসেছে। আর এখন যে আমি ভালো হচ্ছি তাতেও ওর কাজের কামাই নেই। দেখছো-না বই খোলা, এতক্ষণ ঐ বইটা প'ড়ে আমাকে শোনাচ্ছিল।"

এতখানি ব'লে ফ্রাঁসোয়া হাঁপাতে লাগল। ওদেৎ ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল এবং ভয় দেখাল সে বেশি কথা বললে আমাকে চ'লে যেতে বলবে। ফ্রাঁসোয়া দম নিয়ে মৃদু হেসে বলল: "এমন বউ কার হয়?"

আমি টিপ্পনী কাটলাম: "আমার এতদিন ধারণা ছিল তোমার বউটি ভীষণ ঝগড়াটে আর অকর্মা। এখন দেখছি তা নয়। বউ খুব ভালো পেয়েছো তুমি।"

ওদেৎ ফরফর ক'রে বলল: "থাক লাশ, আর তারিফ করতে হবে না। আমি ঝগড়াটে তো বটেই। নইলে কি যমের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাই? আমাকে এত সহজে কেউ হাটিয়ে দেবে তেমন বাঁদী আমি নই।"

ফ্রাঁসোয়া আস্তে আস্তে, যেন আপন মনে, বলল: "আমি অসুখের মধ্যে অনেক সময় ভাবতাম, ওদেৎ আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত চেষ্টা করছে কেন। আমি যদি চ'লে যাই, তাহলে ও তো এমন কাউকে সঙ্গী হিসাবে পেতে পারবে যে আমার চেয়ে যোগ্য, আমার চেয়ে বেশী সহনীয়।"

উত্তরটা ওদেৎ আমার দিকে তাকিয়ে দিল: "এই লোকটার সঙ্গে লাঠালাঠি করার, এর মাথায় হাত বুলোনোর, একে বোকা বোঝানোর এমন অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে যে এর জায়গায় অন্য কেউ এলেই আমার অসুবিধে হবে। সেটা চিন্তা করাও আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমার এই লড়াই।" তারপর বলল: "ওসব চুলোয় যাক। লাশ ভারতবর্ষে ফিরতে নিশ্চয় তোমার আনন্দ হচ্ছে।"

বললাম: "হচ্ছে না বললে মিথ্যা ভাষণ হয়।"

ওদেৎ মন্তব্য করল: "আনন্দ হওয়াই তো উচিত। সেখানে তোমার কত প্রিয়জন রয়েছে। কিন্তু তুমি চ'লে গেলে আমার বড় মুশকিল হবে। কাকে আর আমি লাশ ব'লে ডাকব?"

—"ডাকবার মতো অনেক লোক তুমি পাবে।"

—"কিন্তু তোমার মতো কাউকে পাব না। যাদের পাব তারা শেষ পর্যন্ত নামটার মর্যাদা রাখবে না, আমি জানি।"

চ'লে যাবার আগে ওদেৎকে আমার হঠাৎ বড় নিকট মনে হচ্ছে। এরপরে কতদিন আমি নামের মর্যাদা রাখতে পারতাম? আমার ভীরুতার বেড়াটা কি ভেঙে পড়ত না? আমার মন বলল, না। ফ্রাঁসোয়া রয়েছে, তার রোগভোগের ইতিহাস রয়েছে। আমি ভীরুই থেকে যেতাম।

বিদায় নেওয়ার সময় ফ্রাঁসোয়া ক্লান্ত স্বরে বলল: "পল,

তোমার কথা আমাদের মাঝে মাঝে মনে পড়বে, তোমার কথা আমরা মাঝে মাঝে বলব।"

দরজা পর্যন্ত ওদেৎ আমাকে এগিয়ে দিল। শেষ কথা বলল : "তুমি যদি প্যারিসে কখনো আসো একবার খোঁজ কোরো আমরা ইহলোকে আছি কিনা, অবিশ্যি আমাদের কথা যদি তোমার মনে থাকে।"

ওদেতের ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি এই প্রথম আমি দেখলাম।

১৪

মোনিকদের শিক্ষিকা-নিবাসে একবার যেতেই হল। প্যারিসে ফিরেই শুনেছি, মোনিক কয়েকবার আমার খোঁজ করেছিল। আমি তাকে আমার যাত্রার তারিখ এখনো জানাইনি। তারিখটা জানবার জন্যে সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে বুঝলাম।

ইদানীং তার বাংলা শেখার উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তাতে আমি অখুশী নই। আমার পণ্ডশ্রম অনেকখানি বেঁচেছে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বাঁচিনি। প্রায়ই তাদের ওখানে যাবার জন্যে সে আমাকে পীড়াপীড়ি করে। গিয়ে আমি কী করব ? ভারতের, বিশেষত বাংলার গৌরবগাথা শুনব ? সে-গৌরব তো আমার জানা। আমার রক্তেই তা প্রবাহিত, যে-রক্ত অনেক লাল কণিকা হারিয়ে এখন বেশ নিস্তেজ। তবু মাঝে মাঝে যাই ওখানে, না-গেলে অকৃতজ্ঞতা হয়। জাতিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই। এই বিদেশে আমার সুখ-সুবিধে সম্বন্ধে, আমার স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মোনিক যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে এবং এখনো ঘামায়। সে আবার ইদানীং আমাকে ভাই হিসেবে বরণ করেছে। আমাকে ডাকে 'পলাশদাদা'। অবিশ্যি যখন সে সঙ্কল্প ক'রে ভগ্নীত্ব প্রকাশ করতে চায় তখন। নইলে এমনিতে ব'লে ফ্যালে 'পলাশ'।

আমাকে দাদা ব'লে মোনিক কী সান্ত্বনা পায় জানি না। অথচ

ঐ রকম কিছু না-ব'লে সে করত কী? আমি দাদা হ'য়ে গেলাম রাতারাতি। একদিন সে হঠাৎ এসে বলল: "শুনলাম তোমার বাগ্‌দত্তা রয়েছে ভারতবর্ষে। কই, তুমি তো আমায় কখনো তা বলোনি।"

অনুমান করলাম, আমার কোনো ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে খবরটা সে শুনেছে। আমি উত্তর দিলাম: "বলার কোনো কারণ ছিল না ব'লেই বলিনি।"

শুনে মোনিক খুব গম্ভীর হ'য়ে গেল। অবিশ্যি তখনই একটু সহজ হ'য়ে জিগ্যেস করল: "তাহলে তোমার সঙ্গে কী সম্পক পাতাব?"

আমি বললাম: "কেন, সম্পর্ক একটা তো ছিলই। ছাত্রী আর শিক্ষকের। অন্য সম্পর্কের দরকার কী?"

সে মাথা নেড়ে বলল: "ব্যক্তির স্তরে একটা সম্পর্ক দরকার বৈকি। নইলে পরস্পরকে চেনা যায় না।"

আমি ফরাসী কায়দায় ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দিলাম: "ভেবে গ্যাখো কী সম্পর্ক পাতাতে পারো।"

মনে মনে আমি ভাবলাম, সম্পর্ক পাতিয়ে চেনা, ফর্মুলাটা বেশ। তোমার আর মানুষ চেনবার ভাবনা নেই, মোনিক। এবার আমাকে তুমি চিনে ফ্যালো। তবে চিনে তোমার কী লাভ হবে, সে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

সে তখন জিগ্যেস করল, বড় ভাইকে আমরা কী ব'লে ডাকি। 'দাদা' বলায় একটু হাসি অবিশ্যি পেয়েছিল মোনিকের। কারণ শব্দটা উচ্চারিত হতেই ফরাসী মানেটা তার মনে এসেছিল। কিন্তু কৌতুকবোধ কাটিয়ে সে আমাকে দাদা ব'লেই মেনে নিল।

মোনিকদের ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল। মেয়েরা সবাই তখন কাজ থেকে ফিরেছে। মোনিক আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। আমাকে কফি ক'রে খাওয়াল, পেস্ট্রি খাওয়াল। আমি আমার আসন্ন যাত্রার তারিখটা তাকে জানালাম। যাত্রার

আয়োজনের কথা যখন বলছি তখন দেখি মোনিকের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মোনিক কাঁদছে।

আমি ভীষণ বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। এমনিতে কেউ কাঁদলেই আমি অস্থির বোধ করি, আর যে-কান্নার সঙ্গে আমার কোনো সংযোগ আছে তার সামনে তো আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়ি। আমার নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। একদিন মঞ্জুবৌদিকে কাঁদতে দেখেছিলাম। স্পষ্ট কোনো উপলক্ষ্য ছিল না। এখন ঠিক মনে নেই কোন্ এক উপন্যাসের নর-নারীর জটিল আচরণ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। হঠাৎ মঞ্জুবৌদি চোখে আঁচল চেপে ধরল। কেন তার কান্না পেয়েছিল তা সে বলেনি। আমার জন্যে নয় ভেবেও আমি কিন্তু স্বস্তি পাইনি।

আচ্ছা, আমার জন্যে প্রাণ খুলে কে কেঁদেছে এ পর্যন্ত? একমাত্র মা'র কথাই মনে পড়ে। মা কিন্তু পরিষ্কার ক'রে কাঁদত। আমার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'ত না কোন্ প্রত্যক্ষ কারণে আমার জন্যে মা কাঁদছে। আমার শক্ত ব্যামো হলে মা কাঁদত, কলকাতার রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে আসতে খুব দেরি হ'লে মা কাঁদত, মা'র উপর রাগ ক'রে আমি না-খেলে মা কাঁদত, এই রকম।

কিন্তু মোনিক কাঁদছে কেন? সে কি সত্যি সত্যি আমাকে ভাইয়ের মতো ছাখে যে-ভাই এখন দূরে চ'লে যাবে? নাকি অন্য কোনো আবেগে সে বিপর্যস্ত? আমি জানতে চাই না। কারণ আমি তার কোনো আবেগের শরিক নই। তবু আমার মন খারাপ হ'য়ে গেল। কী সান্ত্বনার কথা তাকে আমি বলব? শুধু বললাম, সে যেন তার স্বপ্নের ভারতবর্ষ একবার দেখে আসে। তাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে মন খারাপ নিয়েই আমি বাড়ি ফিরলাম।

১৫

গুপ্তাকে নিয়ে প্যারিস পরিক্রমার নেশা ইরেনের কমেছে। ভেতরের ও বাইরের যে-শূন্যতা সে ভরাতে চেয়েছিল তা ভরেনি। তার কথাবার্তা থেকে সেটা বুঝলাম। আমি জেনিভা থেকে ফেরার পর এক দুপুরে সে আমার হোটেলে এল। আমি কবে প্যারিসে ফিরব এবং কবে ভারতবর্ষের পথে লণ্ডন রওনা দেব তা সে ও মাদ্‌লেন জানত। ইরেন এসে জানতে চাইল আমি যাত্রার জন্যে কতদূর প্রস্তুত হয়েছি এবং আমার কেনাকাটা কী বাকী আছে। কোন্ জিনিস অঞ্জলির জন্যে এবং কোন্ জিনিস অন্যদের জন্যে আমি নিতে পারি তার পরামর্শও দিল। যখন সে শুনল আমি তখনো পর্যন্ত বিশেষ কিছু কিনিনি, তখন বলল: "তুমি কোনো কাজের নও, পলাশ। খালি কবিতা ভাবলেই হ'য়ে গেল? চলো, তোমার জিনিসপত্র কিনে দিই। আর সময় কই, দশটা দিন তো মোটে হাতে।" মানে এখন আবার তার অবসর। কিম্বা হয়তো আমার সম্বন্ধে আবার সে হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এই প'ড়ে-পাওয়া আত্মীয়টির জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করছে।

আমি বললাম: "চলো যাই। তোমার সঙ্গে গেলে আমার সুবিধে হবে। বিশেষত মেয়েদের জিনিস কেনার ব্যাপারে। ও আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু একবার পোস্টাপিস হ'য়ে যাব। কয়েকটা বই পার্সেল করতে হবে।"

পোস্টাপিসে গেলাম জনকে বই পাঠাতে। তারই বই। আমি প্যারিসে ফেরার দিনকয়েক বাদে জনের একটা চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠির বয়ান এই রকম: "এলেক্সি ও আমি গ্রীসে চ'লে এসেছি শুনেছো বোধহয়। এখানে এসে আমরা বিয়ে করেছি। কোথায় আমরা বসবাস করব তা এখনো ঠিক করিনি, তবে একবার প্যারিসে ফিরব। তোমার সঙ্গে আমাদের আর

দেখা হবে ব'লে মনে হয় না। যাই হোক, তোমার অল্পকালের সঙ্গ আমাদের যে-আনন্দ দিয়েছে তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।" পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে: "ভালো কথা, তুমি আমার কয়েকটা বই পড়তে নিয়েছিলে। সেগুলো যদি এখানে ফেরত পাঠাও, বাধিত হব।"

আমি চিঠি প'ড়ে মনে মনে ব'লে উঠেছিলাম: "বাহবা!" আর ভেবেছিলাম, এলেনি তাহলে তার বড় হিসেবটা নির্ভুল ক'রেই ক'ষে ফেলেছে।

পোস্টাপিসের কাজ সারা হ'লে ইরেন আমাকে নিয়ে টোটো ক'রে দোকানে দোকানে ঘুরল। শুধু সেদিনই নয়, তারপরেও। জিনিসপত্র যা আমার কেনবার সাধ্য ছিল, কিনে ফেললাম। লণ্ডনে যাওয়ার আগের রাত্তিরে ইরেনদের ওখানে খেলাম। মাদ্‌লেনের মুখে হাসি লেগেই ছিল, প্রথম দিন হাসপাতালে যে-রকম দেখেছিলাম সেই রকম। কিন্তু তার মধ্যে একটা অস্থিরতার ভাব টের পাচ্ছিলাম। সে বারেবারে আমার কাছে এসে বলছিল, আমি যেন শরীরের যত্ন নিই, খাওয়া সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকি, প্রোটিন যেন বেশী খাই, ফ্যাট খুব কম। এই সব। আমি নানান্ কথা বলছি। মনে হচ্ছে অনেক কথা বলবার আছে, অথচ সময় বড় কম। রাত বাড়ছে। মাদ্‌লেন একসময় উঠে বলল, সে শুতে যাবে, সকালে তার হাসপাতালে ডিউটি আছে। ঘর থেকে চ'লে যাওয়ার সময় সে আমার দুই হাত চেপে ধ'রে আমার নির্বিঘ্ন যাত্রার কামনা জানিয়ে গেল।

শার্লের কথা জিগ্যেস করতে আমার খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু করিনি। তাকে আমি শুভেচ্ছা জানাতে চাই। কিন্তু ইরেনের মারফত জানাবার কোনো মানে হয় না।

পরদিন ভোরে ইরেন আমার হোটেলে এসে হাজির হল। আমরা দু'জনে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে এলাম। ভারী বাক্সপ্যাঁটরা আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখন সঙ্গে নেবার জিনিসপত্র তুলে দিলাম। ইরেনের হাতে একটা প্যাকেট ছিল, আমার এবং অঞ্জলির জন্যে উপহারদ্রব্য।

ইরেন স্টেশনে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আগের দিন বাড়িতেই আমি তাকে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম: "এমনিতে তো আমাদের অনেক দুঃখ আছে। তা একটা দুঃখকে আর রবারের মতো টেনে বাড়াবে কেন?" আমি ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ইরেন আমার কাঁধ দুটো ধ'রে বলল: "অঞ্জলিকে আমার প্রীতি জানিয়ো। তোমার পৌঁছাসংবাদ একটা পেলে নিশ্চিন্ত হব।" আমার কষ্ট হচ্ছিল। মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, দেব। সব শেষে সে বলল: "আমি তোমাকে চিঠি লিখব, পলাশ। বোধহয় আমি একবার ভারতবর্ষে যাব।" তারপর ট্যাক্সি ছাড়ার জন্যে অপেক্ষা না-ক'রেই সে পেছন ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

শান্তির তৃষ্ণায় তুমি যে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ছুটবে তা আমি জানি, ইরেন।

১৩

লণ্ডনে বোট-ট্রেন ধরবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পিটারের জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করেছি। তাকে আমার লণ্ডনের ঠিকানা জানিয়েছিলাম। জেনিভায় সে বলেছিল আসবার চেষ্টা করবে, মারিয়াকে নিয়ে। পিটারের চেষ্টার উপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে এল না। হয়তো কিছু ঘটেছে যার জন্যে আসতে পারেনি। কিম্বা হয়তো তার আসবার সত্যিকার কোনো অভিলাষ ছিল না। এই কথাটা মনে আসতেই আমার নিজের উপর রাগ হল। কি ক'রে আমি পিটার সম্বন্ধে এমন ভাবতে পারলাম? আমার নিজের মধ্যেই নিশ্চয় এমন প্রবণতা কোথাও লুকিয়ে আছে যা মানুষকে ভাঁওতা দিতে চায়, যা হৃদয়কে শঠ হতে শেখায়।

বিমর্ষ মনেই আমি ট্রেনে চড়লাম। ট্রেন ছাড়বার আর দেরি নেই। নাঃ, পিটারের সঙ্গে আর দেখা হল না। তবু জানলা দিয়ে এদিকে-ওদিকে দেখছি। প্রতীক্ষার ব্যাপারটাই এই রকম। হাল

ছেড়েও ছাড়া যায় না। এমন সময়, ঐ তো পিটার! প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথে তাকে দেখা যাচ্ছে। সে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ঢুকছে। সঙ্গে একটি মেয়ে। সেও দৌড়োচ্ছে। আমি কামরা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ওরা কাছে এসে গেল। পিটার চেঁচিয়ে বলল, প্লেন গোলমাল করায় ওদের দেরি হ'য়ে গিয়েছে। ওরা আরো কাছে এসে দাঁড়াল। পিটার বলল: "এই মারিয়া আর এই পলাশ।"

মারিয়া! প্ল্যাটফর্মের হৈ-হট্টগোল এক মুহূর্তের জন্যে লুপ্ত হ'য়ে গেল। আমার মনে হল শান্তি ঝরছে নিঃশব্দে। কালো চুল, কালো চোখ; মেয়েটি যেন সমস্ত দহনকে জুড়িয়ে দেবার স্নিগ্ধতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমরা দু'জন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলাম। পিটারও আমার সঙ্গে করমর্দন করল। কথা বলার সময় নেই। ট্রেন ছাড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি কামরায় গিয়ে উঠলাম। আমার পেছনে আরো লোক উঠে আমাকে ভেতরে ঠেলে দিল। পিটার মারিয়াকে আর দেখতে পেলাম না। শুধু পিটারের চিৎকার কানে এল: "তোমার খবর দিয়ো, পলাশ।"

দ্বিতীয় পর্ব

ভারতবর্ষ

১

আমি ভাবতেও পারিনি মারিয়া আমাকে দূর থেকে দেখামাত্র চিনবে। শুধু তো একদিন কয়েকটা মুহূর্ত আমাকে ও দেখেছিল। সেই লণ্ডনের স্টেশনে বোট-ট্রেন ছাড়ার সময়। সে কি আজকের কথা? তারপর দশ-দশটা বছর আমরা পার হ'য়ে এসেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার ক্ষণকালের মূর্তি ওর মনের পটে একটুও ঝাপ্‌সা হয়নি, দশটা বছরের অদলবদল নিয়েও তাজা রয়েছে। আশ্চর্য! কোনো কোনো মানুষ কেন স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে আর কেনই বা অন্যেরা তলিয়ে যায়? নিশ্চয় ইচ্ছের জন্যে এমন হয়। সব ইচ্ছে যে সব সময় অনুভূতিগুলোকে চিনে চিনে আসে, তা নয়। এক একটা ইচ্ছে চোখ বন্ধ ক'রেই এসে পড়ে। যেন অন্ধ। সেখানে জানিত ব'লে কিছু নেই। অজান্তেই হয়তো ইচ্ছে হয় এই মানুষটাকে আমি ভুলব না। আমাকে মনে রাখবার ইচ্ছে মারিয়ার হয়েছিল কিনা তা কি ও বলতে পারে? বলতে পারলেও আমি কি কখনো তা জানতে পারব? জানি বা না-ই জানি, ও যে আমাকে ভোলেনি এতেই আমার এক অপূর্ব আনন্দ হল। কারো হাত নাড়া দেখে এমন আনন্দ আমার কখনো হয়নি।

পিটারের দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না। সে সামনে তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু সমস্ত মানুষ আর সমস্ত দৃশ্যকে যেন একসঙ্গে ধরবার চেষ্টা করছিল, বিশেষ কাউকে নয়, বিশেষ কিছুকে নয়। যেন একটা নতুন গোটা পৃথিবীকে সে বুঝে নিতে চাইছে। মারিয়া পাশ থেকে তাকে কী যেন বলল। এখন সে আমাকে স্পষ্ট ক'রে দেখে হাসিতে

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তারপর দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে এল। মারিয়া এল আরো আস্তে।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম দমদম বিমান বন্দরের যে-বেষ্টনী পর্যন্ত যাত্রীদের আত্মীয়বন্ধুরা যেতে পারে সেইখানে। আমি একাই ছিলাম। অঞ্জলিকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে আসতে, বিমানবন্দরে গিয়ে পিটার ও মারিয়াকে অভ্যর্থনা করতে। তারা যখন আমাদের অতিথি, তখন সেটাই তো স্বাভাবিক। অবিশ্যি আমি সৌজন্যের কথা ভেবে বলিনি। তারা আমাদের বন্ধু, সেইজন্যে বলেছিলাম। কিন্তু অঞ্জলি রাজী হয়নি। সে নানান্ কাজের নাম ক'রে বাড়িতে থাকার পক্ষে যুক্তি দেখাল। জিনিসপত্র গোছগাছ বাকী আছে, ঘরের বিলি ব্যবস্থা করা দরকার, খাবার দাবার তৈরি করতে হবে, এইসব। কিন্তু এগুলো আমার মনে হল, অজুহাত। আসলে সে আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতে ইচ্ছুক নয়। নইলে ও-সব কাজ তো সে আগেই সেরে রাখতে পারত। না-রাখলেও মহাভারত অশুদ্ধ হত না। পিটার ও-সব নিয়ে মাথাই ঘামাত না। অসুবিধে হলেও সে আপনজনের মতনই তা গায়ে মাখত না। আমার বন্ধু পিটারকে তো আমি জানি। আর মারিয়া যখন তার স্ত্রী, তখন মারিয়াও বোধহয় সে-রকম অবস্থা নির্বিকারভাবে মেনে নিত। বোধহয়। আমি নিশ্চিতভাবে তা ঘোষণা করতে পারি না, যেমন আমি পারি পিটারের বেলায়।

স্বামী কোনো কিছু মেনে নিচ্ছে ব'লে স্ত্রীও মেনে নেবে, এমন কোনো কথা নেই। কই, অঞ্জলি তো তা নেয় না। অনেক সময় আমি যাকে ভালো মনে করি, অঞ্জলি তাকে খারাপ ভাবে। অনেক সময় যে-সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মতলব কিছু দেখি না, অঞ্জলি তাতে মতলব আবিষ্কার করে। অথচ এই অঞ্জলি মানুষের কষ্ট দেখলে কেঁদে ফ্যালে, কেউ কোনো করুণ আবেদন জানালে ভীষণ বিচলিত হয়। অন্যের চিন্তা, অন্যের প্রতি সমবেদনা তার অপর্যাপ্ত। তা যদি তার না থাকবে, তাহলে সে মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যে

রাজনীতিতে নামবে কেন? তবে অঞ্জলি এমন করে কেন? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন চায় লোকেরা স্বতন্ত্র এক একজন ব্যক্তি হিসেবে তার কাছে নত হ'য়ে আসুক, নিজের দুঃখ তার সামনে খুলে ধরুক। সে-রকম না হলে তার ব্যক্তিসত্তা অন্যকে প্রতিরোধ করে। তাছাড়া এও আমার মনে হয় যে আমাকে নিয়ে নিশ্চয় তার কোন ভয় আছে, যে জন্যে সে আমার ধারণার বিরুদ্ধে যায়। তার দিক থেকে আমার দৃষ্টি স'রে যাবে, এই ভয় কি তাকে চেপে থাকে?

মনোভাবের এ রকম পার্থক্য দু' এক সময় আমার পক্ষে ক্লেশকর হলেও আমি তা স্বাভাবিক ব'লে ধ'রে নিয়েছি। স্বাভাবিকই তো। মেয়েদের ব্যক্তিত্ব যুগযুগান্তের চাপ ঠেলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিশেষ ক'রে অঞ্জলির মতো রাজনীতি-করা মেয়ের ক্ষেত্রে সেটা খুবই সত্যি। স্বামী-স্ত্রীর দুই ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় অভিন্ন হ'তে পারে না। আমাদের দু'জনের মনোভাব ও আচরণ তো দুই রকম হবেই। তবে আমাকে স্বীকার করতে হবে আমাদের দু'জনের প্রবণতা এক এক সময় এমন বিপরীতমুখী হ'য়ে দাঁড়ায় যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

মারিয়া যে অসুবিধে হ'লে বিরক্ত হবে না, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় ত্রুটি হলে গ্রাহ্য করবে না, এটা আমার বস্তুত মনে হয়েছিল সে পিটারের স্ত্রী ব'লে নয়। মনে হয়েছিল লণ্ডনের স্টেশনে মুহূর্তের দেখা তার মুখটা স্মরণ ক'রে, হাওয়ায় সেই স্নিগ্ধতা আবার অনুভব ক'রে। কিন্তু তবু কাজ ফেলে দমদমে যাওয়ার জন্যে আমি অঞ্জলিকে পীড়াপীড়ি করিনি। কারণ আমি জানতাম তাহলে সে আরো গম্ভীর আরো কর্তব্যপরায়ণ হ'য়ে পড়বে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম দিন পনেরো ধ'রে অঞ্জলি আমার উৎসাহে ব্রেক কষবার চেষ্টা করছে। যখন পিটার আমাকে চিঠিতে জানিয়েছে পনেরো দিন পরে সে ও মারিয়া ভারতবর্ষে আসছে তখন থেকেই। ঐ চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমি তো উত্তেজিত হ'য়ে ছিলাম কখন ওরা এসে

পৌঁছবে। একশো বার অঞ্জলির কাছে পিটারের গল্প করেছি। মারিয়ার গল্পও করেছি, যেটুকু তাকে দেখেছি তার খুঁটিনাটি দিয়ে। অঞ্জলি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে বটে, কিন্তু একবারও আমার সঙ্গে সুর মেলায়নি, এমন একটা প্রশ্নও করেনি যাতে ওদের সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে। সে যেন ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে রাখতে চায়। কেন? পিটার তো আমার বন্ধু। আর মারিয়া, তার সঙ্গে নিছক সৌজন্যের সম্পর্ক আমার হাস্যকর মনে হয়।

বিমানবন্দরের বেষ্টনীর ধারে এসে পিটার বলল, 'পলাশ, তুমি তো মোটেই বদলাওনি দেখছি।'

আমি বললাম, 'তুমিও না।'

মারিয়া যখন কাছে এসে দাঁড়াল, তখন আমাদের সেই দাঁড়ানোর কোণটা যেন প্রসন্নতায় ভ'রে উঠল। তার চোখ দুটো, মনে হল, আমার চারপাশে কাউকে এক মুহূর্ত খুঁজল। কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করল না। তার চোখ হাসতেই থাকল।

কাস্টম্‌স্‌-এর হাঙ্গামা মিটলে আমরা তিনজন ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি এলাম। পথে পিটার বেশী কথা বলেনি। সে দু'ধারের পথঘাট লোকজন একাগ্রভাবে দেখছিল। কথা বলতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ওরা ক্লান্ত মনে ক'রে ইচ্ছেটা দমন করছিলাম। অবিশ্যি মারিয়া দু'একটা প্রশ্ন করছিল, মন্তব্যও করছিল। মনে হল, এই নতুন দেশের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়বার সূত্রগুলো সে জানতে চাইছে। আমি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করবার জন্যে উৎসুক হ'য়েও নিজেকে সংযত করলাম। ভাবলাম, এখন নয়, সবকিছু শান্তির আবহাওয়ায় বলা যাবে।

আমরা বাড়ি পৌঁছলে অঞ্জলি দরজার কাছে এগিয়ে এল। তার ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি। সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্যে তিনটে নাম আমার শুধু বলবার ছিল, বললাম: 'এই পিটার', 'এই মারিয়া', 'এই অঞ্জলি'। এর বেশী কিছু বলা নিতান্তই বাহুল্য হত। কারণ

ওরা তিনজন পরস্পরকে জানে। পিটারের সঙ্গে আমার গোনাগুণতি যে-ক'টি চিঠির লেনদেন হয়েছে, তাদের মধ্যে দু'টি ছিল মিলন-সংবাদ : পিটার ও মারিয়ার এবং আমার ও অঞ্জলির। আর পিটারের কথা আমার মুখে তো অঞ্জলি অনেক শুনেছে, যেমন আমার কথা পিটারের কাছে মারিয়াও নিশ্চয় শুনেছে। পিটার হেসে সম্ভাষণ জানাল। মারিয়া অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধ'রে দুই গালে দুই চুমু দিল। অঞ্জলি যেন হকচকিয়ে গেল, একটু লজ্জাও পেল। মারিয়ার সেদিকে মনোযোগ নেই। সে অঞ্জলির হাত দু'খানা ধ'রে রেখে বলল, 'কী সুন্দর তোমার নাম অঞ্জলি। মনে হয় যেন আমাদের ভাষারই কোন প্রিয় নাম।' অঞ্জলি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে বলল, 'তোমার নামও সুন্দর, আমাদের ভাষার সঙ্গে মিল না থাকলেও। মারিয়া খুব শ্রুতিমধুর শব্দ।'

পিটার অবাক হ'য়ে শুনছে। মনে হল, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পারের এক অন্য দেশের অন্য সমাজের মেয়ে তারই ভাষায় এমন সহজে কথা বলছে, এটা তার কাছে এক বিস্ময়। যদিও বুদ্ধি দিয়ে সে সব বোঝে, তবু প্রত্যক্ষ নিদর্শন তার বুদ্ধিকে অভিভূত করেছে। তা পিটারের পক্ষে অবাক হ'য়ে যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কারণ ইংরিজীটা অঞ্জলি ভালো বলে, রীতিমতো ভালো। কী ভাষায় কী উচ্চারণে। আমার এক পরম সৌভাগ্য সচরাচর মিশনারী স্কুলে-পড়া মেয়েদের যে-দোআঁশলা ইংরিজী শুনে আমি শিউরে উঠি, অঞ্জলির মুখে তা আমাকে শুনতে হয় না। সেও মিশনরী স্কুলে পড়েছে, কিন্তু সেখানে ইংরিজীটা শিখেছে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে। তাতে মার্কিনী ছাপ অবিশ্যি নেই। আছে বৃটিশ দ্বীপের প্রাণস্পন্দ প্রস্বন। তাই তো আমি অঞ্জলিকে মাঝে মাঝে বলি, 'আমার ইচ্ছে করে আমি শুধু অন্ধদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই। তাহলে তোমার ইংরিজী শুনে তারা ভাববে আমার বউ মেম-সায়েব।'

পিটার ও মারিয়া যে-দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর এই মাত্র এসে পৌঁছল

এবং এটাই যে তাদের ও অঞ্জলির মধ্যে প্রাথমিক সম্ভাষণ, এ-সব আমার খেয়াল নেই। আমি মাঝখানে প'ড়ে বাঙালীর নামমাহাত্ম্য বলতে শুরু করেছি। মারিয়াকে বোঝাচ্ছি কোনো ভাষার শব্দের ধ্বনি কেমন ক'রে হৃদয়কে প্রীত করে। মারিয়া মৃদু মৃদু হাসছে, কিন্তু অঞ্জলির মুখে কোনো সাড়া নেই। এক সময় তার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। সে মারিয়া ও পিটারকে উদ্দেশ ক'রে বলল, 'তোমরা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন একটু বিশ্রাম করো। তারপর চান ক'রে খেয়ে নাও। খাবার প্রায় তৈরী।'

অঞ্জলি আমাকে কিছু বলল না। কিন্তু আমার কথার সামনে সে পাঁচিল তুলে দিল। আমার মনে হল, অঞ্জলি আবার ব্রেক কষছে।

২

আমাদের বাড়িতে সায়েব-মেম অতিথি রয়েছে জেনে অনবরত লোক আসছে। মানে আমাদের পরিচিতরা। আমাদের দিশি জীবনযাত্রায় যারা মনে মনে ছিছি করে অথবা দেশের অবস্থা নিয়ে স্পষ্ট কথা শুনতে যারা অনিচ্ছুক, তাদের দেখা আমরা কদাচিৎ পাই। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার অঞ্জলির মুখ ও মেজাজকে ডরায়। তারা পর্যন্ত এখন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। পিটার ও মারিয়া আসার পর সর্বপ্রথম দেখা দিল প্রবীর ও মীনা। 'হ্যালো পলাশদা' ব'লেই প্রবীরের প্রবেশ। সেই সঙ্গে ঠোঁটের দুই সুতো ফাঁক দিয়ে মীনার গ'লে-পড়া স্বর: 'অঞ্জলিদির সঙ্গে আমি খুব ঝগড়া করব কিন্তু। একবারও কি আমাদের ওখানে যেতে নেই? উইকডেজ-এ না-পারুন, সান্‌ডে বা কোনো হলিডে-তে কি যাওয়া যায় না? অঞ্জলিদিকে কতদিন দেখিনি ভাবলে আমি এমন ডিপ্রেস্‌ট্‌ ফীল করি।'

পলাশদা। প্রবীরের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ায় পর অল্প কিছুদিন আমি ওর সম্বোধনে ছিলাম মিস্টার হালদার। তারপর হঠাৎ হ'য়ে গেলাম পলাশদা, যদিও বয়সে আমি ওর চেয়ে সম্ভবত বড় নই। এই পরিবর্তনটা যে ওর স্ত্রী মীনার নির্দেশে ঘটেছিল তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। আমি যদি প্রবীরের পলাশদা হ'য়ে যাই তাহলে আমার স্ত্রীর পক্ষে মীনার অঞ্জলিদি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আলাদা ক'রে বয়সের হিসেব করার আর দরকার থাকে না, জ্যামিতির করলারির মতো দিদিটা এসে যায়। তবে নিজের কচি বয়সের কথা মীনা গায়ে প'ড়েই শোনায়। অবিশ্যি বয়সের কিছু হেরফের বেশির ভাগ মেয়েই ক'রে থাকে এবং আমরা পুরুষেরা আমাদের কৌতুককে গাম্ভীর্যের চেহারা দিয়ে তা মেনে নিই। আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় রাজকুমারীদের জন্যে। জন্ম-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বয়সটা হ'য়ে যায় জনসাধারণের সম্পত্তি। সেখানে আর অদলবদল চলে না।

ছেলেমেয়ের বয়স কমানোর সূত্রপাত অবিশ্যি বাপমার হাতে। পরীক্ষা জীবিকা বিবাহ, এই সব বাস্তব ব্যাপারের সুযোগটা তাঁরা বাড়িয়ে দিতে চান। তবে উল্টো বিপত্তিও মাঝে মাঝে হয় বৈকি। এই যেমন, অঞ্জলির মাসতুতো ভাইকে কিছুতেই মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করানো গেল না বয়স কম ছিল ব'লে। ইস্কুলের খাতায় লেখানো তার জন্ম-সাল দেখতে গিয়ে জানা গেল সে জন্মেছে তার মা মারা যাওয়ার পর। তখন ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে হল। ভাগ্যিস তার বাবা মারা যাননি। তাহলে কী সমস্যার সৃষ্টি হত কে জানে। আজকাল নাকি বয়সের ব্যাপারে মেয়েলি অভ্যেস পুরুষদের মধ্যেও ছড়িয়েছে। সিনেমা থিয়েটারের নায়কেরা শুনি ঠিক বয়স বলেন না। সত্যি মিথ্যে তাঁরাই জানেন। তবে সত্যি হলে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? অনেক মেয়েলি রেওয়াজই তো পুরুষদের মধ্যে ইদানীং চালু হয়েছে। মাথার চুল, গায়ের জামা, মুখের রং ক্রমেই এক রকম হ'য়ে আসছে।

মেয়েরা পোশাক হিসেবে শাড়িও কিছু কিছু বর্জন করতে আরম্ভ করেছে। যদি একেবারেই বর্জন করে, তাহলে বাইরের সব ভেদাভেদ দূর হ'য়ে যাবে। আমার এক-এক সময় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে : হরি হে, একমাত্র তুমিই সত্য ; তুমিই নর, তুমিই নারী। আচ্ছা, আমি যদি চেঁচিয়ে উঠি, তাহলে কি লোকে আমায় পাগল ভাববে ?

মেয়েদের বয়স সাধারণত ক'মে যায় কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে। কিন্তু মীনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তার কোনো উপলক্ষ দরকার হয় না। 'আমার টুয়েনটি-ফাইভ চলছে', এই কথাটা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে তার মুখ থেকে যখন তখন শুনতেই হবে। একদিন আমি বলেছিলাম, 'জানো মীনা, মেয়েদের বয়স নিয়ে ফরাসীদের মধ্যে একটা খুব মজাদার কথার চল আছে। প্রবচনও বলতে পারো।' মীনা শুনবার জন্যে উৎসুক হয়েছিল। আমি তখন বলেছিলাম, 'শুনলে তোমার খুব হাসি পাবে। থাক্‌গে, এসব বিষয় নিয়ে হাসাহাসি না-করাই ভালো।' মীনা পীড়াপীড়ি করেছিল, 'আমি তো হাসতেই চাই। বলুন না। আপনি বড্ড টেম্‌ট্‌ করেন।' আমি অতঃপর ফরাসী রসিকতার পুনরাবৃত্তি ক'রে তাকে শুনিয়ে-ছিলাম, 'মেয়েরা তাদের বয়স থেকে যে-বছরগুলো ছাঁটাই করে, সেগুলো কখনো নষ্ট হয় না। সেগুলো তাদের বান্ধবীদের বয়সের সঙ্গে যোগ হয়।' শুনে মীনা গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'ও কী মীনা, হাসছ না কেন ? আমি ভেবেছিলাম তোমার খুব হাসি পাবে।' মীনা জবাব দিয়েছিল, 'এতে হাসির কী আছে বুঝতে পারছি না।' আমি বলেছিলাম, 'কী জানি। আমার তো খুব হাসি পায়।' অবিশ্যি আমি বলতে পারতাম, 'বুঝতে পারছো ব'লেই তো হাসতে পারছো না।' কিন্তু সেটা নিষ্ঠুরতা হত। মেয়েদের প্রতি আমি নিষ্ঠুর হতে পারি না।

আমি যে ইয়োরোপে ছিলাম সেটা হয়েছে আমার পক্ষে আর এক যন্ত্রণা। দেখা হলেই প্রবীর আমাকে তার বিলেত-ফেরতা জাতভাই হিসেবে গল্প ফাঁদবে। প্যারিসে এবং প্যারিসের বাইরে

দিন পাঁচেক কোথায় কী মজা করেছিল, লণ্ডনের পিকডিলি সার্কাস কেমন উচ্ছল তার বৃত্তান্ত দেবে আর কথায় কথায় ভ্যাঁ রুঝ্, কঞ্ৰ়্যাক ও স্কচের নাম করবে। এই ধরনের কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়। বাইরে আমি হাসি। প্রবীররা বোঝে না সেটা কষ্টের হাসি।

কোম্পানীর খরচায় বিলিতী অভিজ্ঞতার কাহিনী ছাড়া প্রবীরের মুখে আর এক ধরনের কথাও আমাকে শুনতে হয়। যদি তার সবান্ধব আড্ডার মাঝখানে গিয়ে পড়ি, তাহলে ফ্রিজ, কার্পেট আর ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন বিষয়ক কথা চালাচালিতে কান ঝালাপালা হয়। আমার ফ্রিজ কার্পেট আগেও ছিল না, এখনো নেই। আর ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন নিয়ে ভাববার সুযোগ আমি ইহজীবনে পাব ব'লে মনে হয় না। প্রবীরদের মোটামাইনের চাকরি, যাকে বলা হয় কাম্প্নি এক্জেকিউটিভ পদ। জীবনযাত্রার আরাম তারা চেখে চেখে উপভোগ করবে না তো কি আমি করব? এ-সব আলোচনায় মিসিজদের উৎসাহ দেখি আরো বেশী। তাদের শখগুলো স্বামীরা স্নেহের সঙ্গে মেনে নেয়। মীনার প্রস্তাব শুনে প্রবীর হয়তো বলল, 'কিন্তু মীনু, কার্পেটের যে-ডিজাইনের কথা তুমি বলছো, তাতে দাম একশো টাকা বেশী প'ড়ে যাবে।'

—'তা পড়ুক, তবু জিনিসটা ইউনিক হবে', মাথা ঝাঁকিয়ে মীনা জবাব দিল এবং অনুপস্থিত এক দম্পতির উল্লেখ ক'রে বলল, 'খান্নাদের ড্রইং-রুমের ভাজটা দেখেছো? কী সাংঘাতিক দাম নিয়েছিল। তা নিলে কী হবে, ও একটা ট্রেজার। আছে আর কারো অমন ভাজ?' মানে, এরই মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা! ভাজ শোনা হ'য়ে গিয়েছে, এখন বীরভূমের ঘোড়া কবে শুনতে হবে তাই ভাবছি।

ওদের কথায় স্বভাবতই আমি যোগ দিতে পারি না, কিন্তু আমাকে শুনতে হয়। শুনতে শুনতে আমি দেখতে পাই ভারতবর্ষকে, যার খাওয়ার সময় নুন আনতে পান্তা ফুরোয় আর পরার সময় ন্যাতা জোটানোই মুশকিল হয়। ফ্রিজ কার্পেট ভাজ বিষয়ে এই আলোচনার সঙ্গে অগণিত ভারতীয়ের সম্পর্ক কী আমি মনে মনে

ভাবি। ইংরেজ-শাসক মুষ্টিমেয় ভারতীয়কে নিয়ে তৈরি করেছিল একটা বিশেষ শ্রেণী যা সাধারণ ভারতবাসী থেকে আলাদা, ভারতবাসীর সঙ্গে যার সংস্রব নেই। এখন সেই শ্রেণীটা আরো বড় আর জোরদার হতে চলেছে দেখছি। ইংরেজ-শাসকের প্ল্যানটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্তারা হাতে তুলে নিয়েছেন এবং তার চৌহদ্দি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ এক চমৎকার উন্নয়ন প্রোগ্রাম তাঁদের। আমার এই ভাবনাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। দেখি, যখনই সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়ার কোনো কথা ওঠে, কোনো জায়গা থেকে গোলমাল হাঙ্গামার খবর আসে, প্রবীররা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। তাদের বিক্ষোভের তীব্রতা গণবিক্ষোভের তীব্রতার চেয়ে কিছু কম নয়। মনে হয় তাদের বাড়া ভাতে যেন কেউ ছাই ঢেলে দিচ্ছে।

আমাদের প্রতি প্রবীর ও মীনার আকৃষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। আমি ফ্রান্সে গিয়েছিলাম ব'লে তাদের চোখে, শুধু তাদের কেন, কারো চোখেই অবতার হ'য়ে যাইনি। আমার মতো কত চেণ্টু ভেণ্টু আজকাল বিদেশে যায়। ইয়োরোপ আমেরিকায় যাওয়া তো এখন ডালভাত। আসল হল স্বদেশে সায়েব হ'য়ে থাকা। তা তো আমি পারছি না। অঞ্জলিরও মেম হবার সাধ্য নেই, সাধও নেই। সুতরাং আমাদের প্রতি প্রবীর ও মীনা কেন শ্রদ্ধান্বিত হবে? তবু ভেতরে-ভেতরে কোথায় যেন আমাদের উপর একটা টান আছে ওদের। নিছক ব্যক্তিগত স্তরে সেটা টের পাই। যেমন, আমাদের অসুখ-বিসুখ করলে ওরা খোঁজ নেয়, নিজেদের কোনো খুশির খবর থাকলে তখনই আমাদের জানায়। ওদের মনের মধ্যে এই খাতিরটার কারণ কী ঠিক বুঝি না। ধনসম্পত্তি ক্ষমতাপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য? ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কোনোরকম সুবিধে আমাদের না-নেওয়া? কারণ সম্ভবত ওরা নিজেরাও জানে না। তবে মনে মনে আমাদের খাতির করে ব'লে আমাদের কাছে ঘন ঘন আসবে, এটা নিশ্চয় ওদের পোষায় না। আমাদের সঙ্গে এত কী কথা বলবে ওরা? কিন্তু পিটার মারিয়া

আসার পর ওদের উপস্থিত না-হ'য়ে উপায় নেই। খাঁটি সায়েব-মেমের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দকে উপেক্ষা করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রবীর ও মীনা এসে বেশীর ভাগ সময় কথা বলল আমাদের অতিথিদের সঙ্গে। স্টেট্‌সে তার যাওয়া হয়নি ব'লে প্রবীর তার গভীর মনস্তাপ জানাল পিটারকে। পিটার শুধু মন্তব্য করল, তাতে আর কী ক্ষতি হয়েছে? প্রবীর সেটা শ্বেতাঙ্গসুলভ ভদ্রতা মনে ক'রে আরো বিগলিত হল। মারিয়াকে প্রবীর তার ইতালী ভ্রমণের কাহিনী শোনাল এবং ইতালীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। মারিয়া শান্তভাবে বলল, কিন্তু নিন্দে করবারও অনেক জিনিস আছে। মীনা ইয়োরোপে যায়নি, কিন্তু তার ইয়োরোপ-ভক্তি তার স্বামীর চেয়েও বেশী। সে জানাল, মারিয়া যাই বলুক তার একান্ত কামনা সে যেন আগামীবার ইতালীতে জন্মায়। অবশেষে তারা তাদের সঙ্গে ঘুরবার জন্যে, তাদের বন্ধুস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে পিটার ও মারিয়াকে আমন্ত্রণ জানাল।

পিটার ও মারিয়া সে-আমন্ত্রণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করল। ওদের আপত্তি যে হবে না তা আমি জানতাম। পিটার এসেছে সাংবাদিক হিসেবে। তার কাগজে সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ রিপোর্ট লিখবে। সে ভারতীয় জীবনের সমস্ত স্তরের ভারতবাসীকে জানতে চায়। তারপর সব তথ্য সব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এবং যাচাই ক'রে তার নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। সে-সিদ্ধান্তটা কেমন হবে, আমি ভাবলাম। আমার মনে পড়ল, দশ বছর আগে নিজের স্বদেশ সম্বন্ধে পিটারের ক্ষোভ। প্রবীর ও মীনার জন্যে আমার করুণা হল।

আর মারিয়া তো যাবেই। ওর শান্ত চোখ দুটো সব মানুষকে যেন আপন ব'লে দেখতে চায়। কিন্তু মেকীর সঙ্গে খারাপের সঙ্গে কি আত্মীয়তা করতে পারে ও? নিশ্চয় পারে না। ওর এখনকার একটা মন্তব্যেই তা বোঝা গেল। কারা তার আপন হবে, মারিয়া

বোধহয় তা নিজে দেখেশুনে ঠিক করবে। শুধু দেখেশুনে নয়, কাছে গিয়ে অনুভব ক'রে।

৩

অঞ্জলির জন্যে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। ও যেন নিজের মনের মধ্যে খুব একলা হ'য়ে পড়ে। এই যে পিটার ও মারিয়া আমাদের বাড়িতে রয়েছে এবং ওদের সঙ্গে আমার কতরকম গল্পগুজব চলছে, এ থেকে অঞ্জলি পৃথক হ'য়ে আছে।

আমি দেখেছি, যখনই আমার দৃষ্টি অঞ্জলিকে ডিঙিয়ে যায় তখনই ও শক্ত হ'য়ে ওঠে। আমার নজরের পাল্লায় যদি এমন কোনো ঘটনা আসে যাতে ওর কোনো অংশ নেই, তাহলে তাতে ওর মনোযোগ দিতে যেন বাধে। আর যদি মানুষ আসে, তাহলে তো কিছুতেই ও তা মেনে নিতে পারে না। পুরুষ হলেই পারে না আর মেয়ে হলে তো সহজভাবে চলাফেরা কথাবলাই ওর পক্ষে কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। আমার কোনোরকমে বিভক্ত হওয়া অঞ্জলি সহ্য করতে পারে না। ও যেন চায় আমি ওর মধ্যে সমগ্রভাবে কেন্দ্রীভূত হই। যেমন ও আমার মধ্যে হয়েছে তেমনি।

রাজনীতি না ছাড়লে অঞ্জলি বোধহয় ভালোই করত। তাহলে আমাকে সূত্র ক'রে সব কিছুর মূল্যনিরূপণের চেষ্টায় ওকে বিভ্রান্ত হতে হত না। কিন্তু রাজনীতিতে ও লেগে থাকতে পারল না। সেটা অবিশ্যি ওর সৎ স্বভাবেরই প্রমাণ। নিজের মনকে ও চোখ ঠারতে পারে না। ও যে আমার প্রীতিভাজনদের উপস্থিতিতে অনেক সময় আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে তার কারণও তো ঐ একই: নিজের প্রতি সততা।

সন্তান হলে অঞ্জলি হয়তো কিছু স্বস্তি পেত। একমাত্র আমাকে নিয়েই তার পৃথিবীটা ঘুরত না।. মুখের দিকে তাকাবার আর একটি প্রাণী থাকত। আমি তো সন্তান চেয়েছিলাম। কোনো

পরিকল্পনা-টরিকল্পনা ক'রে নয়, এমনিতে, স্বাভাবিকভাবে। আমার ইচ্ছে করত একটি শিশু আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করবে, আমাকে বাবা ব'লে ডাকবে, আমাকে পরম নির্ভর ভেবে আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু অঞ্জলি তখন সন্তান চায়নি। সেও বোধহয় আমারই জন্যে। একান্তভাবে আমাকে নিয়ে আবর্তিত হবার জন্যে। আমাদের মধ্যে কোনো সন্তানের ব্যবধানও সে মেনে নিতে পারেনি। অবিশ্যি নানারকম যুক্তি সে দেখিয়েছিল : আর একটু থিতিয়ে বসা যাক, আর একটু আয় বাড়ুক ইত্যাদি। এখন বোধহয় সেজন্যে তার অনুতাপ হয়, অন্তত আমার ওপর ক্ষোভ থেকেও হয়। সে স্পষ্ট ক'রে বলে না, আমি অনুভব করি। কিন্তু আট বছরের ঘষা খেয়ে আমার মনে জায়গায় জায়গায় কড়া পড়েছে। সান্ত্বনা হিসেবে তাকে একটি সন্তান উপহার দিতে আমি নারাজ।

আমরা কি তবে শার্ল-ইরেনের পথে চলেছি? কিন্তু আমার মনে হয় না আমরা দু'জন কেউ স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা বর্জন ক'রে পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে বরণ ক'রে নিতে পারব। তাছাড়া অঞ্জলি ম'রে যাবে তবু আমাকে ছাড়তে রাজী হবে না। আমি মাঝে মাঝে ভাবি অঞ্জলির চুলে যখন পাক ধরবে তখন সে কোন্ ভূমিকায় নামবে। তখন সে বোধহয় বিশ্ববাসীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটরের সওয়াল শুরু করবে। অবিশ্যি কাঠগড়ার ঠিক মাঝখানে থাকব আমি।

পিটাররা আসার পর আমার চোখে অঞ্জলির অসহন ভাবটা আগের চেয়ে আরো পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তার কারণ বোধহয় মারিয়ার প্রশান্তি আয়নার মতো অঞ্জলির জ্বালাকে ঠিকরে দিচ্ছে। আমি পাশাপাশি তাদের মুখ দেখছি আর হাজারবার তাদের অদলবদল করছি। আমি যখন এলেনির মুখের জায়গায় অঞ্জলির মুখটা বসাবার চেষ্টা করতাম, কিছুক্ষণ বাদে তা আমার কাছে হাস্যকর লাগত। এলেনির শরীরকে ছাপিয়ে অঞ্জলির মুখের হৃদ্যতা তখন আমাকে টেনে নিত। দূর তখন অন্তরঙ্গ হ'য়ে আমাকে

সামনের দৃশ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন মারিয়াকে সম্পূর্ণভাবে অঞ্জলির জায়গায় বসিয়ে দেখা আমার পক্ষে সহজ। তারা শরীর ও মন নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আমার সামনে বিদ্যমান। মারিয়া যদি অঞ্জলি হত, এই ইচ্ছেটা বারেবারে আমাকে আচ্ছন্ন করছে। কিন্তু পিটারকে দেখামাত্র বা তাকে মনে পড়ামাত্র আমি নাড়া খেয়ে আবার ফিরে আসছি আমার খাঁজে। আর মনে মনে বলছি: পিটার আমার বন্ধু, অঞ্জলি আমার স্ত্রী। কী যেন এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমি গিয়ে পড়েছি।

যদি চোখ কান ঠোঁট নাক, কেবল এইসব নজরে রাখতে পারতাম তাহলে ভালো হত। কারণ অঞ্জলি দেখতে সুন্দর। অন্তত মারিয়ার চেয়ে কম সুশ্রী নয়। অঞ্জলির সৌন্দর্যের প্রশংসায় পিটার ও মারিয়া তো উচ্ছ্বসিত। শুধু অঞ্জলি কেন, অধিকাংশ ভারতীয় মেয়েই ওদের চোখে রূপবতী। ওদের দৃষ্টি অবিশ্যি অনেক সময় আমার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু ওদের প্রশংসায় আমি গর্ববোধ করতে ছাড়ি না।

এ-গর্বের স্বাদ আমি প্যারিসেও পেয়েছি। ভারতীয় নারীর সৌন্দর্যে ওখানে দেখতাম সকলেই মুগ্ধ। ওদের উচ্ছ্বাসে আমার নির্বিকারত্ব ভেঙে যেত এবং আমি এক ধরনের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করতাম। তখন আমার দেশের মেয়েদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভ'রে যেত।

প্যারিসে একটা ভারতীয় ফিল্‌ম্ দেখানো হচ্ছে। প্রবাসী ভারতীয়েরা প্রায় সবাই গিয়েছে দেখতে। আমি গিয়েছি আঁদ্রেকে নিয়ে। ফিল্‌ম্ আরম্ভ হবার আগে আমরা দু'জন প্রবেশদ্বারের সামনে অপেক্ষা করছি। আঁদ্রের স্ত্রী আসবে। শাড়ি-পরা ভারতীয় মেয়েরা একে একে ঢুকছে। শিল্পীর চোখ নিয়ে আঁদ্রে তাদের তন্ময় হ'য়ে দেখছে। মুগ্ধতায় তার মুখটা কেমন বিভোর হ'য়ে এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চুপ ক'রে থাকতে পারল না। এক সময় ব'লে উঠল, 'পল, তোমাদের দেশের মেয়েরা কী সুন্দর! একসঙ্গে এতজন সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি।'

সরবনের প্রেক্ষাগৃহে নাচের ঘটনাটাও আমি কখনো ভুলব না। এক ভারতীয় মহিলা ভারতীয় নৃত্য দেখবেন। জনান্তিকে বলি তিনি বাঙালী। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ। আমার দু'পাশে সামনে পেছনে প্রায় সবাই ফরাসী। নাচ আরম্ভ হবে, মহিলা মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গিনী। কাটা-কাটা মুখের ছাঁদ, টিকোলো নাক। চুল বেঁধেছেন কপাল থেকে উঠিয়ে টানটান ক'রে। অনেকটা মিশরীয় ছবির মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। দর্শকমণ্ডলী দেখামাত্র যেন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে গেল। আমার পাশে-বসা ফরাসী মেয়েটি আমার মনোযোগ টেনে নিম্নস্বরে উচ্চারণ করল, 'কী অপূর্ব!' তারপর স্বগতোক্তি করল, 'কী সৌন্দর্য, আহা কী সৌন্দর্য!' শেষে আমাকে বলল, 'ওকে দেখে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।'

ভারতীয় মেয়ের রূপ দেখে ওদের মতো এইরকম মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা যদি আমার থাকত, তাহলে অঞ্জলির একাধিপত্য মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সহজ হত, স্বাভাবিক হত। তাহলে অঞ্জিলও বোধহয় শান্তি পেত।

৪

আশ্চর্যভাবে দেখা হ'য়ে গেল সুজনের সঙ্গে। আমার ছেলেবেলার সাথী সুজন। সেই যে খুলনা-বাগেরহাট পর্যটনে যে আমাদের সঙ্গী ছিল। শুধু কি দেশভ্রমণ, আমাদের হাজার কীর্তির সে অংশীদার। আমরা যেবার এক বুড়ির পাঁঠা চুরি ক'রে ব্যাঙ্কুয়েট করেছিলাম, সেবার রান্নাটা এবং খাওয়াটা দুই-ই হয়েছিল সুজনদের বাড়িতে। সেখানে অবিশ্যি 'ব্যাঙ্কুয়েট হল' ছিল না। আমরা খেয়েছিলাম সুজনদের কুঁড়েঘরের দাওয়ায় ব'সে। কিন্তু অমন তৃপ্তি ক'রে কোনো ভোজসভায় আমি জীবনে খাইনি। রান্না করেছিলেন সুজনের মা, মাংস ছাড়াও আরো দু'তিন পদ। পরিবেশন করেছিল সুজন আর তার ভাইবোন। আমরা অনেক ক'রে সুজনকে আমাদের

সঙ্গে বসতে বলেছিলাম কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। বলেছিল, 'না আমি খেতে বসলে অসুবিধে হবে। তোমরা হয়তো ঠিকমতো খাবে না। তোমরা খেয়ে নাও, তারপর বাড়ির আমরা সবাই একসঙ্গে বসব।' খাওয়ার সমস্তটা সময় সুজনের সে কী তদারকি। ভাই-বোনকে ডেকে বলছে, 'এপাত দুটোয় বেশী মাংস পড়েনি, আরো নিয়ে আয়।' আমাকে বলছে, 'এই পলাশ, তুই তো কিছুই খাচ্ছিস না। পাঁঠা চুরির আগে যে এত তড়পালি একটা আস্ত পাঁঠাই খেয়ে ফেলতে পারিস, তা এখন পিছিয়ে যাচ্ছিস কেন?' আমার তো সন্দেহই হচ্ছিল সে নিজের জন্যে কিছু অবশিষ্ট রাখবে কিনা। অথচ সে খেতে পারত প্রচুর, বিশেষ ক'রে মাংস।

শুধু আহার বিহারে নয়, সঙ্গীতেও সুজন আমাদের সখা ছিল। সে অবিশ্যি গান গাইত না, গান শুনতে ভালোবাসত। তবে যার-তার গান নয়, একমাত্র হরিচরণদার গান। হরিচরণদাকে নিয়ে আমাদের গানের আসর প্রায়ই বসত। না-ব'সে উপায় ছিল না, কারণ সুজন সব সময় তাকে দিয়ে গাওয়াবার ফিকিরে থাকত। তার চেয়েও বড় কারণ, বীরেনদা ছিল হরিচরণদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং গুণানুরাগী। বীরেনদার কথার ভাবে বুঝতে পারতাম সে হরিচরণদাকে সঙ্গীতে ফৈয়াজ খাঁ ইত্যাদির চেয়েও বড় শিল্পী মনে করে। হিল্লীদিল্লীর বদলে মফঃস্বলের ছোট শহরে থাকার জন্যে হরিচরণদার প্রতিভার যে কী সাংঘাতিক অমর্যাদা ঘটছে এ নিয়ে বীরেনদাকে অনেক সময় আক্ষেপ করতে শুনেছি।

গানের আসরে বীরেনদা ও সুজনই ছিল সবচেয়ে তন্ময় শ্রোতা। আমিও তন্ময় হতাম, তবে গানের চেয়ে হরিচরণদার শারীরিক ব্যঞ্জনায় বেশী। হরিচরণদা বেশ লোমশ ছিল। হারমোনিয়াম বাজানোর সময় তার হাতের ও আঙুলের লোমগুলো যেন পুলকে লুটোপুটি খেত। গাইবার সময় তার আগা-ছাঁটা শক্ত গোঁফজোড়ার ওঠানামা দেখবার মতো ছিল। আর সেই সঙ্গে মোটা ভুরু দুটোর নাচন। যখন ভেতরের আবেগে উত্তপ্ত হ'য়ে সে শার্টের বোতাম-

গুলো খুলে দিত, তখন তার বুকের লোমগুলোও মাথা বাড়িয়ে তুলত। হরিচরণদা রেকর্ডের গান গাইত, বিশেষত গায়িকাদের। আঙ্গুরবালা আর ইন্দুবালার গানই বেশীর ভাগ আমরা তার গলায় শুনতাম। সেই সব বিখ্যাত গান হরিচরণদার প্রতিভায় এক নতুন মাত্রা পেয়ে যেত। আমি শুনতে শুনতে এক এক সময় হরিচরণদার গোঁফ আর ভুরু আর লোম থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শ্রোতাদের লক্ষ করতাম। দেখতাম সুজন আর বীরেনদা শিবনেত্র হ'য়ে আছে।

কত বছর বাদে যে সুজনের সঙ্গে দেখা হল তার ঠিক নেই। আমার মনে ওর কিশোর-যুবক বয়সের মুখটারই ছাপ ছিল। দেখলাম সে-মুখের আদল যেমন ছিল তেমনই আছে। একটু ভারিক্কি হয়েছে এই যা। তবে চোখ দুটো আর জ্বলজ্বলে নেই, কেমন যেন ধোঁয়াটে হ'য়ে গিয়েছে। আর ও যে-প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে হেসে উঠত, সেই আওয়াজটা নেই। এখন দেখলাম বেশ চেপে হাসে। ওর চলাফেরা হাত-পা নাড়া রীতিমতো ক্ষিপ্র ছিল, যেজন্যে আমরা ওকে ব্যস্তবাগীশ ব'লে ঠাট্টা করতাম। এখন ওর সব ভঙ্গিই মন্থর মনে হল। অবিশ্যি বয়স হলে লোকে একটু মন্থর হয়ই। কিন্তু সে-রকম নয়। যারা ব'সে ব'সে ব্যবসা করে, টাকার হিসেব কষে, মুনাফার কথা ভাবে, তাদের যেমন ধীর ভঙ্গি হয় সেই রকম।

আমি গিয়েছিলাম প্রবীরের ওখানে। কলকাতার কোথায় ও জমি কিনেছে, বাড়ি তৈরি করবে। ওর একান্ত ইচ্ছে আমি ওর বাড়ির প্ল্যানটা দেখি। আমি যে বাড়ির ব্যাপারে হাঁদারাম সে-কথা প্রবীরকে অনেক ক'রে ব'লেও বোঝাতে পারিনি। ওকে বোঝাতে পারিনি যে, ভালো বাড়িতে থাকার ইচ্ছে আমার হয় বটে, কিন্তু বানানোর কৌশলটা আমার মাথায় আসে না, টাকা জমি নক্‌শা কোনো দিক থেকেই আসে না এবং আমি নিশ্চিত হ'য়ে গিয়েছি যে, বাড়ি তৈরির প্রতিভা নিয়ে আমি জন্মাইনি। অতএব আমি কী পরামর্শ দেব? কিন্তু প্রবীর ছাড়বে না, ওর বাড়ির প্ল্যানে

আমাকে মাথা গলাতেই হবে। ও নিশ্চয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ইয়োরোপ ঘুরে এলেই কালা আদ্‌মির বুদ্ধি খুলে যায় এবং যে-কোনো বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদী হয়। সুতরাং যে-কোনো বিষয়ে ব্যক্তিগত পরামর্শ এই জাত-ভাইদের মধ্যেই হওয়া উচিত। কিন্তু ইয়োরোপ-ফেরতা বন্ধু তো প্রবীরের অনেক রয়েছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেই হয়। তবে কি আমার রুচি সম্বন্ধে ও সত্যিই শ্রদ্ধা পোষণ করে? তাই হবে হয়তো। প্রবীরের অনুরোধ আমি শেষ পর্যন্ত মেনেই নিলাম। ও যখন একটা বাড়ি করছে এবং সেটা কী রকম হবে তা আমাকে বিশদভাবে জানাতে চাইছে, তখন আমার প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না, আমার মনে হল। কত জনের কত আত্মম্ভরিতাই আমাকে মেনে নিতে হয়, আমার কোনো ব্যক্তিগত দায় না থাকলেও মেনে নিতে হয়। এখানে তো তার ভর রয়েছে প্রীতির সম্পর্কের উপর। এখানে বেঁকে বসবার মানে নেই।

প্রবীরের বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি, কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, সুজন! চেয়ারে ব'সে প্রবীরের সঙ্গে কথা বলছে সুজন। আমি তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠেছি, 'সুজন, তুই এখানে?'

সে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল, যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। তার সেই অবস্থা দেখে আমি বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগলাম, 'আমাকে চিনতে পারছিস না? আরেক জন্মে দেখেছিলি মনে নেই? আমি ভূত হ'য়ে যাইনি, জ্যান্ত মানুষই রয়েছি। ভালো ক'রে আমার মুখটা দেখে নে। মনে পড়ে কিনা ছাখ।'

আস্তে আস্তে সুজনের মুখে হাসি ফুটল। সে খানিকটা সজীব হ'য়ে উঠল, বলল, 'পলাশ! কত বছর বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল। তোর চেহারা বেশ বদলে গিয়েছে। তবে কথার ধাঁচ সেই আগের মতোই রয়েছে। তাতেই চিনলাম।"

বিস্ময়ে আর কৌতূহলে প্রবীর এতক্ষণ নির্বাক হ'য়ে ছিল। এইবার সে মন্তব্য করল, 'আপনারা পুরনো বন্ধু!'

আমি বললাম, 'কত পুরনো তা তো দেখলেই। সেই পুরাকালের কথা সুজন স্মরণই করতে পারছিল না।'

সুজন একটু লজ্জা পেল। ঢোক গিলে বলল, 'না না, পলাশের চেহারাটা খুব বদলে গিয়েছে কিনা।'

আমি টিপ্পনী কাটলাম, 'থাক, ও নিয়ে আর আলোচনা ক'রে দরকার নেই। কথাটা তোর মুখেই প্রথম শুনলাম, আর কেউ এ-পর্যন্ত বলেনি। যাক, কোথায় আছিস, কী করছিস বল। তোর বাড়িতে যাব একদিন। তোর আপত্তি নেই তো?'

'কি যে বলিস।'—সুজন তার ঠিকানা দিল এবং জানাল সে সরকারী দপ্তরে চাকরি করে।

প্রবীরের সঙ্গে তার কথাবার্তা আগেই হ'য়ে গিয়েছিল। এখন তাকে জরুরী কাজে আরেক জায়গায় যেতে হবে ব'লে সে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় আমাকে বলল, 'নিশ্চয় আসিস আমাদের বাড়ি। কালই আয় না।'

'কাল!' সুজনের কাজের উপর আমার রাগ হতে লাগল। আমি তো আজই যেতে পারতাম তার বাড়িতে।

সুজন চ'লে যাওয়ার পর প্রবীর বলল, 'আপনারা যে এককালে এত বন্ধু ছিলেন তা বিশ্বাসই হয় না।'

জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

সে উত্তর দিল, 'আপনারা দু'জনে একেবারে আলাদা ধরনের। একেবারে উল্টো। বন্ধুত্ব কল্পনা করা শক্ত।'

আমি অবাক হ'য়ে আবার জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

প্রবীর বলল, 'আপনি যেমন আনপ্র্যাকটিকাল, ও ভদ্রলোক তেমনি প্র্যাকটিকাল। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত রাজনীতি, এইসব ব্যাপারেই আপনার যত আগ্রহ। বিষয়-আশয়, সুখ-সুবিধের প্রসঙ্গ আপনি দেখি এড়িয়েই চলেন। অথচ উনি ও ছাড়া অন্য কথাই বলেন না। তবে ভদ্রলোক খুব হেল্‌প্‌ফুল।'

আমার কৌতূহল হল। না হলেই ভালো ছিল। জিগ্যেস করলাম, 'হেল্‌পফুল বুঝি? কী ক'রে জানলে?'

প্রবীর উত্তর দিল, 'বাঃ, আমাকে কি কম সাহায্য করছেন? আরো অনেককে করেছেন জানি। উনি ব্যবস্থা না-করলে কি আমি এই সময়ে বাড়ি তৈরির কথা চিন্তা করতে পারতাম? মালমশলা এখন পাওয়াই কঠিন, তার উপর অসম্ভব দাম।'

'সুজন বুঝি তোমাকে সে-সব সস্তায় যোগাড় ক'রে দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মানে সরকারী দামেই যাতে পাই তার ব্যবস্থা করেছেন। অবিশ্যি তার জন্যে ওঁকে কিছু দিতে হয়েছে। কিন্তু সে-টাকা ধ'রেও আমার খরচা ব্ল্যাকমার্কেট প্রাইসের চেয়ে যথেষ্ট কম পড়ছে।'

'তা কী ক'রে এই রফাটা হল?'

'ওঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে মোটেই ঝঞ্ঝাট নেই, কনট্যাক্‌ট্‌ হলেই হল। ভদ্রলোক খুব ফ্র্যাঙ্ক, পষ্টাপষ্টি ব'লে দেন উনি কাজটা ক'রে দেবেন এবং সেজন্যে ওঁকে এত টাকা দিতে হবে। তাছাড়া, এ-বিষয়ে উনি খুব অনেস্টও। টাকা তো আজকাল প্রায় সকলকেই দিতে হয়। কিন্তু কাজ সকলে করে নাকি? কিন্তু সুজনবাবু সে-রকম নন। যে-কাজ ক'রে দেবেন ব'লে টাকা নেন, তা ঠিক ক'রে দেন। সেখানে ফাঁকি নেই। এমন ঘটনাও আমি শুনেছি যে, টাকা নেওয়ার পর কাজ ক'রে দিতে পারেননি ব'লে উনি টাকা ফেরত দিয়েছেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এ-রকম লোক থাকলে যে কত সুবিধে হয় তা আপনি বুঝবেন না, পলাশদা।'

তাহলে দেখছি সাহায্য দেওয়া-নেওয়ার বাজারে সুজনের বেশ গুডউইল তৈরি হয়েছে। প্রবীরকে মুখে বললাম, 'না, আমি আর কী ক'রে বুঝব? অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে আমার কারবার তো খুবই সামান্য।'

অতঃপর প্রবীরকে আমি জানালাম তার বাড়ির প্ল্যান আমি আরেকদিন দেখব, কারণ (মিথ্যে কথাই বললাম) কিছুক্ষণের মধ্যে

পিটারকে নিয়ে একজনের কাছে যেতে হবে। পিটারের কথা শুনে প্রবীর আর পীড়াপীড়ি করল না।

সুজন, তুমি তোমার পথ ঠিক ধ'রে নিয়েছ। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে এখন কথা বলব কোথায় দাঁড়িয়ে? কোন্ জমির উপর?

কথা দিয়েছিলাম, সুতরাং পরদিন না গিয়ে পারলাম না সুজনের ঠিকানায়। কলকাতায় নিজের বাড়ি করেছে সুজন। ভালো বাড়ি। বেশীক্ষণ আমি বসিনি। সুজন চা খাওয়াতে চাইলে আমি বারণ করলাম। একটু আগেই চা খেয়েছি, আবার খাওয়া সম্ভব নয় জানালাম। যেটুকু সময় আমি ছিলাম, সে তার ছেলেমেয়ের গল্প করল। বড় মেয়েকে কেমন বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে, বড় ছেলেকে কোন্ ফার্মে শিক্ষানবিশ হিসেবে ঢুকিয়েছে এবং সেখানে ভবিষ্যতে তার কেমন উন্নতি হবে, এইসব। নিজের বাড়ির কিছু প্রশংসাও এক ফাঁকে ক'রে নিল।

তার কথা যতক্ষণ শুনছিলাম, ততক্ষণ তার দিকে আমি অবোধ ভাবে তাকিয়েছিলাম। এই সেই সুজন যার সঙ্গে আমি কত খেলেছি, যে আমার সঙ্গে পালিয়ে বাগেরহাট ভ্রমণে গিয়েছিল, যে আমাকে তার কুঁড়েঘরের দাওয়ায় পাঁঠার মাংস খাইয়েছিল, যে তন্ময় হ'য়ে হরিচরণদার গান শুনত। বীরেনদা মানিকদার কথা আমার মনে পড়ছিল। বিশেষ ক'রে বীরেনদার কথা। বীরেনদা এখন কোথায়? বীরেনদা এখন কী করছে? কিন্তু সুজনের সামনে ব'সে বীরেনদার কথা জিগ্যেস করতে আমার ভয় হল। আমি মনে মনে বললাম, 'না, কারো কথা আমি জানতে চাই না, আমার জানবার দরকার নেই।'

আমি জানি আমি খুব ভদ্র। সুতরাং চ'লে আসার সময় আমি ভদ্রতা ক'রে সুজনকে আমাদের বাড়িতে আসতে বললাম। তাকে সেই সঙ্গে জানালাম, আমাদের ওখানে ইয়োরোপ থেকে দু'জন অতিথি এসেছে, তাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেব। কথাটা

শুনেই সুজন যেন আঁৎকে উঠল, বলল. 'ওরে বাবা, আমি যাব না। আমি ইংরিজীই বলতে পারি না তো কথা বলব কী?' আমি তার এই আপত্তি উড়িয়ে দিলে সে বলল, 'না, সাদা চামড়াটামড়ার সঙ্গে আমার পোষায় না। আমার দিশী সায়েব-মেমরাই ভালো।'

৫

সুজন তো পিটার-মারিয়ার কাছে ঘেঁষতে চাইল না, কিন্তু অবিনাশ-বাবুর প্রতিক্রিয়া উল্টো। তিনি ওদের খবর শোনামাত্র তাঁর স্ত্রী বিজয়াদেবীকে নিয়ে হাজির হলেন।

অবিনাশবাবু সদালাপী। বাজারে আমার সঙ্গে যখনই দেখা হয় থলি হাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেন। আমাকেও থলি ঝুলিয়ে শুনতে হয়। অবিনাশবাবুর থলির মধ্যে খবর অনেক। মাছ থেকে আরম্ভ করে পুঁইশাক পর্যন্ত কড়াক্রান্তি দাম আর তার ঢেউ-খেলানো গ্রাফ তিনি আমাকে হাত দোলাতে দোলাতে বুঝিয়ে দেন।

পিটার-মারিয়া খাঁটি বাঙালী রান্নার স্বাদ নিতে চায়। আমি অঞ্জলিকে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে বলেছিলাম। আমার সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য পাশাপাশি বাস করে ব'লে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল বাজারে। তিনি আমাকে গর্ভমোচা কিনিয়ে দিলেন এবং বিজয়া যে কী আশ্চর্য মোচা রান্না করে তার বৃত্তান্ত দিয়ে পরিশেষে জিগ্যেস করলেন, 'পলাশবাবু, আপনাকে তো মোচার খবর নিতে কখনো শুনিনি, আপনার বাড়িতে বিধবা কেউ এসেছেন বুঝি, যাঁর জন্যে দরকার?' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'না, বিধবা নয়, সধব-সধবা এক জোড়া সায়েব-মেম এসেছেন, তাঁদের জন্যে বাঙালী তরকারি রাঁধতে হবে।'

সায়েব-মেম শুনে অবিনাশবাবু কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন। পিটার মারিয়া সম্বন্ধে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন, বিশেষ ক'রে

মারিয়া সম্বন্ধে, এবং জানালেন বিজয়াদেবীকে নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন। স্ত্রীর প্রতি অবিনাশবাবুর অগাধ শ্রদ্ধা, তবু মেম-সাহেবদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। সেটা আগেই টের পেয়েছি, এখন আরো বেশী ক'রে স্পষ্ট ক'রে পেলাম। মেম তিনি অনেক দেখেছেন, কিন্তু খুব কাছ থেকে কখনো দেখেননি। কলকাতার বিলিতী ফার্মে যখন কাজ করতেন তখন সায়েবদের সংস্পর্শে তিনি বিস্তর এসেছেন, কিন্তু মেমদের নয়। মেমদের দেখেছেন দূর থেকে। তারা সায়েবদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসত, চ'লে যেত। তাঁর সঙ্গে কখনো কথা বলেনি, এমনকি তাঁকে দেখেও দেখেনি। অথচ ঐ সাদা চামড়ার মেয়েগুলোকে দেখলেই তাঁর ভালো লাগত, মনে হত ওরা শ্রেষ্ঠ জাতের স্ত্রীলোক। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বিজয়া আর ক'জন আছে, অ্যাঁ? বেশ বুঝলাম, অবিনাশবাবুর খুব ইচ্ছে কাছে ব'সে একজন মেমের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। বাজারে দাঁড়িয়েই উপসংহারে বললেন, 'বিজয়া তো খুব মনের কথা ধরতে পারে। ও বলে, "তুমি যে মেম বলতে হন্যে হ'য়ে ওঠো, সেটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। সাদা চামড়াটা বাদ দিলে তারা কীসে আমাদের থেকে আলাদা শুনি। যাও-না, যে-সব বাঙালী মেম বিয়ে করেছে, তাদের গিয়ে জিগ্যেস করো-না।" আমি অবিশ্যি প্রতিবাদ করি না, কিন্তু যাই বলুন, তফাত আছে বৈকি, যথেষ্ট তফাত। ওরা হল গিয়ে অন্য জাতের।'

অতএব অবিনাশবাবু এলেন এবং সঙ্গে শ্রীমতী বিজয়া। কৌতূহল তাঁরও ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন। অবিনাশবাবুর উপরোধে তাঁর বাড়িতে আমি কয়েকবার গিয়েছি। প্রত্যেকবারই দেখেছি বিজয়াদেবীর শাসন খুব জবরদস্ত। ছেলে চাকরি পেয়ে এবং মেয়ে বিয়ে হ'য়ে দূরে যাওয়ার পর ঝাড়া হাত পায়ে শাসনটা আরো শক্ত হয়েছে মনে হয়। অবিনাশবাবু কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গেলে, বিজয়াদেবী অনেক সময় তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন অথবা তাঁকে চুপ করিয়ে কথাটা

নিজেই সম্পূর্ণ করেন। এক-এক সময় স্ত্রীর দৃষ্টি-নিক্ষেপই অবিনাশ-বাবুর মৌন অবলম্বনের পক্ষে যথেষ্ট। মগজধোলাই কী জিনিস তাও আমি ওঁদের দেখেই প্রথম জানতে পারি। কোনো বিষয়ে অবিনাশ-বাবুর কোনো এক বক্তব্যের আভাস পাওয়া মাত্র বিজয়াদেবী হয়তো স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে উল্টো কথা ব'লে গেলেন, তারই দু'একদিন বাদে বাজারে শুনি অবিনাশবাবু জোর গলায় যে-মত ঘোষণা করছেন সেটা বিজয়াদেবীর সেই উল্টো মত। অবিশ্যি এতে আমি কখনো খুব বিস্মিত হইনি। কারণ বিজয়াদেবী বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী। স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময়টা ছাড়া তিনি বেশ যুক্তিটুক্তি দিয়েই কথা বলেন। দেশ সমাজ মানুষ সম্বন্ধে একটা বোধ তাঁর আছে। বোধই মনে হয়, কেননা বিজয়াদেবীকে আমি কখনো কোনো বইয়ের উল্লেখ করতে শুনিনি, খবরের কাগজ তিনি নিয়মিত পড়েন এমন প্রমাণও পাইনি। খবর তিনি লোকমুখেই সংগ্রহ করেন।

প্রথম দর্শনের পর অনেকক্ষণ অবিনাশবাবু মুগ্ধ নয়নে মারিয়ার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর 'ম্যাডাম' ব'লে দু'একটা প্রশ্ন তাঁর মুখ থেকে বেরোল। মারিয়া যেন স্নেহ আর কৌতুক নিয়ে তাঁকে লক্ষ করছিল। মনে হল, অবিনাশবাবুর সরল ছেলেমানুষী ভাব তার ভালো লেগেছে। বিজয়ার লঘুতাহীন স্পষ্ট কথাবার্তাও তার পছন্দ মনে হল। অঞ্জলি এসে একসঙ্গে একটু ব'সে আবার চা জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। সে দু'এক সময় যখন আসছিল, তখন আলোচ্য বিষয়ে দু'একটা মন্তব্য করছিল যাতে তার বুদ্ধির ছাপ ছিল, কিন্তু কোনো উৎসাহের চিহ্ন ছিল না। একটা লম্বা সোফায় আমার পাশে বসেছিল মারিয়া, তার পাশে পিটার। অঞ্জলি প্রধানত কথা বলছিল দাঁড়িয়ে, কখনো-বা একটা চেয়ারে বসছিল। কথা বলার সময় সে একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছিল না, সব কথাই বলছিল পিটারের দিকে চোখ রেখে। আমার কোনো উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করার সময়ও। ফলে আমি তখন একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল, অঞ্জলি আমাকে আর মারিয়াকে পৃথক ক'রে রাখছে।

আমার দিকটায় এক ছোট সোফায় ছিলেন অবিনাশবাবু। তাঁর মুখোমুখি অন্য দিকটায় বিজয়া। আমাদের বসাটা কোনো প্ল্যান ক'রে হয়নি, অমনিভাবেই হ'য়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অবিনাশবাবু ঝুঁকে প'ড়ে আমাকে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'কী সুন্দর ইংরিজী বলে। বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না আমার।' বলাবাহুল্য, তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য মারিয়া। কিন্তু মারিয়ার ইংরিজী সুন্দর নয়। সে 'ট'র জায়গায় 'ত' বলে আর স্বর-ধ্বনিগুলো নিটোল ক'রে দেয়। অর্থাৎ ইতালীয় ধ্বনির মারফত ইংরিজী। আমরা সাধারণত যেমন বাংলা ধ্বনি দিয়ে ইংরিজী বলি। তবে তা নিশ্চয় অবিনাশবাবুর পক্ষে সহজবোধ্য। আর শুধু অবিনাশবাবু কেন, প্রবীরের ক্লাব-বিহারী ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুরাও শুনলাম মারিয়ার ইংরিজী শুনে আহ্লাদে আটখানা। কালা সায়েবদের মেমরা নাকি একেবারে গ'লে পড়েছেন, কেবলই বলেছেন, 'কী মিষ্টি, কী মিষ্টি!' পিটার প্রথম দিনই ক্লাব থেকে ফিরে হাসতে হাসতে সে-কথা আমায় জানিয়েছিল। অথচ আমরা যদি বাঙালী ইংরিজী বলি, তাহলে সায়েব-মেমরা বড্ড ব্যাজার হন। সায়েবরা ভ্রূকুটি করেন আর মেমরা শিউরে শিউরে ওঠেন। ওঁরা বুঝিয়ে দেন, আমরা অশিক্ষিত। আমার এক-এক সময় ইচ্ছে করে মজা করবার জন্যে অঞ্জলিকে নিয়ে একবার প্রবীরদের ক্লাবে যাই। আমি বাংলার বর্ণমালা দিয়ে ইংরিজী বলব আর অঞ্জলি বলবে তার খাঁটি বিলিতী উচ্চারণে। সায়েব-মেমরা তখন আমাদের পরস্পরকে কীভাবে কাটাকুটি করেন দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অঞ্জলি বলে সে ঐ সব কাঁচঘরের উদ্ভিজ্জের মধ্যে কিছুতেই যাবে না।

অবিনাশবাবু মারিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে উসখুস করছিলেন। অবশেষে তিনি বিষয় খুঁজে পেয়েছেন, এমনভাবে হঠাৎ তাকে জিগ্যেস করলেন সে গঙ্গাস্নান করেছে কিনা। মারিয়া যখন বলল এখনো করেনি, তখন অবিনাশবাবু সে সম্বন্ধে আরো কিছু, বোধহয় গঙ্গাস্নানের উপকারিতার কথা, বলবার জন্যে ঠোঁট খুললেন।

কিন্তু তাঁর বলা হল না। বিজয়াদেবী ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত ক'রে দিলেন। পিটার-মারিয়া ইতিমধ্যেই পথেঘাটে দরিদ্র-জীবনের যে-নিদর্শন দেখেছে তাতে তারা যথেষ্ট বিচলিত। আমি পিটারকে আগেই বলেছিলাম, 'প্যারিসে ক'জন "ক্লশার" দেখেছো তুমি? এখানে দেখবে তাদের ছড়াছড়ি।' রাস্তায় ভিখিরি, ফুটপাতে হাঁড়িকুড়ি আর ন্যাংটো বাচ্চা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের সংসার এবং রিকশায় সওয়ারী বসিয়ে ঘোড়ার মতো মানুষের ছোটা, এই দৃশ্য-গুলো বিশেষ ক'রে তাদের মুষড়ে দিয়েছে। বিজয়াদেবী বললেন, 'বাইরে থেকে এ আর কতটুকু দেখেছেন?' অতঃপর তিনি সমাজের একদিকে বিপুল বিত্ত এবং অন্যদিকে দারুণ দারিদ্র্যের একটা বর্ণনা দিলেন দৃষ্টান্ত সহযোগে।

ভারতীয় নির্ধনতা বিষয়ে কথাবার্তা হয়তো আরো চলত। কিন্তু বাদ সাধলেন অবিনাশবাবু। গঙ্গাস্নানের বিষয়টা উনি ভুলতে পারেননি। এক ফাঁকে মারিয়াকে বললেন, 'তবে গঙ্গার ঘাটে স্নান করা আপনাদের পক্ষে মুশকিল। আব্রু ব'লে কিছু তো নেই।'

এবার অবিনাশবাবুর কথাটা আমি হারিয়ে যেতে দিলাম না। বিজয়াদেবী মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আগেই আমি বললাম, 'আব্রু একটা আপেক্ষিক ধারণা। ওটা নির্ভর করে স্থান এবং কালের উপর, অনেক সময় পাত্রের উপরও। শ্লীলতা অশ্লীলতার মতো।'

অবিনাশবাবু ন'ড়ে চ'ড়ে উৎকর্ণ হলেন। বিজয়াদেবী প্রতিবাদ জানালেন, 'এ আমি মানি না। শরীরকে শোভনভাবে আবৃত করা বা না-করা আপেক্ষিক ব্যাপার হবে কেন?'

আমি তর্কের সুযোগ পেয়ে গেলাম, বললাম, 'এই তো আপনিই তার উত্তর দিলেন। শোভনতাই তো আপেক্ষিক। কোন্‌টা শোভন কোন্‌টা অশোভন, সে-ধারণা কি সব সময় এক থাকে? এই ধরুন-না, আমাদের মেয়েদের এখনকার সাজ। তারা এখন প্রায় কাঁচুলি সাইজের ব্লাউজ প'রে পেট আর পিঠ অনেকখানি নিচে পর্যন্ত খোলা রাখে। পঞ্চাশ বছর আগে আপনি কি এটা কল্পনা করতে

পারতেন ? অবিশ্যি আপনার তখন জন্ম হয়নি। আমি কথার কথা বলছি।'

তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছরের কম ধ'রে নেওয়ায় বিজয়াদেবী খুব খুশী হয়েছেন মনে হল। বললেন, 'তা ঠিক, আমি সে-সময় জ'ন্মে যদি এই পোশাক দেখতাম, তাহলে "শক" পেতাম।'

'কিন্তু এখন পান না', আমি বললাম, 'তবে ? এখন হাওয়াটাই পাল্টে গিয়েছে। হাওয়ার গুণেই ওটা আর বে-আব্রু লাগে না। অবিশ্যি কারো কারো ও-রকম খাটো জামা ভালো লাগে না। যেমন, আপনি পরেন না। অঞ্জলিও পরে না। তাছাড়া, সৌন্দর্য-রুচির একটা প্রশ্নও আছে। যে-মেয়ের ভুঁড়ি আছে বা যার পিঠের মাংস থলথলে, তার ওই খোলা অংশ যেন পাগ্‌লা মেহের আলি, 'সব ঝুট হ্যায়' ব'লে চেঁচায়, সব কামনা-বাসনা নস্যাৎ ক'রে দেয়, যা নিশ্চয় সজ্জাধারিণীর অভিপ্রেত নয়। এ-রকম ক্ষেত্রে আমারও প্রতিবাদ আছে। কিন্তু ও-সব মেয়েরাও তো খাটো ব্লাউজ পরে। এটাই স্বীকৃত সাজ। ব্যক্তিগত আপত্তিটা আলাদা ব্যাপার।'

ব্যক্তিগত আপত্তি তো ক্লোদও জানিয়েছিল। প্যারিসের পথে-ঘাটে চুম্বনলীলায় আমি প্রথম-প্রথম হকচকিয়ে যেতাম। দেখতাম পার্কে, মেট্রোতে, বাসে, ফুটপাথে, এমনকি রাস্তা পার হতে হতে মেয়ে পুরুষের জোড় অধরসুধাপানে বিভোর। একদিন তো এক-জোড়া প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া মেট্রোতে আমাকে সারা পথ জ্বালিয়েছিলেন। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁরা ছু'জনে ছু'জনের মুখ দেখছিলেন আর মিনিট ছুই অন্তর-অন্তর হুমহাম ক'রে চুমু খাচ্ছিলেন। ঐ বয়সে এতটা আকর্ষণ টিকে থাকা নিশ্চয় ধন্য-ধন্য করবার মতো ব্যাপার। কিন্তু আমার বড় অস্বস্তি লাগছিল। প্রথম-প্রথম এই চুম্বনকাণ্ড আমার খুবই অদ্ভুত লাগত, মনে হত জান্তব। আগে তো কখনো দেখিনি। ক্রমে তা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফরাসী হ'য়েও ক্লোদ এই আচরণে তার আপত্তি প্রকাশ করেছিল। একদিন ক্লোদ

আমাকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, পল, এই যে প্রকাশ্যে মেয়ে-পুরুষ সব সময় চুমু খায়, এ সম্বন্ধে তোমার মত কী?'

আমি জবাব দিলাম, 'মত আবার কী? দেখলে আমার অস্বস্তি লাগে। বোধহয় দেখার অভ্যেস ছিল না ব'লে।'

ক্লোদ বলল, 'আমি কিন্তু ভীষণ আপত্তিকর মনে করি। নর-নারীর প্রেমে একটা অংশ থাকে যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত, একান্ত-ভাবে অন্তরালের, যা গভীর, এমনকি বোধহয় পবিত্রও বলা যায়। লোকের সামনে প্রদর্শনী দেবার বস্তু তা নয়। চুম্বন সেই অংশের। তাকে এই রকম বাজারী করাটা কদর্য।'

সাধারণ ফরাসী প্রথা ও অভ্যেসও ক্লোদের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রতিক্রিয়া খণ্ডাতে পারেনি।

'তাছাড়া,' আমি তর্কের সুতো আরো ছাড়লাম, 'বে-আব্রু হবার আনন্দ কখনো-কখনো মানুষকে পেয়ে বসে। সেটা অস্বাভাবিক এবং অস্বাস্থ্যকর, এমন কথা মোটেই বলতে পারি না।'

বেশ টের পেলাম বিজয়াদেবী কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছেন, এইবার বুঝি আমি নিষিদ্ধ রাজ্যে পা বাড়াই। অবিনাশবাবুর মুখ অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত।

আমি পিটারের দিকে ফিরে বললাম, 'তুমি তো ফরাসী রিভিয়েরায় গিয়েছো। দেখেছো তো সেখানে কী হয়।'

পিটার আমার বক্তব্যের গতিটা ঠিক ধরেছিল। সে বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি। মেয়েরা সামান্য বস্ত্রখণ্ড গায়ে সেঁটে বালুবেলায় শুয়ে থাকে অথবা সমুদ্রে স্নান করে। যেমন আমাদের পশ্চিমের সব দেশেই মেয়েরা করে। রিভিয়েরায় আবার ছ'ইঞ্চি মাপের ঐ দুটো কাপড়ও কোনো কোনো মেয়ে খুলে ফেলতে চায়।'

আমি বললাম, 'এটাকেই আমি স্বাভাবিক বলছিলাম। কোনো-কোনো মুহূর্তে প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে মানুষ তার প্রাকৃতিক দেহটাকে তার মধ্যে মিশিয়ে দিতে চায়। ভূমধ্যসাগরের নীল জল যখন ঈষদুষ্ণ হত, যখন শরীরে তার ছোঁয়া দুলে দুলে লাগত, তখন আমারই

তো মনে হত সর্বাঙ্গে তাকে অনুভব করি, কোনো কৃত্রিম ব্যবধান না-রাখি। মেয়েদের তো সে-ইচ্ছে আরো প্রবল হবে, কারণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবার প্রবণতা তাদের প্রকৃতিগত। সেইজন্যে রিভিয়েরার নির্জন উপকূলে কোনো-কোনো মেয়ে আবরণ খসিয়ে ফেলত। কিন্তু ওরকম করলে তো সভ্যতা বজায় থাকে না। তাই আইন করা হয়েছে। ফরাসীরা শিল্পী জাত ব'লে বস্ত্রখণ্ড দুটির আয়তন কমিয়ে দুই বিঘত মতো করতে দিয়েছে। কিন্তু একেবারে খসানে চলবে না। ও দুটি যথাস্থানে যাতে থাকে, সেজন্যে পুলিস টহল দেয়। আমি বলতাম, এ হল ফরাসী পুলিসের শিল্প-রসিকতা।'

মারিয়া মন দিয়ে শুনছিল। সে যে এই আলোচনায় একই সঙ্গে কৌতুক এবং আগ্রহ বোধ করছে তা বোঝা যাচ্ছিল। বিজয়া-দেবী গম্ভীর হ'য়েই থাকছিলেন। প্রকাশ্যে, বিশেষত তাঁর স্বামীর সাক্ষাতে এই ধরনের আলোচনা তাঁর মোটেই পছন্দ নয় মনে হচ্ছিল। সর্বনাশ ঘটতে চলেছে এমন অবস্থায় মুখ-চোখের যে-রকম টনটনে ভাব হয়, তাঁরও সেই রকম হচ্ছিল। তবু তারই ফাঁকে-ফাঁকে কৌতূহল উঁকি দিচ্ছিল। আর অবিনাশবাবু? তাঁরই কথার সূত্র ধ'রে মেমসায়েব মারিয়ার উপস্থিতিতে যে এই রকম একটা বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা হচ্ছে এতে তিনি যেন অভাবনীয় পুলক অনুভব করছিলেন। তাঁর মুখটা কেমন মাখা-মাখা হ'য়ে গিয়েছিল, ঠোঁট দুটো বিস্ফারিত হওয়ায় দন্তপাটির খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। আমি লক্ষ করলাম বার-কয়েক বিজয়াদেবী স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেই কয়েক বারই অবিনাশবাবুর ঠোঁট বন্ধ হ'য়ে গেল।

আলোচনা হয়তো আরো চলত। কিন্তু অঞ্জলি এসে অবিনাশ-বাবু ও বিজয়াদেবীকে উদ্দেশ ক'রে বলল, 'আপনারাও এখানে খেয়ে গেলে পারতেন।' অর্থাৎ আহারের সময় উপস্থিত, আড্ডা বন্ধ করতে হবে। বলাবাহুল্য অবিনাশবাবু এবং বিজয়াদেবী পুনরায় দর্শন দেবার ভয় দেখিয়ে বিদায় নিলেন।

৬

প্রবীরদের এক সায়েবী বন্ধুকে আমার অপমান করতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভদ্রলোক এসেছিলেন মারিয়াকে এবং সেই সঙ্গে পিটারকে নেমন্তন্ন করতে। (ভদ্রলোক বলা কি ঠিক হল? এই শব্দটার সঙ্গে ধুতিপাঞ্জাবির একটা স্বাভাবিক যোগ আছে। উনি তো এসেছিলেন স্যুট-টাই প'রে। যাক্‌গে।) কীসের নেমন্তন্ন? না বিয়ের। বাঙালী বিয়ে দেখার। পিটারকে বলতে হয় ব'লে বললেন। পিটারের অন্য কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, সে অস্বীকার করল। তাতে সায়েব যেন খুশীই হলেন। ওরা মারিয়াকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছে আমার মনে হল। প্রায় রোজই একটা-না-একটা বায়নাক্কা লেগে আছে: এখানে চলো ওখানে চলো। যেন মারিয়া ওদের সঙ্গ দেবার জন্যেই ভারতবর্ষে এসেছে। পিটার হলে আমার বোধহয় আপত্তি হত না। আমি ভাবতে পারতাম সব স্তরের লোকের সঙ্গে মেশা, সব রকম ব্যাপার দেখা তার কাজ। কিন্তু মারিয়া সম্বন্ধে আমি তা ভাবতে পারি না, যদিও বুঝি তারও বেড়ানো দরকার, নানান্ জিনিস দেখা দরকার। মারিয়াকে নিয়ে ওরা যখন টানাটানি করে, আমার রাগ হ'য়ে যায়। অথচ পিটারের কোনো বিরুদ্ধতা দেখি না। আমি মনে-মনে প্রত্যাশা করি সে বাধা দেবে, কিন্তু দেয় না। মারিয়াকে যার-তার সঙ্গে যেখানে-সেখানে যেতে দিতে তার আপত্তি হয় না। ওর এই নিশ্চিন্ততা কোন্ উৎস থেকে আসে? মারিয়ার প্রেম থেকে? না ওদের বোঝাপড়া থেকে, ওদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের বোধ থেকে? ওদের বোঝাপড়াটা ঠিক কেমন তা আমার বুঝে নিতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু আমার রাগ হয় কেন? মারিয়া যদি বেড়াতে বেরোয় তবে আমার সঙ্গেই বেরোক, এই রকম একটা বাসনা নিশ্চয় আমার

মনের মধ্যে থাকে। তাহলে আমার রাগ নিশ্চয় ঈর্ষার জন্যে হয়। কালা সায়েবকে সেদিন যে আমার অপমান করতে ইচ্ছে হয়েছিল তা ঈর্ষার কারণেই হয়েছিল তাহলে। অথচ আমার ঈর্ষা হওয়া উচিত নয়। মারিয়া পিটারের স্ত্রী। আমার প্রতি মারিয়ার বন্ধুত্ব আমি অনুভব করি, কিন্তু তার বেশী কিছু করি না, অন্তত এখনো পর্যন্ত না। আর আমিও তো বিবাহিত। কিন্তু আমার এই ঈর্ষা হওয়ার মধ্যে অঞ্জলির কি কোনো অবদান নেই? তার ভিতরকার অসহিষ্ণুতা যেন আমাকে অন্য দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নাকি এ আমার এক অজুহাত, নিজের মনকে চোখ ঠারা? মারিয়ার শীতল ছায়ার সামনে অঞ্জলির জ্বালা দিয়ে নিজের গায়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে নেওয়া?

বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে কিন্তু মারিয়া ভালোই করেছিল। ওর চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। মারিয়া ফিরে এসে পিটারকে আমাকে আর অঞ্জলিকে বিবরণ দিতে দিতে হেসে কুটিপাটি। তারই মধ্যে এক-এক সময় তার মুখে ও গলার স্বরে বিক্ষোভেরও ছাপ দেখেছিলাম।

দেশী সায়েবদের পাড়ায় হিন্দু বিয়ে। মোটরে ক'রে দামী দামী শাড়ি আর প্যাণ্টকোট-পরা বাঙালী সায়েব-মেমরা আসছিলেন। মারিয়া যখন পৌঁছল তখন বিয়ের অনুষ্ঠান সবে আরম্ভ হয়েছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হল একেবারে ছাঁদনাতলার কাছে। সেখানে মাঝখানে বর-বউ আর পুরুতঠাকুর ব'সে এবং যিনি কন্যা সম্প্রদান করছিলেন তিনি। চারদিকে সার সার চেয়ার পাতা।

—বর-বউ, পুরুতমশাই আর ঐ ভদ্রলোক কি চেয়ারে ব'সে ছিলেন?—পিটার জিগ্যেস করল।

মারিয়া জানাল, না, তাঁরা মেঝের উপর আসনে ব'সে ছিলেন। যাঁরা দেখছিলেন তাঁরা ছিলেন চেয়ারে, কেউ-কেউ দাঁড়িয়েও ছিলেন।

মারিয়াকে নিয়ে গিয়ে বসানো হল সামনের সারির এক চেয়ারে। মারিয়া বুঝল শ্বেতাঙ্গিনী অতিথি ব'লে তার এই সম্মান। তার

আশেপাশে পেছনে শাড়ি-পরিহিতা মহিলারা ছিলেন। তাঁরা সবাই ইংরিজীতে কথা বলছিলেন। শুধু মারিয়ার সঙ্গে না, নিজেদের মধ্যেও। সারা জমায়েতের মধ্যে একমাত্র পুরুতমশাইকে ছাড়া আর কাউকে একটানা বাংলা বলতে শোনেনি মারিয়া। তার পেছনে দুই মহিলা বেশ উচ্চকণ্ঠে আলাপ করছিলেন। বোধহয় সে যাতে শুনতে পায় সেই জন্যে। বিষয় ছিল শাড়ি। একজন অন্যজনের শাড়ির প্রশংসা করছিলেন। প্রশংসার অধিকারিণী তাঁর আর কিছু শাড়িরও বৃত্তান্ত দিলেন। এ-শাড়ির মূল্যটা কিন্তু জানালেন না। সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, পাড়টার দাম লেগেছে দু'শো টাকা। আমাদের কাছে বিবরণ দিয়ে মারিয়া মন্তব্য করল: 'শাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে ইংরিজী শেখার কী দরকার ছিল? তার জন্যে তো বাংলাই যথেষ্ট।'

হেলেনের প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র হ'য়েছিল। অবিশ্যি তার পেছনে প্ররোচনাটাও অন্য রকম ছিল। হেলেন এসেছিল ভারতবর্ষ দেখতে। ভারতবর্ষের মানুষের দুর্দশায় সহানুভূতি নিয়ে সে এসেছিল। এখানেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তারও নেমন্তন্ন হয়েছিল এক বিয়ে বাড়িতে। তবে সেটা যথার্থ নেমন্তন্ন। মানে তাকে বিয়ে দেখানোর চেয়ে খাওয়ানোই ছিল বড় উদ্দেশ্য। খেতে ব'সে হেলেন দেখে খাদ্য সম্ভারের যেন শেষ নেই। একটার পর একটা আসছে তো আসছেই। তাতে তার খুব আপত্তি হয়নি। কারণ উৎসব-অনুষ্ঠানে এ-রকম আয়োজন হতেই পারে, যদিও নীতির দিক দিয়ে অতটা না-হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। তার আপত্তি হল যখন প্রায় জোর ক'রে তার পাতে খাবার চাপানো হল। সে অল্প চায় জানানো সত্ত্বেও আহার্য ঢেলে দেওয়া হল। তখন হেলেন বলল, 'এত দিলেন কেন? আমি তো খেতে পারব না।' গৃহকর্তা বললেন, 'যা পারেন খান, না-পারলে খাবেন না।' হেলেন বলল, 'তাহলে যে খাবারগুলো নষ্ট হবে।' গৃহকর্তা জবাব দিলেন, 'হোক নষ্ট।' ব্যস, সেই যে হেলেন হাত গোটাল, মুখে একটা কণাও

আর দেয়নি। পাত চাপা দিয়ে ব'সে ছিল। পরে হেলেন আমাকে বলেছিল, 'আমার চেঁচামেচি করতে ইচ্ছে করছিল, অতি কষ্টে সংযত ছিলাম। যে-দেশের অধিকাংশ মানুষ দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, সেই দেশের লোক হ'য়ে বলে কিনা, খাবার নষ্ট হতে দাও। অসহ্য।' আমার ইচ্ছে হয়েছিল বলি : 'হেলেন, তোমার আত্মীয়-কুটুম্ব জ্ঞাতিরা উড়ে এসে জুড়ে ব'সে এই দায়িত্বহীনতা আমাদের শিখিয়েছে, না-শিখিয়ে থাকলেও অন্তত লালন করেছে। এখন অজস্র দুঃখের মধ্যে দিয়ে না-গেলে এর কোনো প্রতিকার হবে না।' কিন্তু হেলেনের প্রতিক্রিয়ার সুস্থতা আমার ভালো লেগেছিল, সেইজন্যে কিছু বলিনি।

মারিয়ার কাহিনী শুনে পিটার বলল, 'আমি তোমার মতো ও-সব স্থূল ব্যাপারের মধ্যে এখন নেই। আমি লেখক আর চিত্রকরদের জগতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছি।'

'ঐ সূক্ষ্ম জগৎটাকে কেমন মনে হচ্ছে?'—প্রশ্ন করলাম মারিয়া ও আমি প্রায় একসঙ্গে।

পিটার উত্তর দিল, 'এখনো ঠিক প্রবেশ লাভ করিনি। আবেদনপত্র পেশ করেছি বলতে পারো। আমার মনে হচ্ছে শিল্পীদের কাছাকাছি যাওয়া কঠিন হবে না, কিন্তু লেখকদের সম্বন্ধে আমি আশ্বস্ত হতে পারছি না।'

আমিও এমনি ধরনের কথাই আঁদ্রেকে বলেছিলাম : 'আমি একজন বিদেশী, তোমাদের দেশে এসেছি। আমার একটু লেখা-টেখার অভ্যেস আছে। আমার ভাবসাব বেশী হওয়া উচিত লেখকদের সঙ্গে। তা নয়, দেখছি বেশী ভাব হ'য়ে গিয়েছে শিল্পীদের সঙ্গে।'

আঁদ্রে বলেছিল : 'তা তো হবেই। লেখক আর শিল্পীদের মধ্যে তফাত আছে তো। ওরা ভেতরে সেঁধোতে চায় আর আমরা বাইরে আসতে চাই। সেইজন্যে তোমরা এখানে পৌঁছনোমাত্র তোমাদের সঙ্গে আমাদের দোস্তি হ'য়ে যায়, আর ওদের নাগাল তোমরা পাও না।'

আঁদ্রের মস্করা বাদ দিলেও পার্থক্যটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোথায় যেন তার একটা মানে রয়েছে। আমার মনে হত আসল তফাতটা ভাষার মধ্যে। ভাষার ব্যবধান মুখের বেলায় আছে, চোখের বেলায় নেই। শিল্পীরা তামাম দুনিয়াকে হাত বাড়িয়ে ডাকতে পারে: 'এসো, দ্যাখো।' লেখকরা কি তা পারে? তাদের প্রথম মনোভাবই তো সন্দেহের: আমি ওর ভাষা জানি না, আমার ভাষা ও কতটা জানে তাও জানি না; বিদেশী যখন, তখন এতটা নিশ্চয় জানে না যে আমার সৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে; সুতরাং কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তারা গুটিয়ে যায়, নয়তো নিজের নিজের কল্পিত শ্রেষ্ঠতাকে আঁকড়ে মৌখিক সৌজন্য দেখায়। নাকি বস্তু শরীর আর দৃশ্যকে নিয়ে কারবার করে ব'লে শিল্পীরা যে-কোনো রক্তমাংসের, যে-কোনো স্পর্শগ্রাহ্যের দৃষ্টিগ্রাহ্যের কাছাকাছি যেতে পারে; আর লেখকরা মনের জট খুলতে গিয়ে বা পাকাতে গিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে যায়? এ সবই অবিশ্যি আমার কল্পনা। হয়তো সবই ভুল। কিন্তু আঁদ্রে, এতুয়ার, আলব্যার, এদের আমি ভুলি কী ক'রে? যখনি তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা মনের কোনো আগল রাখেনি। নিজের দেশের লোকের মতো কাছে টেনে নিয়েছে। সেই প্রবীণ শিল্পী গিশার। তাঁর সঙ্গে আমার তো মাত্র একদিনই দেখা। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধ আমাকে তাঁর ছবি দেখালেন, তাঁর ধ্যানধারণা বোঝালেন, আমার কাজকর্মের খোঁজ নিলেন, আমাকে সাহিত্য-বিষয়েরও হদিস দিলেন।

অবিশ্যি লেখকরা সবাই যে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন তা নয়। সেই বড় কবি যখন আমার অনুসন্ধানে সাড়া দিয়ে ফ্রান্সের দূরপ্রান্ত থেকে তার ক'রে আমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, তখন আমি খুশী হয়েছিলাম। কিম্বা যিনি তাঁর ঘরে আমাকে বাংলা কবিতা শোনাতে ব'লে পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তিনিও আমাকে কম খুশী করেননি। আমার খুশীটা তাঁদের ভ্রাতৃত্বের জন্যে নয়, ভদ্রতার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত এই ভদ্রতাই ছিল পাঁচিল। খোলামেলা হাওয়ার জন্যে আমি পেছন হ'টে এক দৌড়ে পালাতাম শিল্পীদের এলাকায়।

দেখা যাক, এখানে পিটার কতখানি সফল হতে পারে। আমার মোটেই ভাবতে ইচ্ছে করে না তার সাদা চামড়া এ-বিষয়ে তার সহায় হবে।

৭

সকাল থেকেই দেখছিলাম পিটারের মুখটা বেশ গম্ভীর। সদা-হাস্যময়ী মারিয়ার হাসিও একটু রাশটানা, যেন সে পিটারের গাম্ভীর্যকে সম্মান দেখাতে চাইছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন পিটারের স্বভাবসুলভ হৃদ্যতা এমন থমকে গেল। আমাদের বাড়িতে আর থাকতে কি ওর ভালো লাগছে না? কিন্তু ভালো যদি নাও লাগত, তাহলেও পিটারের ব্যক্তিগত হৃদ্যতা যে বিন্দুমাত্র কমত না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাকে আমি চিনি। পিটারের এই ভাবান্তরটা কাল থেকে হয়েছে। কাল ওর একটা চিঠি এসেছিল এয়ার মেলে। তবে এই চিঠির সঙ্গে কি এর কোনো যোগাযোগ আছে?

রাত্তিরে খাওয়ার পর আমরা সবাই যখন একসঙ্গে টেবিলে ব'সে আছি, তখনো উঠিনি, পিটার গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করল, 'পলাশ, তুমি নিশ্চয় ইজাবেলকে চিনতে?'

আমি সাগ্রহে বললাম: 'সেই বেলজিয়ান মেয়েটা তো? খুব চিনতাম। অমন সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি, আগেও না পরেও না।'

পিটার মন্থরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সেই ইজাবেল। সে আত্মহত্যা করেছে।'

আমাকে কেউ যেন প্রচণ্ড আঘাত করল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। এই খাবার টেবিল, পিটার, মারিয়া, অঞ্জলি,

সবাই সব কিছু অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি যেখানে ফিরে এলাম, সে আমাদের খাবার ঘর নয়, সে প্যারিসের ভোজনশালা।

দত্তর হাতে ভর দিয়ে ইজাবেল ঢুকছে। সারা জায়গাটা আলো হ'য়ে উঠল। আমরা যারা খেতে বসেছিলাম, সবাই ঘুরে তাকালাম। দত্তর মুখে বিজয়ীর গর্ব। ইজাবেল তার পাশে পল্লবিনী লতার মতো। মেয়েটা ভালোবাসে বটে দত্তকে। প্যারিসে যখন আসে, এক মুহূর্ত দত্তকে ছাড়া থাকে না। তখন তার মুখ দেখলে মনে হয় সে নন্দনকাননে রয়েছে। ইজাবেল বেলজিয়ামের মেয়ে। তার বাবা বিরাট ধনী। আদুরে মেয়ের কোনো ইচ্ছে পূরণ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। প্যারিসের জীবন-স্রোতে গা ভাসাবার জন্যে সে মাঝে মাঝে আসত। বাবা হয়তো ভাবতেন, এখানে একজন মনোমতো বর সে খুঁজে নেবে। একবার প্যারিসে এসে দত্তর সঙ্গে ইজাবেলের আলাপ। তখন থেকেই দত্ত তার নয়নের মণি। দত্তর জন্যে এখন সে প্রায়ই প্যারিসে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে এক কাঁড়ি টাকা। তখন দত্তর নতুন স্যুট হয়, শার্ট হয়, জুতো হয়। ইজাবেল এলে দত্ত আর আমাদের সস্তা রেস্তোরাঁয় খায় না। সম্ভ্রান্ত পাড়ায় দামী রেস্তোরাঁয় তার ভোজন-পর্ব শুরু হয়। ব্যয়ভার সবই যে ইজাবেলের, সে-তথ্য সে গোপনও রাখে না। এরই মধ্যে দু'একদিন সে আমাদের রেস্তোরাঁতেও এসে পড়ে। সঙ্গে ইজাবেল। স্পষ্টতই সে তার ভাগ্যের জৌলুস আমাদের দেখাতে চায়। এ কথা গোপন করা বৃথা যে, ঈর্ষা আমাদের হয়। ইজাবেলের রূপ দেখে, তার আত্মসমর্পিত ভাব দেখে, তার অর্থব্যয় দেখে আমরা যে স্বপ্ন দেখব এবং দত্তকে মনে মনে হিংসে করব তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। দত্ত কিন্তু বিবাহিত। দেশে তার স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়ে আছে। তার বিয়েটা যে প্রণয়ঘটিত সে কথা দত্ত গায়ে প'ড়ে আমাদের একাধিক-বার বলেছে, যখন ইজাবেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি তখন।

অনেক দিন হল তার মুখে স্ত্রীর কথা আর শুনি না। ইজাবেল কি জানে দত্তর স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে?

—'কালকের চিঠিতে আমি এই খবর পেলাম।'—পিটারের স্বর আমার কানে এল।

কী খবর? ও হ্যাঁ, ইজাবেল আত্মহত্যা করেছে। কেন আত্মহত্যা করল ইজাবেল?

যদিও কোনো শব্দ আমি উচ্চারণ করিনি, তবুও আমার চোখে প্রশ্নটা স্পষ্ট ফুটে উঠল। পিটার বলল, 'আমি তোমাদের এই দত্তকে চিনতাম না, ইজাবেলকেও না। তবে তোমার মুখে তাদের কথা শুনেছিলাম এবং একদিন তাদের দেখেছিলাম। তুমিই দেখিয়েছিলে, পলাশ। মেয়েটিকে আমার ভালো মেয়ে মনে হয়েছিল।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। পিটার ব'লে চলল, 'যে ছেলেটি আমাকে চিঠি লিখেছে, সে দত্তকে জানত না, ইজাবেলকে জানত। দত্ত ইতিমধ্যে একবার ভারতবর্ষে এসেছিল এবং আবার ফ্রান্সে ফিরে গিয়েছিল। ফিরে গিয়ে সে ইজাবেলকে ঠিক কী বলেছিল কেউ জানে না। তবে ইজাবেলের আচরণে ও কথার ভাবে তার বন্ধুবান্ধবের অনুমান হয়েছিল দত্ত ভারতবর্ষে তার পাট গুটোবার চেষ্টা করছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্সে ইজাবেলের সঙ্গে সংসার পাতবে। কিন্তু দত্ত দ্বিতীয়বার যখন ভারতবর্ষে এল, তখন আর ফিরে গেল না। ইজাবেল তার পথ চেয়ে রইল। বছরের পর বছর চলল ইজাবেলের প্রতীক্ষা। বোধহয় সে অন্তহীন প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল (আমি মনে মনে বললাম: শবরী)। এই অবস্থায় একদিন কোনো এক বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে ইজাবেলের কাছে খবর পৌঁছল যে, বিবাহিত দত্ত স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সংসার করছে। সেইদিনই রাত্তিরে ইজাবেলের মৃতদেহ পাওয়া গেল। সে আত্মহত্যা করেছে। লিখে গিয়েছে, তার কাউকে কিছু বলবার নেই, এই পৃথিবীতে থাকতে তার আর ভালো লাগছে না।

কিন্তু ঝুনু কেন আত্মহত্যা করল? হ্যাঁ ঝুনু। সেই যার সঙ্গে একই ঝড়ের রাতে আমি জন্ম নিয়েছিলাম, যে আমার খেলার সাথী ছিল, ক্রিস্তিনকে দেখে যাকে দেখার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়েছিলাম। গত দশ বছর ধ'রে আমি ঝুনুর ঘটনাটা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা ক'রে আসছি। যখনই তা আমার ভেতরে উঁকি দিতে চেয়েছে, আমি জ্বলজ্বলে আলোর মধ্যে আমার মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছি। তার লুকিয়ে থাকার জায়গা রাখিনি। কিন্তু তবু নিশ্চিহ্ন করতে পারা গেল কই? ইজাবেল ঝুনুকে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

আমি ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার কিছুদিন আগে ঝুনু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমার কলকাতার ডেরার ঠিকানা সে কী ক'রে পেয়েছিল সে-ই জানে। তার সঙ্গে ছিল একটি ছোট ছেলে। ঝুনুকে সে 'মা' ব'লে ডাকছিল। ঝুনুর ছেলে। ঝুনু তাহলে মা হয়েছিল। ঝুনুকে দেখলে কি আমি চিনতে পারতাম? সে কী ব'লে আমাকে সম্বোধন করত? পলাশ? নাকি কোনো সম্বোধনই করত না, শুধু চোখ তুলে 'তুমি' ব'লে কথা বলত? কিন্তু কী কথা বলত ঝুনু? কী বলতে সে চেয়েছিল?

আমি ভারতবর্ষে নেই শুনে ঝুনু হতাশার একটা ভঙ্গি করেছিল। আমি শীগ্‌গির ফিরে আসছি জেনেও তার মুখভাব বদলায়নি। বরং খবরটা সে উদাসীনভাবেই শুনেছিল। যেন তাতে কিছু আসে যায় না। যেন সে-মুহূর্তটাই তার কাছে সব। ছেলের হাত ধ'রে সে ধীরে ধীরে উঠেছিল, ধীরে ধীরে বলেছিল; 'আমি যাই।' নাম জিগ্যেস করায় উত্তর দিয়েছিল; 'আমার নাম ঝঞ্ঝা সেন। ঝুনু বললে উনি চিনবেন।' কোনো ঠিকানা সে জানায়নি। চূড়ান্ত ঘটনাটা আমি এসে পৌঁছোনোর আগেই ঘটেছিল। যে-কাগজে সেই খবর বেরিয়েছিল, সেটা আমার আস্তানার যারা ঝুনুর সঙ্গে কথা বলেছিল তারা রেখে দিয়েছিল, কেননা সেই অদ্ভুত নামটা তাদের বিশেষভাবে মনে ছিল। আমি এসে খবরটা পড়লাম;

ভবানীপুরের এক ফ্ল্যাটে ঝঞ্ঝা সেন নামে এক মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর স্বামী এবং একটি বালকপুত্র বর্তমান। খবরটা প'ড়ে আমি বেশ খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হ'য়ে ছিলাম। যখন শরীরে সচলতা ফিরল, আমার প্রথমেই ঝোঁক এল ভবানীপুরের ঐ বাড়িতে ছুটে যাই। কিন্তু তক্ষুনি খেয়াল হল সেটা কী রকম অর্থহীন হাস্যকর কাজ। যে আমাকে চিনত, যে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, সে তো চ'লে গিয়েছে। যারা রয়েছে, তাদের কাছে আমি কে? কেউ না। শূন্য।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়ের টুকরো আঁকড়ে ধরতে চায়, তেমনি-ভাবে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুনু তলিয়ে গেল।

আমার মঞ্জুবৌদি কি বেঁচে আছে? তার আত্মহত্যা করার কোনো খবর তো আমি পাইনি। ক'রে থাকলে যে সে-খবর নামধামসুদ্ধ বেরোবে তার মানে নেই। কিন্তু কেন আত্মহত্যা করবে মঞ্জুবৌদি? আমার কাছে সে মরার কথা বলেছিল বটে। কিন্তু সে-রকম তো অনেকেই বলে। আনন্দ হলেও বলে। সব কিছু ছাপিয়ে 'আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।' তাই ব'লে তারা সত্যি-সত্যি মরে না। কিন্তু যারা নিজেদের শেষ ক'রে ফেলে, তারা তো সুখের অনুভূতি নিয়ে তা করে না। তবে কি দুঃখের অনুভূতি নিয়ে করে? কে জানে? শুধু এইটুকুই স্পষ্ট যে, তারা বেঁচে থাকতে চায় না। বেঁচে থাকার মানে কার কাছে কখন ফুরিয়ে যায়, আমি কী ক'রে বলব? মঞ্জুবৌদির মনের ইতিহাস আমি জানতে পারিনি, যেমন জানতে পারিনি ঝুনুর।

আচ্ছা, আমার কি কখনো আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হয়েছিল? আত্মহত্যার পরিষ্কার ইচ্ছের কথা মনে পড়ে না। তবে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে লোপ পাওয়ার কথা বেশ মনে আছে। সেটা মন্বন্তরের বছর। গ্রাম থেকে কাতারে-কাতারে লোক আসছে কলকাতায়। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী যুবকযুবতী। আসছে অন্নের আশায়। কিন্তু অন্ন নাগালের বাইরে। আমরা খাচ্ছি, কিন্তু তাদের দিতে পারছি

না। শুধু থাওয়ার সময় তাদের চিৎকার শুনছি আর কান চেপে ধ'রে আমাদের গলার মধ্যে ভাত গুঁজে দিচ্ছি। না-খেলে মানুষ আর কতদিন বাঁচবে? তারা মরতে আরম্ভ করেছে কাতারে-কাতারে। রাস্তায়, পার্কে, দোরগোড়ায়। আমি বাইরে যাই, দেখি এধারে-ওধারে মৃতদেহ, দেখি মানুষ খাবি খেয়ে মরছে। একদিন একটি ফুটফুটে কিশোরী আমার চোখের সামনে ফুটপাথের উপর ছটফট করল, তার নরম বুকটা কয়েকবার হাপরের মতো ফুলে উঠে থেমে গেল। আমি তার মুখটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেখানে আর ক্ষিদে নেই, জ্বালাপোড়া নেই, সব মিটে গিয়ে ফুটে উঠেছে এক পরম নিশ্চিন্ততা। মনে হল সে তার আসন্ন যৌবনের সমস্ত গোপন কথা নিয়ে মা'র কোলে গিয়ে শুয়েছে। তাকে আমার খুব আদর করতে ইচ্ছে করছিল। আর মনে হচ্ছিল আমিও তার ঘুমন্ত রাজ্যে চ'লে গিয়েছি, আমি এই জীবিতদের কেউ না। আশেপাশে সামনে-পেছনে মানুষ না-খেতে পেয়ে মরছে, ম'রে প'ড়ে আছে, আর আমি কেন খেয়ে বেঁচে আছি, এটা আর বুঝতে পারছিলাম না। আমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ আর আমার কাছে ছিল না। কেউ যদি তখন আমাকে মেরে ফেলতে চাইত, আমি নিশ্চয় আপত্তি করতাম না।

কিন্তু কখনো আত্মহত্যার ইচ্ছে কি আমার হয়েছিল? মনে হয়, হয়েছিল। কী কারণে, কোন্ অবস্থায় হয়েছিল, তা আমি বলতে পারব না। সে কি বয়ঃসন্ধিতে? হতে পারে। তবে পার্থিব অস্তিত্বের শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়ানোর একটা অনুভূতি যেন আমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল মনে হয়। কিন্তু আমার টুঁটি চেপে ধরতে পারেনি। পারেনি যে তার প্রমাণ আমার এই রক্তমাংসের শরীর। আমি এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়। আমার নিজের মনের ইতিহাসই কি সব সময় আমি জানতে পারি? এই যে মারিয়াকে আমার এত ভালো লাগছে অঞ্জলির থাকা সত্ত্বেও, পিটারের থাকা সত্ত্বেও, তা-ই তো আমার কাছে এক ভয়ঙ্কর রহস্য।

৮

আমি বুঝতে পারি না অঞ্জলি আমাকে দিয়ে কী করাতে চায়। খাবার টেবিলে ইজাবেলের কাহিনী শুনে অঞ্জলি মন্তব্য করেছিল : 'পুরুষরা এমনই হয়।' কেন সে ঐ মন্তব্য করলে? বলতে গেলে পুরুষ তো মাত্র একটাই সে দেখেছে। এই আমাকে। তাহলে আমিই তার কথার লক্ষ্য। কিন্তু আমি তো এখনো তেমন হইনি। তবে কি অঞ্জলি আমাকে তেমন হওয়াতে চায়? এবং সেই হওয়ানোর দ্বারা তার বক্তব্য প্রমাণ করতে চায়? এ তো সেই সৌখিন জ্যোতিষীর ট্র্যাজিক কাহিনীর মতো হল। ভদ্রলোক জ্যোতিষশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ঐ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস জন্মেছিল। একদিন তাঁর নিজের কুষ্ঠীবিচার করবার খেয়াল হল। তিনি গণনা ক'রে দেখলেন, যে-বয়সে তিনি উপনীত হয়েছেন সেই বয়সে তাঁর অপঘাতমৃত্যু হবে, তিনি আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু আত্মহত্যা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জাগল। আত্মহত্যার কোনো কারণ তিনি দেখতে পেলেন না। কিন্তু তিনি যদি আত্মহত্যা না-করেন তাহলে তো জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যে হ'য়ে যায়। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রকে অভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্যে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

অঞ্জলির সঙ্গে আমার শারীর সম্পর্ক কতদিন আমাদের বেঁধে রাখতে পারবে আমি জানি না। কারণ তার বাইরে আমরা কোনো কিছু গড়ছি না। হয়তো একটা কিছু গ'ড়ে উঠতে পারত যদি অঞ্জলি আমার জন্যে অন্ধ না-হ'য়ে যেত। ও গান্ধারীর মতো অন্ধ হয়নি। ও অন্ধ হয়েছে আমার প্রতি ওর অসম্ভব আকর্ষণকে সহজ করতে না-পেরে। আমার এক-এক সময় মনে হয় অঞ্জলি হীনমন্যতায় ভুগছে। ও অনেক সময় নিজেকে আমার কাছে জাহির করে, যা

সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বোধহয় সে নিজেকে আমার প্রতিযোগী হিসেবে খাড়া করতে চায়, যাতে আমি তো বটেই অন্যেরাও তার ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। অথচ আমি তাকে সে-ভাবে দেখি না। অঞ্জলির সঙ্গে আমার আবার প্রতিযোগিতা কীসের? আমার মনের জগৎ, আমার কাজের প্রকৃতি তার থেকে একেবারে আলাদা। না, আমি অঞ্জলিকে মোটেই সে-ভাবে দেখি না। বস্তুত কোনো কোনো সময় আমি তাকে দেখিই না। আমার নিজের দেখা আর ভাবা নিয়ে আমি এমনই ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ি। হয়তো সেই কারণেই অঞ্জলির এই প্রতিক্রিয়া।

ইতিমধ্যে একদিন আমি ঠাট্টা ক'রে অঞ্জলিকে বললাম, 'আমি যদি হঠাৎ গায়েব হ'য়ে যাই অথবা ট্রামে-বাসে চাপা পড়ি, তাহলে তোমার কাছে আমার কিছু কদর হবে মনে হয়। দেখছি ভালোবাসা পাবার ঐ একটা মাত্র উপায়ই আছে।'

অঞ্জলি বলল, 'আমার ভালোবাসার জন্যে দারুণ আগ্রহ দেখছি। যাক, কথাটা জানালে ব'লে ধন্যবাদ।' আমার কথার মধ্যে যে-ঘটনার ইঙ্গিত ছিল, অঞ্জলি তা ঠিকই বুঝল, তবে সেটা এড়িয়ে সে বিদ্রূপের অস্ত্র ধরল।

ঘটনাটা অবিনাশবাবু ও বিজয়াদেবীকে নিয়ে। হঠাৎ বিজয়াদেবী সন্ধের সময় এসে উপস্থিত হন আমাদের বাড়িতে। উনি আমাদের বাড়ি আসেনই না বলা যায়। এর আগে মাত্র দুবার এসেছেন এবং দুবারই অবিনাশবাবুর সঙ্গে। সেদিন এলেন একা। তাঁর চেহারা দেখে বুঝলাম কিছু-একটা ঘটেছে। তাঁর বিজয়িনী মূর্তি আর নেই! চোখে-মুখে পরাজয়ের সংবাদ। এবং তা জানাতেও তাঁর কুণ্ঠা নেই। কী ব্যাপার? বিজয়াদেবী জানালেন যে অবিনাশবাবু সকালে বেরিয়ে গিয়েছেন, সারাদিন আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে তাঁর সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এবং যা অবিনাশবাবু কখনো করেন না, তাই করেছিলেন। তিনি রাগ করেছিলেন। কী নিয়ে বচসা? প্রশ্ন ক'রে বুঝলাম, অবিনাশ-

বাবু মারিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বিজয়াদেবী তাঁকে হ্যাংলামো করতে বারণ করেছিলেন। তখন অবিনাশবাবু জোর গলায় স্ত্রীকে বলেছিলেন ভদ্রভাবে কথা বলতে। স্ত্রীর মেজাজ আর বাগ মানেনি। তিনি স্বামীর অপদার্থতা-বিষয়ে কড়া কড়া শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর মতো পুরুষের সঙ্গে বাস করা কোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে যে কত কঠিন তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অবিনাশবাবু তক্ষুণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান এবং যাওয়ার সময় ব'লে যান তিনি আর ফিরবেন না। বিজয়াদেবী স্বামীর এই কথায় কোনো গুরুত্ব আরোপ করেননি, বরং সে-কথা শুনে তাঁর হাসিই পেয়েছিল। কারণ তাঁর জানা ছিল তাঁর উপর প্রতি পদে নির্ভরশীল ঐ পুরুষটি তাঁকে ছাড়া সম্পূর্ণ অসহায়। একেবারে শিশুর মতো। এই শিশুর জন্যে তিনি এখন ব্যাকুল। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের কোনো চিহ্ন আর দেখলাম না। তিনি কেবলই বলছিলেন, 'ও তো কিছুই জানে না। কী খাবে, না-খাবে তাই তো বোঝে না। সারাদিন হয়তো কিছু খায়নি। আমি এখন কী করি?'

আমি বিজয়াদেবীকে প্রবোধ দিলাম, 'আপনি ভাববেন না। অবিনাশবাবু যতই অপটু হোন, সত্যি-সত্যি তো আর শিশু ন'ন। নিশ্চয় তিনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং কোনো নিরাপদ জায়গাতেই আছেন। তিনি কোথায় কোথায় যেতে পারেন তা ভেবে খোঁজ করতে হবে।'

বিজয়াদেবী বললেন, 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আপনাদের এখানেই আসবে। কিন্তু পরে মনে হ'ল তা আসবে না। তাহলে যে সহজেই তাকে পাওয়া যাবে। এখন আমার ভয় হচ্ছে রাস্তায় কিছু ঘটল না তো। যা অসাবধান মানুষ।' উপসংহার টানলেন: 'সারাজীবন কি আমাকে এমনিভাবে জ্বালাবে!' বিজয়াদেবীর স্বরে কিন্তু জ্বালা নেই, কান্নার সুর। তাহলে দেখছি মমতা তৈরি হয়েছে, আমি মনে-মনে বললাম।

আমি কিন্তু অবিনাশবাবুকে মোটেই অপটু ও অসাবধান মনে করি না। তিনি যে-ভাবে বাজার করেন, যে-ভাবে আমাকে গর্ভমোচা কিনিয়ে দিয়েছিলেন, তা যথেষ্ট দক্ষতার নিদর্শন। আর যিনি জিনিসপত্রের দরদামের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখেন, তিনি রাস্তা পার হতে গিয়ে অসাবধানতার জন্যে গাড়ি চাপা পড়বেন, এ আমি বিশ্বাসই করি না। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়, তার খবর করতেই হয়। নইলে বিজয়াদেবী চ'লে যাওয়ার পরও তাঁর হাহাকার আমাকে ঘুমোতে দেবে না।

আমাদের কথাবার্তা যেখানে হচ্ছিল, অঞ্জলি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। সব সে শুনল, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করল না।

কিন্তু অবিনাশবাবুকে আমার খুঁজতে যেতে হল না। কারণ অবিনাশবাবুই আমার কাছে এলেন। বিজয়াদেবী বিদায় নেওয়ার বেশ খানিকক্ষণ বাদে। অবিনাশবাবু যে নিজেই আসবেন, এ-সম্ভাবনার কথা একবার আমি ভেবেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, ধমক-টমক খেয়েও এতকাল যার সঙ্গে ঘর করার অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে, তার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে তাঁর থাকাটাই স্বাভাবিক। মারিয়া সম্বন্ধে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু মারিয়া তাঁর কল্পলোকের অধিবাসিনী। বিজয়াই বাস্তব।

অবিনাশবাবু অকপটে তাঁদের কলহ বর্ণনা করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন কিনা এবং এসে কী বলেছিলেন তা জিগ্যেস করলেন। তিনি সারাদিন কোথায় ছিলেন, কী খেয়েছেন, এসব আমি প্রশ্ন ক'রে জানলাম। তাঁর পকেটে টাকা ছিল, এক রেস্তোরাঁয় তিনি দুপুরে খেয়েছেন (আমি নিশ্চিত যে, সস্তায় ভালো খাবার যেখানে পাওয়া যায় এমন কোনো রেস্তোরাঁতেই তিনি খেয়েছেন), তারপর ম্যাটিনি শো'তে একটা ফিল্ম দেখেছেন, ইংরিজী ফিল্ম, সেখান থেকে বেরিয়ে কাটলেট সহযোগে এক কাপ চা খেয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দোকানের শো-কেস দেখেছেন, খানিকক্ষণ বসেছিলেন পার্কে! কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে থাকায় শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা ব'লে হাল্‌কা

হবার জন্যে না-এসে পারলেন না। কোথায় রাত্রিযাপন করবেন তা ঠিক করেননি।

আমার এটা ধরতে অসুবিধে হয়নি যে, তিনি চাইছিলেন আমি তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে রাজী করাই। আমি তাই করলাম। রাত্তিরে আমার সুনিদ্রার ব্যবস্থা হল।

অবিনাশবাবু এলেও অঞ্জলি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবারও সে সবই শুনল এবং একটি শব্দও উচ্চারণ করল না।

৯

ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের চালের উপর দ্রুত লয়ে বাজনা বেজে চলেছে, অনেক মৃদঙ্গ একসঙ্গে। বাতাসও খুব জোর। পানাপুকুরের ধারে ঝাঁশঝাড়গুলোকে ঝাঁকাচ্ছে, একবার তাদের মুখ গুঁজে ধরছে মাটিতে, আবার তখনি টেনে তুলছে উপরে, একটার সঙ্গে আর একটার মাথা ঠুকে দিচ্ছে। আমি শুনতে পাচ্ছি সেখান থেকে এবং আরো বহু-বহু দূরের বনজঙ্গল পাহাড় সমুদ্র থেকে তুমুল শব্দ নিয়ে এসে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের দরজার উপরে। মেটে পথগুলো এতক্ষণে জলে জলাকার হ'য়ে গিয়েছে, ছোট ছোট নদীর মতো ছুটে চলেছে। আমাদের মরা গাঙটা বোধহয় এখন বেঁচে উঠে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গর্জাচ্ছে। এইবার বড়-বড় নৌকো ক'রে চ'লে যাওয়া যাবে সোঁদরবন পর্যন্ত, তারপর সোঁদরবন ছাড়িয়ে একেবারে সাগরে। বীরেনদা মানিকদার গলা না? হ্যাঁ, ঐ তো ওরা ডাকছে: 'এই পলাশ, শীগ্‌গির উঠে আয়। চল বেরিয়ে পড়ি।'—'কোথায়?'—'কোথায় আবার, দেশভ্রমণে। এবার আর ট্রেন নয়, এখান থেকে একেবারে নৌকোয়।'—'কতদূর?'—'অনেক দূর। বাগেরহাটে আর যাব না। ভৈরব দিয়ে পাড়ি দেব দক্ষিণে। সাগর পার হ'য়ে যাব নতুন দেশে।' বিদ্যুতের ঝলকানির মধ্যে বীরেনদা মানিকদা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে, আমি বাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি।

কড় কড় কড়াৎ। বাজ পড়ল। তারপর অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে বীরেনদা মানিকদা মিলিয়ে গিয়েছে। তুলকালাম শব্দও আর নেই। হঠাৎ শান্ত হ'য়ে গেল চারদিক। নরম আলো ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায় আমার ঘরের ঠিক নিচে। বিজলিবাতির লম্বা-লম্বা থাম-গুলো সকালের ঠাণ্ডা জড়িয়ে শিরশির করছে। আর কাঁচগলার স্রোত আমার জানলা ছুঁয়ে সামনে ব'য়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু'একটা টুকরো কথা ঘরের ভেতর এসে ঢুকছে: 'সে মারঁ, সা।'··· 'আঁরি, তা পা রাঁত্যু মঁ ক্রেইয়ঁ···মে সি।' ছেলেরা ইস্কুলে যাচ্ছে। অদ্ভুত কী ঘটেছে? কার পেন্সিল আঁরি ফেরত দেয়নি? না, দিয়েছে তো বলল। ভোর রাত্তির নয়, সকাল বোধহয় আটটা। তবু অন্ধকার ঘোচেনি, প্যারিসের রাস্তা আলো জ্বালিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে প'ড়ে আছে। একটু বাদেই সকালের ক্লাস শুরু হবে। আমি শুয়ে-শুয়ে ভাবছি, বাচ্চারা কখন উঠেছে, ঘরের বাতির আলোয় কখন তারা জামাকাপড় পরেছে, খেয়েছে, বইপত্তর গুছিয়ে নিয়েছে। তারপর বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আবার বাতির আলোয় তাদের চলা। ওরা যখন ফিরবে তখন শহরের আর এক চেহারা। তখন দশদিকে দিনের তেজ। গাছপালা, রাস্তার বাঁক এক মুহূর্তও কোনো কিছুই আর লুকিয়ে রাখবে না। মানুষের পায়ে, গাড়ির চাকায় পথগুলো দাপাবে। বাঃ, ওদের কী মজা! ওরা রাতের আর দিনের দুটো পৃথিবীতে বেড়ায়। রাস্তা, বাড়ি, গাছ, আলোর থাম, আকাশ, শূন্যের ঘের ওরা দুই-দুই রকম পায়। আমাদের মর্নিং স্কুল অমন অন্ধকারে নয়। আটটা বাজতে দেরি আছে, কিন্তু চারদিক আলোয় আলো। অন্ধকার কী ক'রে থাকবে, ভোর হয়েছে সেই কখন? ইস্কুলের পথ-বরাবর দু'পাশের ঘাসে অবিশ্যি শিশির জ'মে আছে। দিনের আভা লেগে তা চিকচিক করছে। কনকচাঁপার গাছটায় থোকা-থোকা সোনার বরণ ফুল ফুটেছে। কী সুবাস! আমি বইপত্তর মাটিতে রেখে উঠে যাই গাছে। অনেক ফুল পেড়ে নেমে আসি। ফুল বইখাতা জড়িয়ে ধ'রে আবার ইস্কুলের দিকে পা

বাড়াই। বীরেনদার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়।—'অনেক চাঁপা পেড়েছিস্ তো? কেন রে?'—'এমনি পাড়লাম। মানিকদা কই?' —'ওর নাকি জ্বর এসেছে। আসলে বোধহয় ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পলাশ, তোকে এক রকম নতুন ফুল দেখাব, কখনো দেখিসনি।'—'কোথায়?'—'আয়-না, ঐদিকে জঙ্গলটার মধ্যে।'— 'ইস্কুলের দেরি হ'য়ে যাবে।'—'না, হবে না, আয়।' বীরেনদা আমার হাত ধরতে বইখাতাগুলো প'ড়ে গেল। শব্দ হল ঝনঝন। আমার কানে শব্দটা বাজছে, যেন দূর থেকে আসছে। শব্দটা বদ্‌লে যাচ্ছে, মিহি হচ্ছে, জলতরঙ্গের মতো ট্বং টাং করছে। আমার শরীর তার সঙ্গে দুলছে। না, কেউ আমাকে আস্তে-আস্তে ঠেলছে। আমার চোখের উপর থেকে কুয়াশা স'রে গিয়ে একটা ঘরের দেয়াল কোণ পায়ের দিকে উঁচু হ'য়ে উঠেছে। আমার কাঁধের পাশে একটা শরীর একটু নুয়ে পড়েছে। ক্রমে কাটাকাটা চোখ-মুখ ফুটছে। ঠোঁট দুটো খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলছে। ওরা যেন আমাকে কিছু বলছে। হ্যাঁ, আমাকেই। শব্দটা বোঝবার মতো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল : 'শুনছো, ওঠো-না। আর কত ঘুমোবে? লোক এসে ব'সে আছে।' অঞ্জলি, অঞ্জলির গলা। আমাদের ঘর। এখন সব স্পষ্ট। আমি পুরো চোখ খুলেছি।'—'কে এসেছে?'—'কেন অজয়। আজ সকালেই তো তার আসার কথা ছিল।' ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। অজয় পুরীতে থাকার খবর নিয়ে আজ আসবে ব'লে গিয়েছিল। আমি ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ি।

অজয় ছেলেটিকে আমার বেশ লাগে। বুদ্ধিমান এবং কথাবার্তায় সহজ। ইদানীং সে কম আসত। আমার ধারণা, অঞ্জলির বাক্যবাণের ভয়ে। অঞ্জলি একদা যে-রাজনৈতিক দলে ছিল, তা যদিও অজয়দের দল নয়, তবু সর্বদলীয় নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। অজয় এলেই অঞ্জলি তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতি এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য আর জেরা শুরু করত যে, অজয় পালাবার পথ পেত না। বাগাড়ম্বরের মুখোশগুলো অঞ্জলি এক-এক হেঁচকায় খসিয়ে দিত।

পিটাররা আসার পর অজয় আবার যাতায়াত করছে। প্রথম দিন পিটারকে সে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে গণ-আন্দোলন এবং তার নেতৃত্বের খবরা-খবর সে বিশদভাবে জানতে চাইছিল। আমার মনে হয়েছিল সে কিছুর সমর্থন খুঁজছে যেন। পিটার তাকে দলগত পরিচয় ধ'রে কিছু বলেনি, মোটামুটি বাস্তব তথ্য কিছু জানিয়েছিল। কিন্তু সে পরোক্ষে যা বলেছিল, অজয়কে তা বোধহয় নিশ্চিন্ত করেনি। দ্বিতীয় দিন অজয় এসেছিল দুটো খবর দেওয়ার জন্যে। প্রথমত, সে চাকরি পেয়েছে, সুতরাং বিজ্ঞানে ডক্টরেটের জন্যে যে-গবেষণা করছিল তা আর করবে না। দ্বিতীয়ত, সে রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছে। দুটো খবরেই আমি খুশী। অজয় এবং অজয়ের রাজনীতি, দু'য়ের জন্যেই আমার দুঃখ হত। তাকে দেখে আমি বেশ গোলমালে প'ড়ে যেতাম। তার অধ্যাপক-সেবা দেখে এবং কথাবার্তা শুনে আমার মনে হত না বিজ্ঞানে তার মৌলিক কোনো অবদান যুক্ত করার জন্যে সে আগ্রহী, মনে হত একটা ভালো চাকরির উপায় হিসেবেই তার বিজ্ঞান-গবেষণা। আবার ভালো চাকরিতে নিজে বহাল হওয়া এবং পতিতোদ্ধারের ব্রত নেওয়া, এ দুই মনোভাবও আমি মেলাতে পারতাম না। প্রথম দিন পিটারকে তার জিজ্ঞাসাবাদ মনে হয় ঐ মেলাবার জন্যেই। এখন সে এই দোটানা থেকে বেরিয়ে এল। আমার মনে হল এখন সে অন্তত একজন সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে পারবে, পদে-পদে তাকে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে হবে না। অজয়ের আচরণ আমার বেশ যুক্তিপূর্ণ ও সৎ মনে হল। তবে এও মনে হল যে, অজয় হয়তো বোকামি করল। লোকের সামনে তার যাকে বলে ভাবমূর্তি সেটা নষ্ট ক'রে ফেলল। তবু আমি মনে-মনে তাকে অভিনন্দন না-জানিয়ে পারিনি।

ক'দিন আগে অজয় যখন এসেছিল, তখন পিটারদের বাইরে যাবার প্রসঙ্গ উঠেছিল। উঠিয়েছিল অজয়ই। কলকাতা তাদের স্নায়ুর উপর কেমন ধাক্কা দিচ্ছে, এখানেই তারা মাটি কামড়ে প'ড়ে

থাকতে চায় কিনা, অজয়ের এই সব প্রশ্নের উত্তরে পিটার একটু বিষণ্ণ হেসে জানিয়েছিল, তার ইচ্ছে ক'দিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসে। সে এবং মারিয়া।—পুরী যেতে তাদের আপত্তি আছে? না-থাকলে অজয় ব্যবস্থা করতে পারে, তার এক দাদা সেখানে থাকে। পুরী নামটা পিটার প্রায় লুফে নিয়েছিল, আমার দিকে ঘুরে বলেছিল: 'পুরী থেকেই তো কোনারকে যায়, না পলাশ?' —'হ্যাঁ।'—'আমরা কোনারকে যেতে চাই। পলাশ, প্যারিসের সেই সন্ধেটা তোমার মনে আছে? জনের ঘরে আমাদের আড্ডা জমেছিল, তুমি কোনারকের কথা তুলেছিলে?'—'খুব মনে আছে।' পিটার মৃদু-মৃদু হাসছে। আমি কোনো মন্তব্য করার আগেই তার সহাস মন্তব্য: 'অবিশ্যি শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি যাব শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে।'—'কিন্তু নাম তো পড়তে পারবে না।'—'তা জানি। সব নামই তো হারিয়ে গিয়েছে। কোনারক থেকে, এলোরা-অজন্তা থেকে, ত্রিচিন-পল্লী থেকে, বোরোবুদুর আঙ্কোরভাট থেকে, এমনকি সৌখিন তাজমহল থেকেও। তবু হাতের লেখাটা দেখে ধন্য হওয়া যাবে।'

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি অজয়ের সঙ্গে পিটার ও মারিয়া ব'সে এবং সাজ-সরঞ্জাম সমেত অঞ্জলির চা রেডি। আমাকে দেখে অজয় বলল, 'খুব ঘুমুচ্ছিলেন।' একটু রসিকতাও জুড়ে দিল: 'বোধ হয় কাঁচা ঘুম ভেঙে দিলাম।' আমি অপ্রস্তুত ভাব কাটাবার জন্যে জবাব দিলাম: 'না. স্বপ্নভঙ্গ বলতে পারো। কাঁচা ঘুম নয়. বাড়তি ঘুম যার মধ্যে স্বপ্ন দেখা চলে।'

পিটার বলল, 'পলাশ, অজয়ের সঙ্গে কথা পাকা করলাম। আমরা পুরী যাচ্ছি। ও যে-বাড়ির খবর এনেছে, সেখানেই থাকা যাবে।'

'আশা করি, কলকাতার মায়া একেবারে কাটাচ্ছো না। আবার ফিরে আসবে।'—আমি বললাম।

'ফিরব বৈকি', জবাব দিল মারিয়া, 'কলকাতাকে কি অত সহজে ছাড়তে পারা যায় ?'

কেন মারিয়া এ-কথা বলল ? আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখ শান্ত।

হঠাৎ পিটার-মারিয়ার কলকাতা থকে দূরে যাবার আগ্রহটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এই শহরের আবহাওয়া—প্রাসাদ আর রাস্তার বাসিন্দা, কুকুরের কুঁইকুঁই আর বাঘের ঘাড়-ভাঙা, ফূর্তি আর মড়াকান্না, ঘরে-বাইরে পশু মানুষ পশু—তাদের বুঝি বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে ? কিন্তু এ তো সব শহরে এবং যথাযথ মাত্রায় সব গ্রামে। কোথাও গিয়ে তো তাদের নিস্তার নেই। নাকি এই শহরের ভিতরের আরো ছোট শহরে, এই চার দেয়ালের সংসারে তাদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ? অঞ্জলি আলগা হ'য়ে আছে। তাকে আমাকে নিয়ে এক সঙ্গে সহানুভূতি এবং বিনিময়ের কোনো পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠছে না। আমার উষ্ণতা অঞ্জলি ঠাণ্ডা পাথর দিয়ে ঘিরে রেখেছে। অথচ অন্যদের, বিশেষত অতিথিদের বাস্তব সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে তার দৃষ্টি সদাজাগ্রত। তার ব্যবহারে নিশ্ছিদ্র সৌজন্য। সে তার সৌজন্য ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে পারে মাত্র একটি ক্ষেত্রে : যদি সে ক্রুদ্ধ হয় এবং সে-ক্রোধের কারণ যদি হই আমি। তবে তা বিরল ঘটনা। সৌভাগ্যক্রমে এ-ক'দিনে তা ঘটেনি। কিন্তু অঞ্জলির ভদ্রতা ও বিবেচনাই যেন চারপাশের হৃদয়ের উত্তাপ ঠেকাবার এক বর্ম হয়েছে। পিটার ও মারিয়ার থাকার ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা যাতে ত্রুটিহীন হয়, সেজন্যে সে সারাক্ষণ ব্যস্ত। বিশেষ ক'রে আহার্য নিয়ে তার কর্মঠতা এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। কত রকম পদ সে তৈরি করছে, কত রকম দেশী-বিদেশী রান্নার ভোজবাজি দেখাচ্ছে ! ধরতে গেলে তার জীবন কাটছে রান্নাঘরে। তার রান্নাঘর-বাস শুধু এখনকার ঘটনা নয়। আমি বেশ কিছুকাল ধ'রে লক্ষ করছি, রান্না অঞ্জলির এক প্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যেন সে তার হৃদয়ের অন্য সব আবেগকে, মস্তিষ্কের

অন্য সব তৎপরতাকে হটিয়ে তাদের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে এই এক প্রবল উদ্যম। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে যেন রান্নাঘরকে দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে।

পিটার এবং সেই সঙ্গে মারিয়া প্রথম-প্রথম তার এ-কাজে আপত্তি করেছে। পিটার বলেছে: 'আমাদের জন্যে রান্নায় এত সময় তুমি কেন দেবে? এত পরিশ্রম কেন করবে? শুধু আমাদের জন্যেই নয়, কারো জন্যে?' অঞ্জলি উত্তর দিয়েছে: 'এটা ঠিক বিশেষ কারো জন্যে ভেবে-ভেবে করা নয়। এটা আমার নিজের প্রতি কর্তব্যপালন।' আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি জানি এর আগেই সে যে-উত্তর দিয়েছে এখনো তাই দেবে, বোধহয় আরো ঝাঁঝ মিশিয়ে: 'তোমার কাজ তোমার ধান্দা নিয়ে তুমি থাকো। আমার প্রতি আর বিবেচনা দেখাতে হবে না। দেখালে তোমার সুনাম হতে পারে, কিন্তু আমার কোনো সত্যিকার সাহায্য হবে না।' মারিয়া একদিন তাকে বলেছে: 'অঞ্জলি, আমি তোমার সঙ্গে কিছু-না-কিছু করতে পারি। আমাকে ব'লে দাও কী করতে হবে। দু'জনে করলে সবই অল্প সময়ে হ'য়ে যাবে।' কিন্তু অঞ্জলি রাজী হয়নি। হেসে বলেছে: 'না, তাতে কোনো সুবিধে হবে না। আমার সংসারের এ-কাজ দু'জনে করা চলে না, আমি নিজে করলে তাকে আয়ত্তে আনতে পারি। তাছাড়া, তুমি এসেছো বেড়াতে, লোক-জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, তুমি কেন এভাবে আট্‌কে থাকবে?'

অঞ্জলি একা তার দুর্গে থাকতে চায়, সেখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। একাই তার আত্মরক্ষার পণ। কিন্তু এ আত্মরক্ষা, না, আত্মহত্যা? ঝুমুর থেকে, ইজাবেলের থেকে পৃথক বটে, তবু আত্মহত্যা।

পিটারকে জিগ্যেস করলাম কবে তারা পুরী যাবে। ও বলল, এক সপ্তাহ পরে, তখন থেকে বাড়িটা পাওয়া যাবে। যাক, ওরা কলকাতা ছেড়ে পুরী যাক, সমুদ্রের হাওয়ায় ফুসফুস ভরিয়ে নিয়ে আসুক। ওদের স্নায়ু আহত, একটু জুড়িয়ে নিয়ে আসুক।

১০

কতকাল পরে ইরেনের চিঠি পেলাম। খামের উপর হাতের লেখাটা দেখেই আমার মন কেমন হু-হু ক'রে উঠল। হঠাৎ চারপাশের লোকজন বাড়িঘর অবাস্তব হ'য়ে গেল আর নেমে এল আসন্ন শীতের সন্ধে, যেখানে দিনের শেষ আলো মেখে প্লাতান আর মারোনিয়ে গাছগুলো উদাস দাঁড়িয়ে, যেন এর মধ্যেই তাদের শরীরের রসে শূন্যতার ছোঁয়াচ লেগেছে। আমার ইচ্ছে হল আমি দৌড়ে চ'লে যাই রু-দ্য-ভাঁভে ইরেনদের বাড়ি। ওরা দুই বোন এই সময়টা হয়তো আমার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে। হয়তো একটু পরেই শার্ল আসবে। যাই, গিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প ক'রে আসি, মাদ্‌লেনের মুখের হাসিটা দেখে আসি। ইরেনের অস্থিরতা দেখলে আমি এবার সোজাসুজি উপদেশ দেব : 'তুমি তোমাকে নিয়ে এত আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকো কেন? নিজেকে একটু ভোলো। জীবনের পথে চলতে গেলে নিজেকে জানা যেমন দরকার, নিজেকে ভোলাও তেমনি দরকার।' ইরেন তা পারে না, অথচ মাদ্‌লেন পারে কত সহজে। তার অস্থিরতায় কি আমাকেই কম অস্থির করেছে ইরেন? কেবল মনে নয়, শরীরেও। এখানে-ওখানে আমাকে বিস্তর ছুট করিয়েছে। প্যারিসের কাছে কোথায় রয়েছে হিন্দু সন্ন্যাসীদের আশ্রম, চলো সেখানে। সরবনের প্রেক্ষাঘরে কৃষ্ণমূর্তি বক্তৃতা দেবেন, চলো শুনে আসি। তার সঙ্গে এ-সব জায়গায় আমি গিয়েছি। তার জন্যেই। কিন্তু তার অস্থিরতা ঘোচেনি। তার মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। ধাপ্পাবাজদের পাল্লাতেও সে কম পড়েনি। জেনে-শুনেই পড়েছে, যেন ছাই উড়িয়ে সে দেখতে চেয়েছে হারানো রতন পাওয়া যায় কিনা। জ্যোতিষী চট্টোরাজের কাছে যেতে আমি অনেক বারণ করেছিলাম, শোনেনি। গিয়েছিল এবং আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। লোকমুখে আমাদের

দু'জনেরই শোনা ছিল যে, চট্টোরাজ যদিও অনেক কাল প্যারিসের বাসিন্দা, তবু ফরাসী ভাষার উপর তার দখল সুবিধের নয়। ফলে দুর্জ্ঞেয় জীবন রহস্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মূল্যবান কথা যদি সব ঠিক বোঝা না-যায়, এই ভয় ছিল। আমি সঙ্গে থাকলে এই ঝুঁকিটা এড়ানো যায়। আমি দরকার মতো বাংলার তর্জমা ও ভাষ্য করতে পারব। ইরেনের শান্তির জন্যে আমি গিয়েছিলাম।

তা ফরাসী ভাষার কৃপায় আমাকে এক-এক সময় বেশ মুশকিলেই পড়তে হত। আমাদের দেশে তখন লাল ত্রিকোণের অভিযান শুরু হয়নি, 'নিরোধ' এমন ডালভাতের মতো স্বাভাবিক হয়নি। রবার-দ্রব্যটি সম্বন্ধে সব অবস্থাতেই কিছু সঙ্কোচ ছিল। বিশেষত ছিল সেই ক্ষেত্রে যেখানে সন্তান-নিরোধের চেয়ে রোগ-নিরোধের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশী। সঙ্কোচ না-থাকাই তো ভালো জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে, বৈজ্ঞানিক দিক থেকে। কী বলেন? কিন্তু হরেনবাবুর সঙ্কোচ ছিল। হরেনবাবু নামকরা আইনবিদ্, প্রচুর আয়, বাড়িগাড়ি এবং ভরভরন্ত সংসার কলকাতায়। তার উপর হালে মেয়ের ভালো বিয়ে দিয়ে মনটা খুব হাল্‌কা। ইয়োরোপে এসেছেন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আইনগত তথ্য-সংগ্রহের কাজে। খরচা নিশ্চয় তাঁর নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না। তথ্য-সংগ্রহও চব্বিশ ঘণ্টার কাজ নয়। এমনকি ইয়োরোপে না-এলেও তা করা যেত (হরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন), কিন্তু এসেই যখন গিয়েছেন, তখন অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে হাতে। তার কিছু আমোদে খরচ করতে বাধা কী, বিশেষত মন যখন পাখির মতো উড়ছে? হরেনবাবু প্রমোদতীর্থ প্যারিসে এলেন। আমার সঙ্গে তাঁর ঘটনাচক্রে আলাপ হ'য়ে গেল। তারপর যে-ক'দিন ছিলেন, আমাকে বলতেন: 'চলুন-না, প্যারিসের রাতের কাণ্ডকারখানা একটু দেখি।' আমি ওজর দিলে বলতেন, 'একা বেরোতে ভালো লাগে না। তাছাড়া, পাড়া-বেপাড়া চিনি না, ভাষা জানি না, আপনি সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত।' কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমি বেরোইনি। বিদায়

নেবার আগের দিন সকালে আমার হোটেলে এসে হরেনবাবু চেষ্টা ক'রে লজ্জা ত্যাগ করলেন, জিগ্যেস করলেন, ঐ দ্রব্যটির ফরাসী নাম কী। আমি ব'লে দিলাম। তখন অনুরোধ, আমি যদি দয়া ক'রে তাঁকে দোকানে নিয়ে গিয়ে কিনে দিই। আমি জানালাম, আমার দয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না, যে-কোনো ডাক্তারী দোকানে গিয়ে তিনি ঐ নামটা বললেই দেবে। পরে তাঁর কাছে শুনলাম কোনো অসুবিধে হয়নি।

মেজর সিন্‌হার প্রস্তাবটা আরো সরাসরি ছিল। ভদ্রলোক ডাক্তার, বয়স বেশী নয়, কথাবার্তা বেশ মাইডিয়ারী। ছুটি নিয়ে তিনি কন্টিনেণ্ট ভ্রমণে এসেছেন। প্যারিসে এসে উঠলেন আমাদেরই হোটেলে। প্রথম দিন আলাপ হতেই আমাকে বললেন, 'রাত্তিরে ফূর্তির জায়গাগুলো একটু দেখাবেন?' আমি জবাবে জানালাম যে, আমার কাজ আছে, ফূর্তির জায়গা দেখাবার লোক রাস্তাতেই থাকে, তারা তাঁকে ঠিক চিনে নেবে। তাতে তিনি বললেন, 'না, সে সুবিধে হয় না, এখানকার মেয়েগুলো ইংরিজী একেবারে বলে না। বাঙালীর মনের কথা বাঙালী না বুঝিয়ে দিলে কি আনন্দ হয়?' অর্থাৎ বাঙালীকে বাঙালী না রাখিলে কে রাখিবে? তবু আমি নাচার। ভদ্রলোক হতাশ হ'য়ে চ'লে গেলেন ইতালীতে। কয়েকদিন বাদে আবার এলেন প্যারিসে, এবারও উঠলেন আমাদের হোটেলে। ইতালীতে কেমন কাটল জিগ্যেস করায় বললেন, ওরা ইংরেজী কিছু-কিছু বলে, সেদিক থেকে মন্দ নয়, কিন্তু ফরাসী মেয়েদের টান তিনি কিছুতেই কাটাতে পারছেন না। আমার, কাছে আবার সেই দোভাষীগিরির প্রস্তাব এবং আবারও আমার, না। তখন সিংহমশাই যা করলেন, তাতে আমি ঘায়েল হয়েছিলাম আর-কি! তিনি চেয়ার থেকে ঝপ্‌ ক'রে নেমে নিচু হ'য়ে করজোড়ে বললেন, 'দোহাই আপনার, একটু ধত্তাই দিয়ে দিন।' কঠিনহৃদয় ব'লে আমি শেষ পর্যন্ত টলিনি। এখন আমার মনে হয়, তাঁকে আমার সাহায্য না-করা জীবে দয়া না-করার মতোই

নিষ্ঠুরতা হয়েছিল, এবং উপরন্তু আমার আচরণকে এক ধরনের ন্যাকামিও বলা যায়।

ভাষার জন্যে বিপদ আমার আরো হয়েছিল। সেবার ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছুটি কাটাচ্ছি। যে-ছোট শহরে আমার আস্তানা, তাকে কেন্দ্র ক'রে এধারে-ওধারে বেড়াই। একদিন সকালে গিয়েছি নীস্-এ, সন্ধের দিকে ট্রেনে ফিরছি। যে-স্টেশনে নামলাম সেখান থেকে আমার বাসস্থান দশ-বারো মাইল দূর, এই পথটা বাসে যেতে হয়। স্টেশনে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি সেখানে এক শাড়ি-পরা তরুণী কৃষ্ণাঙ্গিনীকে ঘিরে একটা জটলা হচ্ছে। ব্যাপার কী? তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পৌঁছলাম। ব্যাপার আর কিছুই নয়, তরুণী ইংরিজীতে যা বলছেন, চারপাশের লোকেরা তা বুঝছে না এবং তারা যা বলছে তিনি তা বুঝছেন না। এ-অবস্থায় সাহায্য সকলেই করে, আর এ-ক্ষেত্রে উনি যখন ভারতীয়, বিশেষভাবে বিদেশ-বিভূঁইতে ভাষা না-জানা এক ভারতীয়া, তখন আমি তো করবই। আমি তাঁকে ইংরিজীতে জিগ্যেস ক'রে জানতে পারলাম তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন এবং এই জায়গার হোটেলে একদিন থাকবেন ব'লে ঘর রিজার্ভ করেছেন, হোটেলটা কতদূর, কোন্ পথে যেতে হবে তিনি জানতে চাইছেন এবং পরদিন বিকেলে রওনা হওয়া সম্পর্কে খবরাখবর। আমি উপস্থিত লোকদের কাছ থেকে তাঁর জ্ঞাতব্য জেনে নিয়ে তাঁকে বললাম এবং জিগ্যেস করলাম, ভারতবর্ষের কোথায় তাঁর নিবাস। তিনি জানালেন, কলকাতায়, তবে আসছেন লণ্ডন থেকে। (লণ্ডনেই থাকেন কিনা তা আর জিগ্যেস করিনি বাহুল্যবোধে। পরে মনে হয়েছে জিগ্যেস করা উচিত ছিল। তাহলে হয়তো আমার কম অবাক হওয়ার সুযোগ থাকত)। —'তাহলে আপনি বাঙালী?'—'হ্যাঁ।' ওঃ, আমার কী আনন্দ! পৃথিবীর এই দূর কোণে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বাঙালীর সঙ্গে দেখা! অতঃপর আমি বাংলায় কথা শুরু করলাম। বললাম, 'চলুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিই।' মনে হল

তিনি যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলেন। তাঁকে হোটেলে পৌঁছতে গিয়েই আমার বিপদ ঘটল। আমি স্টেশনের কাছে বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরে এসে শুনলাম শেষ বাস কয়েক মিনিট হল ছেড়ে গিয়েছে, রাত্তিরে আর বাস নেই। আমায় ফিরে যেতে হল সেই হোটেলে, সেখানে গিয়ে শুনলাম আর জায়গা খালি নেই, লাউঞ্জের সোফায় সারারাত আমার ব'সে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বাঙালিনীর সঙ্গে দেখা হল লাউঞ্জে, আমার কী অবস্থা হয়েছে তাঁকে বললাম। তিনি তাঁর ঘরেই আমাকে শুতে বলবেন, এমন প্রত্যাশা অবশ্যই আমার ছিল না (এখন ভাবি, এ-ও আমার এক ন্যাকামি। এমন প্রত্যাশা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। এ-রকম কত প্রত্যাশা এবং পরিপূরণ মহাভারতেই তো লেখা রয়েছে। অবিশ্যি আমাকে তাঁর অপছন্দ হ'য়ে থাকলে সে আলাদা কথা। কিন্তু চেহারা দেখে যাকে কোল দিতে ইচ্ছে করে না, তার ঠ্যাং ভাঙলে কি 'আহা' বলি না ?), দেশের লোকের কাছে দুঃখের কথা বলার ইচ্ছে হয় ব'লেই বলেছিলাম। সমবেদনা পাবার একটা সঙ্গোপন বাসনা আমার নিশ্চয়ই ছিল, বিশেষত আমার দুর্দশার কারণ যখন তিনি। যতদূর স্মরণ হয়, এটিকেট-মাফিক একটা দুঃখ-প্রকাশক বাক্যাংশ তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু দেখলাম তাঁর শোনাটা অন্যমনস্ক। এবং আমার কথা একটু শুনেই তিনি হোটেলওয়ালার শরণ নেওয়ার উপদেশ দিয়ে জানালেন তিনি বড় ক্লান্ত। তিনি চ'লে গেলেন তাঁর ঘরে। সারাদিন ঘোরাঘুরি ক'রে আমিও খুব ক্লান্ত ছিলাম, লাউঞ্জে সোফার উপর আমি ব'সে পড়লাম। অনেক পয়সা দিয়ে আহার্য নিলাম, কিন্তু তেমন কিছু খেতে পারলাম না ক্লান্তিতে। শেষরাতের দিকে আর ব'সে থাকতে পারছিলাম না। এমন সময় হোটেল-পরিচারক এসে খবর দিল একটা ঘর খালি হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার ভাড়া দিয়ে ঘণ্টা পাঁচেকের জন্যে সেই ঘর আমি নিলাম, এমনই দশা আমার তখন। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, বাস ধরতে হবে। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে খাবার ঘরে

এসে দেখি বঙ্গবালা প্রাতরাশের টেবিলে খেতে বসেছেন। আমাকে দেখে একটু হাসলেন। আমি অন্য টেবিলে গিয়ে বসলাম এবং প্রাতরাশের অর্ডার দিলাম। বেশ খরচা হল। তারপর ওঁর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় 'চলি' ব'লে বেরিয়ে পড়লাম। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, মাসখানেক বাদে প্যারিসে ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে গেল, মানে আমি ওঁকে দেখলাম এবং উনিও আমাকে দেখলেন। ভোজনশালার সামনে কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন, আমিও একটা দলের সঙ্গে সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড তা নয়, সেটা হল এই যে উনি আমাকে চেনবার কোনো ভাব দেখালেন না। অথচ একসঙ্গে একঘরে শুতে যাবার প্রশ্ন এখন ছিল না, আর অতগুলো লোকের মাঝখানে ওঁর শ্লীলতাহানি করা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। আমি মনে মনে বলেছিলাম: তুমি বোকামি করছো। আমি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙিয়ে এখানে এসে প্রেম করব কি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে? তাছাড়া তোমার চেহারার বিষয়েও তো একটু ভাববে। সেটা দেখে কোনো বঙ্গসন্তানের লোভ হবার কথা নয়।

কিন্তু অপর্ণাদেবীর ব্যবহার একেবারে অন্যরকম। তিনি একলা প্যারিসে এসেছিলেন। প্যারিসে পৌঁছেই তিনি খোঁজ করলেন কোথায় বাঙালী কে আছে। প্রথম দিনই আমার সঙ্গে দেখা হল। বিশদ আলাপ। কোন্ কোন্ দেশ ঘুরেছেন, কী করেছেন সেই বৃত্তান্ত শোনালেন, আমার খবরাখবর নিলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, একসঙ্গে আপনাদের রেস্তোরাঁয় খাই।' দু'জনে গেলাম ছাত্র-রেস্তোরাঁয়। কিউতে দাঁড়ালাম, থালা আর খাবারের বাটি এক-এক ক'রে নিতে হবে। কিউতে দাঁড়িয়ে অপর্ণাদেবী মাথায় একটু ঘোমটা তুলে দিলেন (তিনি বিবাহিতা), তাঁর কপালে একটা লাল টিপ জ্বলজ্বল করছিল। তাঁর মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব রমণীয়। আমরা কথা বলতে-বলতে ক্রমে এগোচ্ছি। হঠাৎ এক সময় চারদিক থেকে একটা প্রবল গুঞ্জন উঠল। শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে

খেতে বসেছে, গুঞ্জন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এতটা জোর হওয়ার কথা নয়। অনুমান করলাম অপর্ণাদেবীর আকর্ষণেই তা হয়েছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা শব্দ কানে এল : "শাপো"। ধ্বনিটা দ্রুত তুঙ্গে উঠতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ'দুই গলা একসঙ্গে তালে তালে দীর্ঘায়ত ক'রে বিভক্ত উচ্চারণে বলতে লাগল : "শা—পো"। অপর্ণাদেবী বিস্মিত হ'য়ে আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'এ আবার কী কাণ্ড?' আমি বললাম, 'ফরাসী ছাত্রমহলে প্রথা হল খাবার ঘরে টুপি খোলা। টুপিকে ফরাসীতে বলে, "শাপো"। ভোজনশালায় টুপি প'রে কেউ ঢুকলেই ওরা চেঁচায় "শাপো" "শাপো"। মানে, টুপি খোলো।' উনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই, এখানে কারো মাথায় তো টুপি দেখছি না।' আমি বললাম, 'আমিও দেখছি না। অতএব লক্ষ্যটা মনে হচ্ছে আপনি। আপনার মাথায় ঘোমটা রয়েছে, ওটাই ওরা নামাতে বলছে মনে হয়।' উনি বললেন, 'কেন তা নামাব? ঘোমটা আমি নামাব না।' আমি তাঁকে সমর্থন করলাম, 'নিশ্চয় না।' কিন্তু কোলাহল আরো বাড়তে লাগল, শুরু হ'য়ে গেল সকলের একসঙ্গে থালার উপর ছুরিকাঁটা পেটানো আর "শাপো" চিৎকার। সে এক তাণ্ডব। অতঃপর ফরাসী দ্বাররক্ষী আমাদের কাছে ছুটে এল, এসে বিনীতভাবেই অনুরোধ করল, মাদাম যদি দয়া ক'রে মাথা থেকে কাপড়টা নামিয়ে নেন। কেন জিগ্যেস করায় সে ফরাসী ছাত্র-প্রথার দোহাই পাড়ল। আমি জবাব দিলাম, 'প্রথা তোমাদের যেমন আছে, আমাদেরও তেমনি আছে। আমাদের প্রথা হল বিবাহিতা মেয়েরা মাথায় আবরণ দেয়। এই মহিলা বিবাহিতা। আমরা তোমাদের প্রথার জন্যে আমাদের প্রথা বিসর্জন দেব কেন?' আমাদের কথাবার্তা অপর্ণাদেবী ঠিক অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বললেন তাঁর এই বক্তব্য তর্জমা ক'রে জানিয়ে দিতে, 'আমি আমার মাথার কাপড় এক সুতোও সরাব না। যেমন আছে তেমনি থাকবে।' তখন দ্বাররক্ষী ফরাসী কায়দায় কাঁধ নাড়িয়ে করুণভাবে বলল,

"আপনাদের কথা আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনারা যদি এইভাবে এখানে খাবার সঙ্কল্প করেন, তাহলে দারুণ হাঙ্গামা বেধে যাবে, ভাঙচুর আরম্ভ হবে। সে-অবস্থা আমি সামলাব কী ক'রে ?' তার এ-কথার পর আমরা ঠিক করলাম, আমরা ওখানে খাব না। তাকে জানালাম, হাঙ্গামা বাধুক এ আমরা চাই না, তবে তাদের অন্যায় দাবী আমরা মেনে নেব না এবং তার প্রতিবাদে আমরা তাদের রেস্তোরাঁ বর্জন করছি। সে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা বাইরে বেরিয়ে অন্য রেস্তোরাঁয় খেতে বসলাম।

কিন্তু আমার মনে হয় না ভাষার অসুবিধের জন্যে ইরেন আমার সাহায্যের দরকার বোধ করছিল। তার বুদ্ধি প্রখর, সামান্য আভাষ থেকে পুরো বক্তব্য সে বুঝে ফেলে, এ আমি অনেকবার দেখেছি। আসলে সে আমার বুদ্ধিকে তার বুদ্ধির সঙ্গী করতে চাইছিল, যাতে সে পরে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রে তার অভিমত যাচাই ক'রে নিতে পারে এবং একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে। তবে জ্যোতিষী চট্টোরাজের কাছে তার যাওয়ার কোনো যুক্তি ছিল না, তার অস্থিরতাই তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল।

চট্টোরাজের পসার বেশ ভালোই। নইলে খেয়ে প'রে এতদিন আছে কী ক'রে প্যারিসে ? সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ ক্ষতি-বৃদ্ধির নাগরদোলায়-চড়া মানুষ যে তার অদৃষ্ট জানতে চাইবে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু নেই। সুতরাং ফরাসীরা, বিশেষভাবে ফরাসিনীরা চট্টোরাজের কাছে হাত দেখাতে আসে। চট্টোরাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অন্যের মুখে শুনেছিলাম সে অনেক বছর আগে দেশ ছেড়ে ওখানে যায়। যখন গিয়েছিল তখন অবিশ্যি সে জ্যোতিষী ছিল না, ছিল তবল্‌চি। কোন্ এক বাইজীর দলে তবলা বাজাত। সেই বাইজীর সঙ্গেই সে ইয়োরোপে গিয়েছিল। ফ্রান্স দেশটা তার ভালো লেগে যাওয়ায় সে আর ফেরেনি, প্যারিসেই থেকে যায়। কিন্তু খেতে তো হবে। সে ঠিক বুঝে ফেলল যে, ব্যবসা করা ছাড়া তার

জীবিকার আর কোনো উপায় নেই এবং তার একমাত্র মূলধন তার ভারতীয়ত্ব। বামুনের ছেলে, গলায় একটা পৈতে আছে এবং গায়ত্রী মন্ত্রের সংস্কৃত তার জানা। হয়তো শখ ক'রে আগে কখনো-সখনো কারো হাত টেনে নিয়ে দেখেওছে। সুতরাং সে জ্যোতিষী হ'য়ে গেল। লোকটি যে ভূয়োদর্শী তাতে সন্দেহ কী? ইরেনকে দেখে তার মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে তার দেরি হয়নি। হাত-দেখাটা চট্টোরাজ তার নিজস্ব হিন্দুপদ্ধতি অনুযায়ী করল। প্রথমে পৈতেটা বের ক'রে চোখ বুজে বিড়বিড় করল সংস্কৃত (আমি গায়ত্রী শুনলাম), তারপর 'মাদাম' ব'লে হাত বাড়িয়ে ইরেনের করতল মেলে ধরল নিজের হাতের উপর। বেশ খানিকক্ষণ দেখে যেমন বলবার ব'লে যেতে লাগল (আমি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যায় সাহায্য করলাম): মাদামের খুব মানসিক অশান্তি যাচ্ছে, নিকট-জনের কাছ থেকে দুঃখ পেয়েছেন, তবে অন্য লোকের দিকে ঘুরে সান্ত্বনা-ভালোবাসাও পেয়েছেন; আরো কিছুদিন এইরকম মনঃপীড়া যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি পাবেন, একটা প্রবাল ধারণ করলে দুঃসময় অতিক্রম করার সুবিধে হবে···ইত্যাদি। ওখান থেকে বেরিয়ে এসেই ইরেনের মুখে একটা তিতো হাসি ফুটে উঠল, বলল, 'অতি বাজে লোক। তোমাকে টেনে আনার কোনো দরকার ছিল না, পলাশ। ওর একটা কথা শুনলেই আমি সব কথা বুঝতাম। অনর্থক তোমাকে ভোগালাম।' ইরেনের বুদ্ধি আছে ব'লেই বাঁচোয়া, নইলে কোন্ জোচ্চোরের খপ্পরে কবেই প'ড়ে যেত। না, তাই কি? বুদ্ধি তার বাঁচন, না, মরণ? যে-যন্ত্রণা সে পায়, তা তো তার বুদ্ধির জন্যেই পায়, তার বুদ্ধি জেগে থাকে ব'লেই পায়। যুক্তি তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইরেন যদি তার বুদ্ধিকে অসাড় ক'রে ফেলত, যদি চোখ বুজে বিশ্বাসের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিত, তাহলে সে নিশ্চয় স্বস্তি পেত।

ইরেনের চিঠিটা আমি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অঞ্জলির পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠলাম। চিঠির দিকে নজর পড়ল, খেয়াল

হল খোলা হয়নি। অঞ্জলিকে বললাম, ইরেনের চিঠি। অঞ্জলি 'ও' ব'লে চ'লে গেল।

ইরেন লিখেছে, সে ভারতবর্ষে আসছে তীর্থদর্শনে। প্রথমেই সে প্রয়াগের সঙ্গমে স্নান করবে। আমি যদি তাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করি, তবে সে উপকৃত হয়। যাক, ইরেন তাহলে যুক্তিতর্কের ঘূর্ণি থেকে নিজেকে উদ্ধার ক'রে নিয়েছে, বিশ্বাসকে তার পরম আশ্রয় করতে পেরেছে। এইবার সে শান্তির আস্বাদ পাবে। কিন্তু আমি তাকে কী সাহায্য করব? আমার বুদ্ধি এখনো বেয়াড়া, তাকে বাগ-মানানো যায় না। যারা বিশ্বাসী, তারা বলে আমাদের যুক্তিবুদ্ধি একটা কুড়ুল, আমরা যে-ডালে ব'সে থাকি তাকেই সে কাটে। একদিক থেকে কথাটা ঠিকই। এক-এক সময় আমার মনে হয়, আমি সব কিছু কাটাকুটি ক'রে যেন শূন্যে ঝুলে আছি। কিন্তু কী করব? যা আমি বুঝতে পারি না তা মানতে পারি না। তা যদি পারতাম তাহলে আমি সব ম্যাজিককে অলৌকিক মনে করতাম, এখন যেমন অলৌকিককে ম্যাজিক মনে করি। এ-অবস্থাটা যে প্রীতিকর নয়, এমনকি রীতিমতো যন্ত্রণাকর, তা আমি স্বীকার করি। তবু আমি নাচার। আমার দ্বারা তোমার কোনো সাহায্য হবে না, ইরেন। তুমি এখানে আসো, শান্তি পাও, এ আমি চাই। কিন্তু তোমার অন্ধ পরিক্রমায় আমাকে সঙ্গী হতে বোলো না। তা আমার সাধ্যের বাইরে। তুমি অন্য কাউকে ধরো।

১১

লোকটা বারেবারে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। কেউ ও-রকম ক'রে তাকালে আমার খুব অস্বস্তি হয়। মনে হয় আমি এক গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চলেছি, আমার ঘায়েল হওয়ার কোনো মোক্ষম জায়গা খুঁজে বের করবার চেষ্টা হচ্ছে। একটা স্থায়ী ষড়যন্ত্র অবিশ্যি রয়েইছে। সেটা টের পাই বাজার করতে গেলে,

বাড়ি ভাড়া করতে গেলে, ট্রামবাসট্যাক্সি চড়তে গেলে, টের পাই বউয়ের মুখে হাসি ফোটাতে গেলে। ছেলেপেলে থাকলে তাদের কান্নার চোখ দেখেও টের পেতাম। কিন্তু সে-ষড়যন্ত্র আমার একার বিরুদ্ধে নয়, আমার চারপাশে লাখের মধ্যে নিরানব্বই হাজারের বিরুদ্ধে। সেটা আমার খারাপ লাগে না। মনে হয়, বেশ একসঙ্গে আছি। খারাপ লাগে যখন দেখি একা আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা ক'রে চতুরভাবে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে। যেমন ঐ লোকটা করছিল। তার হাতে একটা থলি, তা থেকে খান হু'য়েক সস্তা দামের শাড়ি উঁকি দিচ্ছিল, ওখানেই ফুটপাতের স্টল থেকে কিনেছে বোধহয়। লোকটা আমার চেয়ে বয়সে বড় বোঝা যাচ্ছিল, তবে অনেক বড় নয়। কিন্তু তার শরীরের ভঙ্গি আমার চেয়ে অনেক বুড়ো। কুঁজো না-হ'য়ে গেলেও পিঠটা শিরদাঁড়ার উপর শক্ত ক'রে বসানো নয়, একটু নুয়ে পড়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে যে সে দেখছিল তাতেও ক্লান্তির ভাব। আমি ভাবছিলাম, এই সব লোকরাই বেশী বিপজ্জনক, সাধারণ নিরীহ চেহারার নিচে কুটিল অভিসন্ধি লু কয়ে রাখে।

ও আস্তে-আস্তে এগোলো। আমার দিকে। আমি বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ক্রমে আমার কাছে আসতে লাগল। আমার অস্বস্তি বাড়ছিল, আমি শামুকের শুঁড়ের মতো আমার স্নায়ুগুলোকে মেলে রাখলাম, অদৃশ্য স্পর্শ পেলেই গুটিয়ে যাব! ও বেশ কাছে এসে গেল এবং আমার দিকে এবার চোবাগোপ্তা নয়, সোজাসুজিই তাকাল। আমি এতক্ষণ চোখের কোণ দিয়ে তার ভাবভঙ্গি গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছিলাম, এখন আমিও সোজাসুজি তাকালাম। না, শামুক হওয়া কাজের কথা নয়, বিছের মতো হুল উঁচোনো দরকার। প্রত্যক্ষ সংঘাত যখন এসেই পড়েছে আর পাশ কাটানো নয়, সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার চোখের পর্দা স'রে গেল। চেনা মুখ, খুবই চেনা মুখ। আমার ঠোঁট দুটো একটা নাম উচ্চারণ করার

জন্যে খুলে যাওয়ার আগেই সে ব'লে উঠল : 'পলাশ না?' প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঠোঁট থেকেও শব্দ ছাড়া পেল : 'মানিকদা!' সুজনের দেখা পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, কিন্তু এ যেন আরো আশ্চর্য ঘটনা। প্রায় অলৌকিক। সুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ যতই অপ্রত্যাশিত হোক, আমি তাকে দেখামাত্রই চিনেছিলাম। কিন্তু মানিকদাকে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। ভীষণ অপরিচয়ের মধ্যে থেকে, প্রত্যাশিত শত্রুতার মধ্যে থেকে যে বেরিয়ে এল, সে আমার এক প্রথম প্রিয় অনুভূতির প্রতিনিধি, সে আমার কৈশোরের মানিকদা। কিন্তু এ-কি সেই দুর্ধর্ষ মানিকদা, যার গাছে-চড়া সাঁতার-কাটা মারামারি আমাকে মুগ্ধ ক'রে রাখত আর রাত্তিরে যার ভূতের ভয় আমাকে কৌতুকে মাতাত, আমাকে স্নেহশীল হবার আনন্দ দিত। আমার ইচ্ছে হতে লাগল আমরা ফিরে যাই; আমাদের বয়েস কমাতে-কমাতে সেইখানে গিয়ে থামি, যেখানে গাছের নিচে অথবা পুকুরপাড়ে অথবা অন্য দলের সামনে মানিকদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী মূর্তি নিয়ে দাঁড়াবে, যেখানে কৃষ্ণপক্ষের রাতে আমি মানিকদাকে ভয় দেখিয়ে সান্ত্বনা দেব।

মানিকদার কণ্ঠস্বরের আদলটা এখনো তেমনি আছে, যদিও প্রবলতা কম। সেই আগেকার আদলেই সে বলল, 'পলাশ, তোর সঙ্গে যে এ-ভাবে দেখা হ'য়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'—'আমিও না', আমি বললাম।—'তোর চেহারা তেমন বদলায়নি, তবে একটু ভারিক্কি হয়েছিস। আমি চিনেছিলাম ঠিকই, তবে কথা বলবার সাহস হচ্ছিল না যদি তুই আমল না-দিস।' সাহস হচ্ছিল না! এ কী কথা মানিকদার মুখে? বাস্তবিক মানিকদা কেমন বুড়ো হ'য়ে গিয়েছে, কেমন যেন জড়োসড়ো। মানিকদার আগের ভাবভঙ্গি মনে আনতে আমার বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। এ যেন আর একটা মানুষ। তার বর্তমান জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে যা জানলাম তা এই : মানিকদা স্ত্রী এবং দুটি মেয়ে (কোনো ছেলে হয়নি) নিয়ে শহরতলিতে থাকে, কেননা জায়গাটা দূর হলেও ওদিকে বাড়িভাড়া

অনেক কম ; সে কাজ করে এক প্রাইভেট প্রেসে, কম্পোজিটারের কাজ, খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়, যখন ফেরে বেশ রাত হ'য়ে যায়। দুটি মেয়েই বড় হ'য়ে উঠেছে, লেখাপড়া বেশীদূর করেনি, কেননা পড়ানোর সাংঘাতিক খরচা, এখন তাদের বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু মোটা দাম না দিতে পারলে একটু মনোমতো পাত্র পাওয়া মুশকিল ; মজার কথা এই যে, টাকা নেই ব'লে ওদের বিয়ে হচ্ছে না আর লেখাপড়া করেনি ব'লে ওদের চাকরি হচ্ছে না। এই মজার কথাটা মানিকদা হা-হা ক'রে হাসতে-হাসতেই বলল। আমি থলির মধ্যে থেকে উঁকি-দেওয়া শাড়ি দুটো সম্বন্ধে এখন একটা আন্দাজ করতে পারলাম : দুটো দুই মেয়ের, অথবা একটা মা'র একটা মেয়ের। কিন্তু বৌদি কি এখনো রঙীন শাড়ি পরে ? হয়তো পরে, সাদা হলে মোটা সুতোগুলো বড্ড ক্যাটক্যাট করে, রঙে অনেকটা চাপা প'ড়ে যায়, আর ময়লাও কম দেখায়। মানিকদা একবার বলল, 'আসিস-না আমাদের বাড়িতে একদিন।' কিন্তু তার কথার মধ্যে জোর ছিল না। আমিও সমান দুর্বলভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, আসবো।' মিথ্যে কথাই বললাম। কারণ, আমি ভাবছিলাম, কী হবে মানিকদার ওখানে গিয়ে, এখানে দাঁড়িয়েই তো যথেষ্ট যন্ত্রণা পাওয়া গেল, ব'সে-ব'সে আর যন্ত্রণা পাওয়ার কী দরকার ?

বীরেনদার কথা জিগ্যেস করার ইচ্ছেটা আমার তীব্র হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু জিগ্যেস করতে ভয় করছিল। মানিকদার কথা ভেবে নয়, সুজনের কথা ভেবে। কিন্তু আমার কিছু বলতে হল না, মানিকদাই সে-প্রসঙ্গ ওঠাল। বলল, 'বীরেনের খবর রাখিস ?' আমি অস্পষ্ট স্বরে বললাম, 'না'। আমার বুক টিপটিপ করছিল মানিকদা নিশ্চয় খবর জানে। ও বলল, 'আমি তার খবর পাই। বীরেন এখন কোথায় আছে জানিস ? পূর্ব পাকিস্তানের জেলে।' —'সে কী, বীরেনদা জেলে কেন ?'—'আরে, ও যে পাকিস্তানী কর্তাদের চক্ষুশূল হ'য়ে উঠেছিল।'—'কেন, কী করেছিল বীরেনদা ?

—'ও নাকি সরকারের বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাচ্ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কোনোর অভিযোগ দিয়ে প্রথমদিকে একবার ওকে ধরেছিল, কিন্তু তা প্রমাণ করতে পারেনি। প্রমাণ করবে কী ক'রে? কর্তারাই দেখতে পায় সাধারণ মুসলমানরা ওকে খুব মানে, ওকে ভালোবাসে, ওর উপর তাদের খুব বিশ্বাস। তখন ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিছুকাল পরে ওকে আবার ধরে। এবার চার্জ দিয়েছে ঐ যে বললাম, সরকারের বিরুদ্ধে লোক-ক্ষেপানো। ও নাকি চাষীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল যাতে এই সরকারকে উৎখাত করা যায়।'

আমি শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম, বললাম, 'কিন্তু বীরেনদা তো রাজনীতি করত না।' —'না, তা করত না। এখনো করে কিনা সন্দেহ,' মানিকদা বলল।—'তবে?'—'আমি যদ্দুর জানি, বীরেন কোনো রাজনীতিক দলে নেই। আগেও তো ছিল না কখনো। কিন্তু ওর স্বভাব তো তুই জানিস, চোখের সামনে কোনো অন্যায় দেখলে সহ্য করতে পারে না। ঐ স্বভাবই ওকে এই বিপদে ফেলে দিয়েছে।'—'তা ঘটেছিল কী?'—'আমি সব ঠিক জানি না। যা শুনেছি বলছি। আমরা যেখানে থাকতাম সেই এলাকার চাষীদের উপর, মানে যাদের বীরেন চিনত তাদের উপর, আগেকার দিনের মতোই অত্যাচার চলছিল। জোতদাররা তাদের দিয়ে ফসল ফলিয়ে বেশীর ভাগই মেরে দেয়, নানাভাবে ফাঁকি দেয়, কারো একটু-আধটু জমি যা থাকে তা ক্রমে গ্রাস করে, মহাজনরা টাকা ধার দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত ক'রে ছাড়ে। স্বাধীনতার আমলে এমন হবে কেন, এতেই বীরেনের রাগ হ'য়ে গিয়েছিল। ও এই ব্যবস্থা মেনে না-নিতে চাষীদের পরামর্শ দেয়। ও যে তাদের পক্ষে, এটা জানতে পেরে চাষীরা শেষে নিজেরাই আসত ওর কাছে পরামর্শের জন্যে। তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান। আরে, সেইজন্যেই তো ওর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অভিযোগটা ধোপে টেকেনি।'

মানিকদার কথা শুনতে-শুনতে আমার রোমাঞ্চ হতে লাগল। মনে হচ্ছিল, দুটো সবল হাত যেন অন্ধকার পাতাল থেকে আমাকে উপরে আলোর দিকে টেনে তুলছে। আমি ম'রে যাচ্ছিলাম, বীরেনদা যেন আমাকে বাঁচিয়ে দিল। সেই সঙ্গে মনে পড়ছিল বীরেনদার বাবার মৃত্যুর ঘটনা এবং সে সম্বন্ধে বীরেনদার অটুট নীরবতা। বীরেনদা সম্বন্ধে আমার আরো জানতে ইচ্ছে হল। মানিকদাকে জিগ্যেস ক'রে জানলাম, সে বিয়ে করেছিল, তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তবে তো বীরেনদার বউ আর ছেলেমেয়েরা বেশ মুশকিলেই আছে।—'হ্যাঁ, তা আছে। বীরেন কবে ছাড়া পাবে সেই আশা নিয়েই তারা দিন কাটাচ্ছে।' বীরেনদার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কষ্টের সঙ্গে-সঙ্গে খুব আনন্দ। এত বছর বাদে বীরেনদা আবার আমাকে রক্ষা করার জন্যে বুক পেতে দিল। আমার নিজের হর্ষবিষাদের মধ্যে আমি যখন দুলছি তখন মানিকদার শেষ কথাগুলো আমাকে থামিয়ে দিল। আমি শুনলাম সে বলছে, 'জানিস পলাশ, আমার এক-এক সময় মনে হয় আমিও বীরেনের মতো লড়াইয়ে নেমে যাই। কী আর হবে, বড় জোর আমি মরব, ওরা মরবে। এমনিতেও তো মরছি সকলে মিলে। আর পারা যায় না।' মানিকদা তখন চ'লে যাবার জন্যে রাস্তায় পা বাড়িয়েছে।

বাড়ি ফিরে দেখি পিটার ও মারিয়া আমার আগেই ফিরে এসেছে। ওরা দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে গিয়েছিল। কোন্ এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দু'জনকেই বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, যেন ওরা কোন উজ্জীবনের উৎস আবিষ্কার ক'রে এসেছে। এতদিনের মধ্যে এমন সজীব ওদের দেখিনি।

কথায়-কথায় পিটার বলল, 'আজ কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হল, যারা খুব অন্যরকম।'

—'অন্যরকম মানে? কাদের থেকে অন্যরকম?'

—'এই যাদের আমরা এ-যাবৎ দেখছিলাম, যারা সিনেমার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অথবা রংচঙে পোশাক প'রে হৈচৈ ক'রে বেড়ায় অথবা যাদের রোজ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বা রাস্তার ধারে রকে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে দেখি।'

—'তা বেচারারা করবে কী? চাকরি-বাকরি নেই, পরীক্ষার জন্যে পড়া নেই, বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলার জায়গা নেই এবং স্বভাবতই বিয়ে করারও উপায় নেই। সুতরাং সিনেমা অথবা রাস্তাই তাদের পরম আশ্রয়। এখানেই কিছু সাধ-আহ্লাদের চাক্ষুষ ও মৌখিক পূরণ তো হয়।'

—'হ্যাঁ, এটা যে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার এবং তার ফলে মানুষের চারিত্রিক অবস্থার একটা লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। তবে সবার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। আজ যাদের সঙ্গে আলাপ হল তারা অন্য পথ বেছে নিয়েছে।'

—'কেন, অন্য-পথে-চলা ছেলেমেয়ে কি তুমি আর দেখতে পাওনি?'

পিটার যেন লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'না, না, আমি তা বলছি না। অন্যরকম অনেক ছেলেমেয়েই দেখেছি। তারা চপলমতি নয়। এই ধরো-না অজয়। সৎ এবং হৃদয়বান। কিন্তু যাদের কথা বললাম তারা অন্য জাতের। তারা মনে হল আগুন। নিজেরা সব সময় যেন জ্বলছে। এবং তাদের সংস্পর্শে এলে কেউ কেউ যেন পুড়ে মরবে এবং কেউ কেউ শুদ্ধ হবে।'

আমি ঠাট্টা করলাম, 'তা তোমরা বুঝি শুদ্ধ হলে?'

পিটার খুব গম্ভীর হ'য়ে গেল। মারিয়া হাসিহাসি মুখে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল, সেও গম্ভীর হ'য়ে গেল। পিটার একটু কঠিন স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, শুদ্ধ হলাম বৈকি।' তারপর স্বর নরম ক'রে বলল, 'পলাশ, সত্যিই এরা খুব ভালো। মত ও পথ সম্বন্ধে এদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই, তবু বলব ভালো বলতে যা বোঝা উচিত, এরা তাই।'

ঠাট্টার সুরটা টেনেই আমি মন্তব্য করলাম, 'জানো তো যারা ভালো, ভগবান তাদের খুব ভালোবাসেন। তিনি ইহজগতে তাদের বেশী দিন রাখতে চান না, তাড়াতাড়ি তাঁর কোলে টেনে নেন। তোমরা পরের বার এলে এদের খুব সম্ভব আর দেখতে পাবে না।'

পিটার দীর্ঘ ক'রে নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খুব সম্ভব।'

আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এই সাদা চামড়ার দু'জনকে বিশ্বাস ক'রে তারা তাদের মনোভাব প্রকাশ করল কোন্ ভরসায়? কিন্তু আমি প্রশ্নটা চেপে গেলাম। হয়তো তাদের হ্রস্ব জীবনের অভিজ্ঞতাই তাদের কাছে চিনিয়ে দেয় কে শত্রু, কে মিত্র। হয়তো তাদের ভেতরের কোনো চুম্বক লাগিয়ে তারা বুঝে নিয়েছে পিটার-মারিয়া অন্য ধাতু নয়, লোহা।

আমার মনে কিন্তু বীরেনদার কাহিনী তখনো ঘুরছিল, মানিকদার শেষকথা তখনো কানে বাজছিল: 'জানিস পলাশ, মনে হয় আমিও বীরেনের মতো লড়াইয়ে নেমে যাই।' পিটারের সঙ্গে আলোচনা আমার সেই আচ্ছন্নতা যেন আরো বাড়িয়ে দিল। বীরেনদা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কী থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে, পলাশ? আশাভঙ্গ থেকে, অবিশ্বাস থেকে? ব্যস, তাতেই তোমার উদ্ধার! তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমার ভূমিকা হল দর্শকের। পর্যবেক্ষণ ছাড়া তোমার আর কিছু করার নেই। ঐ ভূমিকাই তোমার দণ্ড, পলাশ। তুমি দেখে যন্ত্রণা পাবে, দেখে-দেখে আবার সান্ত্বনা পাবে, এবং আবার যন্ত্রণা। চাকা এইভাবে ঘুরে-ঘুরে চলবে। কোনো কাজের শামিল তুমি হতে পারবে না। তুমি পর্যবেক্ষক। ব্যক্তি হিসেবে তোমার নিজের আনন্দ-বেদনাই তোমার কাছে আসল। সেই জন্যেই তুমি মারিয়াকে দেখে এমন ট'লে গিয়েছ, অঞ্জলি ও পিটারের বিষয় বারেবারে তোমার মনের পেছনে হ'টে যাচ্ছে। অথচ সেখানেও তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না, দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হতে পারছ না। তোমার বিধিলিপি এই। তুমি করুণার পাত্র।

১২

পিটাররা যে পুরী থেকে ফিরে আমাদের বাড়িতে উঠবে না, তা আমি জানতাম। কলকাতায় তাদের হোটেল আমিই ঠিক ক'রে দিয়েছি। ফেরার আগেই পিটার আমাকে লিখেছিল তারা হোটেলে থাকতে চায়, তাতে অঞ্জলির উপর চাপ কমবে, তাছাড়া তাদের পক্ষেও সেটা সুবিধের হবে, অতএব আমি যদি মোটামুটি ভদ্র একটা হোটেলের ব্যবস্থা ক'রে দিই। জেনীভায় পিটারের ওখানে থাকার সময় আমার রেস্তোরাঁয় খাওয়া নিয়ে পিটারের আপত্তির কথা এখন আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু আমি তা চাপা দিয়েছিলাম। অঞ্জলির শরীরের চেয়ে মনের উপর চাপের কথাই বেশী ভেবেছিলাম। জেনীভায় আমরা দু'জন একসঙ্গে যখন ছিলাম তখন আমরা অবিবাহিত। তখন আমরা উন্মুক্ত থাকতে পারতাম, মন আড়াল ক'রে আমাদের চলতে হত না, তখন আমাদের স্রোতের মুখে পাল্টা স্রোত এসে লাগত না।

গঙ্গার ধারে সবাই মিলে একসঙ্গে বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটা পিটাররা প্রকাশ করেছিল পরে, বেশ কয়েকদিন হোটেলে থাকার পর। ওরা ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসছিল। পিটার একাই অনেক সময়। আসবে না কেন, ওরা তো রাগ ক'রে অন্য জায়গায় উঠে যায়নি। কিন্তু অঞ্জলি ওদের হোটেলে একদিনও দেখা করতে যায়নি। আমি কয়েকবার বলেছিলাম, ও নানারকম কারণ দেখিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল: কখনো সংসারের কাজ, কখনো শরীর খারাপ। তবে একবার বলেছিল, ও গেলে আমাদের অন্তরঙ্গতার আবহাওয়াটা নাকি নষ্ট হ'য়ে যাবে। অঞ্জলি যায় না ব'লেই হয়তো পিটার আরও ঘন-ঘন আসে। শিশুকে শান্ত করার জন্যে যেমন ব্যবহার করতে হয়, অঞ্জলির প্রতি ওর ব্যবহার অনেকটা সেই রকম। গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবটাও যেন তাই।

আশ্চর্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা পিটারের। অত সহনশীল ব্যবহার করতে আমি পারি না, আমার রাগ হ'য়ে যায়। কিন্তু অঞ্জলি যদি অন্য মেয়ে হত, অন্য লোকের স্ত্রী হত, তাহলেও কি আমি এমন বিক্ষুব্ধ হতাম? অঞ্জলি না-হ'য়ে মারিয়া হলে পিটার কী ব্যবহার করত? কী ব্যবহার করে সে? কিন্তু আমার এ-রকম ভাবা অর্থহীন, কারণ পিটার ও মারিয়া অন্য মানুষ, মানে অন্য স্বভাবের মানুষ, তারা পলাশ ও অঞ্জলি নয়। তাদের মিল এবং অমিলগুলো নিশ্চয় আমাদের মতো নয়। হয়তো সেগুলো সম্বন্ধে তাদের পরিষ্কার বোঝাপড়া আছে। নইলে এই ক'বছর পরেও তারা সব সময় অত স্থৈর্য রাখে কী ক'রে? এটা ঠিক যে তারা দু'জন স্বভাবেই শান্ত! কিন্তু দুটো পাথর তো আলাদা আলাদা ঠাণ্ডাই থাকে অথচ ঘষা লাগলেই ফুলকি ছোটায়। তা নয়, ওরা হয়তো বুদ্ধি দিয়ে বিরোধ এড়িয়ে চলার পথ ঠিক ক'রে নিয়েছে। বুদ্ধি! বুদ্ধি তো অঞ্জলিরও আছে এবং আমারও যে একেবারে নেই তা নয়। আমরা তো পথ ঠিক করতে পারিনি। বুদ্ধি আমাদের প্রশান্তি দিতে পারেনি। কী ক'রে পারবে? সমস্ত আগুন যে রক্ত থেকে উঠে আসে। তবে? তবে কি জীবন-যাপনের অভ্যেসটাই বদলাতে হয়, পুরনো ছাঁচ ভেঙে ফেলে অন্য ছাঁচে মনকে ঢালাই করতে হয়?

সবাই মিলে একসঙ্গে বেড়াতে যাবার প্রস্তাবে কিন্তু অঞ্জলি রাজী হ'য়ে গেল। খুব বেশি তাকে বলতে হল না। তার সিদ্ধান্ত আমার পক্ষে স্বস্তিদায়ক, আমি খুশি হলাম, কিন্তু সেইসঙ্গে তার রাজী হওয়াটা বিশ্লেষণ না-ক'রে থাকতে পারলাম না। মনে হল, অনেকগুলো কারণ এই রাজী হওয়ার পেছনে রয়েছে: প্রথমত, অঞ্জলির স্বভাবের অন্তর্নিহিত শিষ্টতা, পিটার-মারিয়ার সঙ্গে বাইরে কোথাও একত্রিত হওয়া সৌজন্য হিসেবে যে অত্যাবশ্যক এটা সে বুঝতে পারছে। দ্বিতীয়ত, এই ভ্রমণের জন্যে পিটার তাকে একাধিকবার অনুরোধ করেছে, যে-পিটার তাকে কখনো তাদের হোটেল দেখে আসতে বলেনি, এই চারিত্রিক গুরুত্বের একটা প্রবল চাপ আছে। তৃতীয়ত, (এইখানে

বুদ্ধি শেষ হল, এবার রক্ত থেকে আগুন উঠে আসছে), ও দেখতে চায়, মারিয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কত দূর গড়িয়েছে. এবং দেখে নিজে আরো পুড়তে চায় এবং আমাকে পোড়াতে।

আমরা, মানে অঞ্জলি আর আমি প্রথমে পিটারদের হোটেলে গেলাম। ওখান থেকে সবাই একসঙ্গে যাব। সেই রকমই কথা হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, মারিয়া প্রস্তুত, কিন্তু পিটারের একটু সময় লাগবে, কারণ ও স্নান ক'রে বেরোতে চায়। পিটার অপরাধীর মতো বলল, বেলা পড়ার আগে ওর স্নান করতে ইচ্ছে করছিল না ব'লে এতক্ষণ করেনি, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও তৈরি হ'য়ে নেবে। পিটার ভেতরে চ'লে গেল. বাইরের ঘরে আমরা তিনজন ব'সে রইলাম। সূর্য তখন অস্তাচলে, পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে এক ঝলক লাল আলো এসে ঘরটা রাঙিয়ে দিয়েছে। আমি ব'সে ছিলাম পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে, অঞ্জলি ও মারিয়া ছিল পূবদিকের জানলার ধারে। ওরা নিচু গলায় কথা বলছিল। কথা মানে প্রশ্নোত্তর। মারিয়া প্রশ্ন করছিল, অঞ্জলি উত্তর দিচ্ছিল। ওরা কী বলছিল আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, শুনবার চেষ্টায় আমি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গোধূলির আলো পুরো পড়েছিল ওদের চোখে, ঠোঁটে, গলায়, বুকে। আমি ওদের দু'জনকে পাশাপাশি উদ্ভাসিত দেখছিলাম। দেখতে-দেখতে আমি যেন কোন্ অতলে তলিয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ পিটারের গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম। ও তৈরি হ'য়ে এসেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। নদীর দুই ধারে আলো জ্ব'লে উঠেছে। জলের উপর জাহাজগুলোয় যেন আলোকসজ্জা, এধারে ওধারে ছোট ছোট নৌকোগুলো টিমটিম। নদীর উপরে এবং অন্য পারে এই আলো আমার ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলাম, আমার সামনে ঠাণ্ডা জল অন্ধকারে ব'য়ে চলুক, আমি তার অস্পষ্ট প্রবাহ দেখি আর কলরব শুনি, অন্য তীরকে শুধু অনেক দূরে আন্দাজ

ক'রে নিই। কিন্তু তার কি উপায় আছে? তবু হাঁটাহাঁটি ক'রে কিছু অন্ধকার একটা অংশ খুঁজে পাওয়া গেল। সেইখানে আমরা ব'সে পড়লাম। আমি তাকিয়ে রইলাম সামনে। জলে, হাওয়ায়, যেখানে জল শেষ হয়েছে সেই জমির উপর ধূসর রং। আমি দেখছি একটা আবছা চওড়া বাঁক। যেন লোয়ার নদী এইখানটায় বাঁক নিয়েছে। লোয়ার উপত্যকার সেই আধা-শহর আধা-গ্রামে যখন ছিলাম, বিকেলের দিকে নদীর পাড়ে গিয়ে বসতাম। ক্রমে আলো ক'মে আসত আর আমার মনে হত আমি গঙ্গার ধারে ব'সে আছি। আমার হঠাৎ মনে হল, দিদিমা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, আমার এখনি ফিরতে হবে। হ্যাঁ, দিদিমা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রেই থাকত, আমার ফরাসী দিদিমা। একটু দেরিতে বাড়ি ফিরলে বলত, 'পলাশ, তোমার দেরি দেখে ভাবনা হচ্ছিল। তুমি তো এখানকার পথঘাট চেনো না।'

দিদিমা একাই থাকত, ছেলে বিদেশে, মেয়ে মারা গিয়েছিল একটি মেয়ে রেখে। নাতনী প্যারিসে পড়ত, সে মাঝে মাঝে আসত, তার পরিচয়েই দিদিমার বাড়িতে আমার থাকা। দিদিমার অবস্থা ভালো নয়। না-হওয়ারই কথা, দিদিমা ছিল শ্রমিকের স্ত্রী। দাদামশাই চ'লে গিয়েছে কোন্ কালে। বউয়ের জন্যে তেমন কিছু রেখে যাওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। পাওয়ার মধ্যে দিদিমা পেয়েছিল দুখানা ঘরের একটা নড়বড়ে বাড়ি। যে-ঘরে দিদিমা শুত, রান্নাবান্না সেই ঘরেই হত। এই স্থান-সঙ্কোচ একদিক থেকে দিদিমার উপকারেই এসেছিল, শোয়ার ঘরে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা হত ব'লে ঘরটা গরম থাকত। শীত ঠেকানোর জন্যে জ্বালানি কেনবার পয়সা কোথায় বুড়ীর? আমার শোবার জায়গা হয়েছিল পাশের ঘরে, পুরনো বাক্সপ্যাঁটরা ভাঙা চেয়ারটেবিল ইত্যাদিতে সে-ঘরটা ভরতি, দেয়ালগুলো পলস্তারা-খসা। হঠাৎ বড় ঠাণ্ডা পড়েছিল সেবার। তাই আমাকে রাত্তিরে একটা ফাটাফুটো খাটের উপর পশমের আস্তর-লাগানো একটা থলির মধ্যে ঢুকতে হত।

তারপর গোটা কয়েক ইঁট গরম ক'রে আমার পায়ের নিচে, আমার পেটের কাছে, পিঠের দিকে আর ঘাড়ের ধারে রাখা হত। ইঁটের তাপ অনেকক্ষণ থাকে। এইভাবে ঘুম আনতে হত। তবু এক-এক সময় রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যেত, উঃ কী শীত, ইটগুলো কখন ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে!

দুই ঘরের মাঝখানের দরজাটায় পাল্লা ছিল না। দিদিমা বিছানায় শুয়ে আমার সঙ্গে কথা বলত, আমি এ-ঘরের বিছানা থেকে সাড়া দিতাম। শোয়ার আগেও কথা হত, খাওয়ার ঠিক পরে খাওয়ার টেবিলে ব'সেই। দুপুরেও হত। দিদিমা ব'সে ব'সে আগেকার কথা বলত, আমার কথাও জিগ্যেস করত। দাদামশাইর কথা বলতে-বলতে দিদিমা যৌবনে ফিরে যেত। দাদামশাই কাজ করত সেণ্ট তৈরির কারখানায়। 'জানো পলাশ, সকালে যখন আমি দোকানে বা বাজারে যেতাম, আমার গা দিয়ে ভুরভুর ক'রে গন্ধ বেরোত। লোকে জিগ্যেস করত, "ও মেয়ে, তোমার গায়ে এমন সুবাস কেন?" আমি জবাব দিতাম, "তা হবে না? আমি যে সেণ্ট তৈরির লোকের সঙ্গে শুই।" তোমার দাদামশাই, বুঝলে, মানুষটা খুব ভালো ছিল। ঝগড়াঝাটি আমি যতই করি না কেন, সে ঠিক মিটিয়ে নিত আর আমার শরীরটা কী সুগন্ধ যে ক'রে দিত।' কোনো সময় হয়তো জিগ্যেস করত দিদিমা, 'আচ্ছা পলাশ, তোমাদের দেশে মানুষ বুড়ো হ'য়ে গেলে কেউ কি তার দেখাশোনা করে?' আমি বলতাম, 'হাঁা করে, ছেলেমেয়েরা করে।' তখন দিদিমা একটু চুপ ক'রে থেকে মন্তব্য করত, 'তোমাদের দেশ খুব ভালো।' একদিন দিদিমার ছেলের বউ এল শহর থেকে। মহিলার যদিও বয়েস হয়েছে, তবু তখনো দেখতে বেশ সুন্দর, সাজপোশাকও করেন পরিপাটি। তিনি এসে দু'দিন ছিলেন, বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন, দেখতাম খাটের উপর গদীয়ান হ'য়ে রয়েছেন, ঘরের কাজ সব দিদিমা করছে, রান্না ক'রে ছেলের বউয়ের মুখের কাছে খাবার যুগিয়ে যাচ্ছে, আর কাজের ফাঁকে এক-একবার আমার কাছে এসে ফিসফিস ক'রে

বলছে : 'নবাবের বেটীর রকমটা ছাখো, উনি পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাকবেন আর আমাকে খেটে মরতে হবে।' তারপর প্রশ্ন : 'তোমাদের দেশে কি এমন করতে হয়, পুতের বউয়ের এই সেবা ?' আমি উত্তর দিই, 'না, ঠিক এর উল্টো, সেখানে বউরাই শাশুড়ীর সেবা করে।' আবার দিদিমা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তোমাদের দেশ খুব ভালো।'

দিদিমার জন্যে আমি কোনো-কোনো দিন বাড়ি ফেরার পথে কিনে নিয়ে যেতাম চকোলেট বা লজেন্স। দিদিমার হাতে দিতেই কোঁচকানো মুখটা ঝলমল ক'রে উঠত, বলত, 'কেন তুমি এ-সব আনতে গেলে ?' সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করত, 'পলাশ, তুমি খুব ভালো।' আমার মধ্যে ভালো কী দেখেছিল তা বুড়ীই জানে।

বিদায় নেওয়ার আগের দিন আমি রাত্তিরের খাওয়ার পর গল্পগুজব সেরে আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছি। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই বুঝতে পারছি দিদিমার ঘুম আসছে না, কেবল এপাশ-ওপাশ করছে। হঠাৎ দিদিমা জিগ্যেস করল, 'পলাশ, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো ?'

—'না।'

—'আচ্ছা পলাশ, তোমাদের দেশে কী করে ?'

—'কীসের কী করে, দিদিমা ?'

—'এই আপনার জন কেউ যখন চ'লে যায় ?'

—'কী আর করবে !'

—'না, আমি বলছি বিদায় দেওয়ার সময় তাকে কি চুমু খায় ?'

—'না, আমাদের দেশে ও প্রথা নেই।'

—'তবে তো মুশকিল, আমার চুমু খাওয়া চলবে না। আচ্ছা, আমি তোমায় মনে-মনে চুমু খাব।'

দিদিমাকে কী বলব আমি ? চুপ ক'রেই থাকলাম। বুড়ী বোধহয় ধ'রে নিল আমার ঘুম এসে গিয়েছে।

সকালবেলায় উঠে খাওয়া-দাওয়া সেরে পোশাক বদলে জিনিসপত্র

গুছিয়ে তৈরি হ'য়ে নিলাম। দিদিমা কোনো কথা বলছিল না, শুধু দেখছিল। অতঃপর আমি আমার ব্যাগটা পিঠে ফেলে স্ট্র্যাপ আটকে দিদিমাকে জানালাম, এবার যেতে হবে, বাস-এর সময় হয়েছে। দিদিমা আমার সঙ্গে ভাঙা ফটকটা পর্যন্ত এল। ফটকের বাইরে এসে দিদিমার হাতটা ধ'রে আমি বললাম: 'চলি দিদিমা।' হঠাৎ বুড়ী আমার মাথাটা দুই হাতে আঁকড়ে টেনে নিয়ে এগালে-ওগালে কেবল চুমু খেতে লাগল, তারপর হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। আমি বুড়ীর মুখটা আমার বুকের উপর চেপে ধরলাম, আমার জামার খানিকটা চোখের জলে ভিজে গেল। তারপর আমি আস্তে-আস্তে তাকে সরিয়ে নিজেকে আল্‌গা ক'রে নিলাম এবং হঠাৎ উল্টো মুখে ঘুরে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। দিদিমা তখন কী করছিল আমি জানি না, আমি আর ফিরে তাকাইনি।

দিদিমা কি এখনো বেঁচে আছে? দিদিমা!

আমি হয়তো কোনো অস্ফুট আওয়াজ করেছিলাম, কেননা পিটার জিগ্যেস করল, 'কী বলছ পলাশ?'—'কিছু না তো।' ওরা তিনজনে যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল সেটা বুঝলাম। অঞ্জলির মৃদু স্বরও কানে এল। ওরা কী বলছিল জানি না। আমার তা শোনবার কিংবা তাতে যোগ দেবার আগ্রহ ছিল না। আমি বললাম: 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

১৩

দেখেছিলাম অল্প কয়েকটা মুহূর্ত, তবু সেই গোধূলির ছবি আমার মন থেকে মিলোয়নি। আমার দৃষ্টির সামনে আসছিল কেবলই মারিয়ার মুখ আর তাকে ফুটিয়ে তুলে পাশে অঞ্জলির মুখ। অঞ্জলির মুখ আমার খুব চেনা, তার চামড়ার টানটোন, তার রেখার ভাঙন গড়ন, ওলটপালট, সব। তার ঋজুতা কখন কেমন ক'রে বেঁকে বর্তুল হ'য়ে ওঠে, কেমন ক'রে কোণগুলো গ'লে যায়, কেমন ক'রে

স্থির দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয় আর সারা শরীর যেন বনের মধ্যে গজরায়, কখনো-বা সমুদ্রের ঢেউয়ে ওঠে-নামে এবং আমাকেও স্বর্গে ওঠায় আর রসাতলে নামায়, তা আমার খুব জানা। এক স্বাভাবিকতা থেকে আর এক স্বাভাবিকতায় পৌঁছনো, এ-এক আশ্চর্য রূপান্তর। পোশাক-প্রসাধন চালচলন ব্যক্তিত্ব কর্তব্য দয়া প্রেম নিষ্ঠুরতা আত্মত্যাগ স্বার্থপরতা, সব মিলিয়ে-জুলিয়ে বিভিন্ন অনুপাতে তৈরি এক-এক মানুষের বিশিষ্ট মূর্তি। তাকে পার হ'য়ে আরো তলায় এক অবিমিশ্র মানুষী অস্তিত্ব, চষা ক্ষেতের সঙ্গে, সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে জীবনের আত্মীয়তায় বাঁধা। এক নিরাবরণ শারীর সত্তা। আমার ও অঞ্জলির, পৃথিবীর সমস্ত পলাশ ও অঞ্জলির ভালোবাসা ঘৃণা আকর্ষণ বিকর্ষণ তো তারই উপর গড়া। সেখানে যাওয়ার তাগিদ কী প্রবল! রূপান্তরিত হওয়া এবং রূপান্তরিত হতে দেখা, সে যেন ঈশ্বরের মতো ক্ষমতায় একটা জগৎ সৃষ্টি করা। মারিয়ার ঐ যে-মুখ এমন স্নিগ্ধ এমন সজল এমন শোভাময়, ঐ মুখ কেমনভাবে বদলায়, ঝড়ের ঝাপ্‌টায় আছড়াবিছড়ি করে, হাল্‌কা মেঘ চিরে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়, সমস্ত অন্ধকার গোঙায়!

মারিয়ার মুখ কিছুতেই আমার চোখ থেকে অদৃশ্য হচ্ছিল না। আমাকে তা দুর্নিবারভাবে টানছিল। তার আকর্ষণ আমি যত ঘুরিয়ে দিতে চাইছিলাম ততই তা আমাকে জড়িয়ে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল আমার আর উদ্ধার নেই। পিটার যদি পাঁচিল তুলে রাখত তাহলে আমি বাঁচতাম। অন্তত তাতে আমি আট্‌কে যেতাম। কিন্তু পিটার তা করল না, বরং যেটুকু আড়াল ছিল তাও সে সরিয়ে দিল, অবিশ্যি কিছু ভেবেচিন্তে নয়, এমনি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনায়। গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসার দিন তিনেক বাদে পিটার আমায় জানাল সে দিল্লী যাচ্ছে, হপ্তাখানেক কলকাতায় থাকবে না, যাবে প্লেনে, কেননা একজনের সঙ্গে অবিলম্বে তার ইন্টারভিউ ঠিক হয়েছে, তবে সে ফিরবে ট্রেনে দেশ আর মানুষের চেহারা দেখতে-দেখতে। আমি জিগ্যেস করলাম মারিয়া তার সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।

বলল, 'না, ও এখানে থাকবে, নিজের মতো ঘোরাঘুরি করবে।'

—'মারিয়া একা থাকবে হোটেলে! যদি কোনো দরকার-টরকার হয়?'

—'কী আর এমন দরকার হবে? যদি হয়ই তোমাকে জানাবে।'

—'তাহলে আমি রোজ একবার খোঁজ নেব।'

—'নিতে পারো, তবে আমার মনে হয় তার প্রয়োজন নেই। তোমার সাহায্য নেওয়ার কারণ ঘটলে ও-ই তোমার সঙ্গে দেখা করবে।' তারপর হাসতে-হাসতে বলল, 'তোমাদের বন্দোবস্ত তোমরাই যা হয় কোরো, আমি ওর মধ্যে নেই।'

আমার মনে পড়ল জনের কথা। সে প্যারিসের বাইরে ভ্রমণে যাওয়ার আগে এলেনির দেখাশোনার দায় আমার উপর চাপিয়েছিল। আমি নিতে চাইনি, কিন্তু নিতে হয়েছিল। আর পিটার কোনো দায় চাপাতে চায় না, আমিই নিতে চাই! অবস্থাটা কেমন উল্টো।

পিটার যেদিন দিল্লী রওনা হ'য়ে গেল তার পরদিন সকালে যতক্ষণ আমি কাজে বেরোবার আগে বাড়িতে ছিলাম ততক্ষণ মারিয়ার আগমন প্রত্যাশা করেছি, বাড়ি ফিরেও তাই। প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি এক্ষুনি মারিয়া এসে সামনে দাঁড়াবে, তার হাসি হাসি মুখ আমাদের ঘরটা উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। কিন্তু সে আসেনি। আমি কি মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছিলাম? অঞ্জলি ঘরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের সময় আমার দিকে দ্রুত কয়েকবার তাকিয়েছিল, যখনই তা আমার নজরে এসেছে তখনই আমি অস্বস্তি বোধ করেছি, অঞ্জলি কি আমার ভিতরের ব্যাকুলতা টের পাচ্ছে?

মারিয়া এল পরদিন সকালে। এসেই যথারীতি অঞ্জলির কাছে গিয়ে তার কুশলবার্তা জিগেস করল, অন্য কিছু কথা বলল। সব কথারই অঞ্জলি জবাব দিল সংক্ষেপে, কিন্তু খুব সৌজন্যের সঙ্গে। আতিথেয়তাও যথেষ্ট দেখাল, তখনই চা ক'রে খাওয়াল মারিয়ার মানা সত্ত্বেও।

মারিয়া আমার দিকে এগিয়ে এসে যখন কথা বলল, বোধহয়

মামুলী কুশল-প্রশ্নই হবে, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না সে কী বলছে। কাল সে আসেনি কেন, এই জিজ্ঞাসা যেন আমাকে তখন আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। তার মুখের ভাবে যেন সেই উত্তর আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু আমার এ মৌন অভিমানের পালা ক্ষণিকের। অঞ্জলির উপস্থিতি হঠাৎ আমাকে তীরের মতো বিদ্ধ করল। আমি সচেতন হ'য়ে মারিয়াকে জিগ্যেস করলাম তার কোনো কিছুর দরকার আছে কিনা। সে স্মিত হেসে মাথা নাড়ল। তার সেই হাসি দেখে আবার আমি বিভ্রমে থরথর ক'রে উঠলাম। কিন্তু অঞ্জলির কণ্ঠস্বরে আবেশ ভেঙে গেল। অঞ্জলি মারিয়াকে বসতে বলল। মারিয়া কিছুক্ষণ ব'সে কথাবার্তা বলল, তারপর বিদায় নিল। যাওয়ার সময় ব'লে গেল তার জন্যে যেন আমরা চিন্তা না করি এবং আমাদের কাজকর্ম ফেলে তার ওখানে যাওয়ার চাইতে বরং দরকার হ'লে তার আসাই সুবিধাজনক, সে নিষ্কর্মা।

তার জন্যে চিন্তা আমি ঠেকাতে পারি, কিন্তু তাকে ঘিরে চিন্তা আমি ঠেকাই কী ক'রে? সে কি আমার আকুলতা অনুভব করছে না? করছে নিশ্চয়। আমাদের, মানে আমাকে তার হোটেলে যাবার জন্যে ব্যস্ত না-হতে বলার উদ্দেশ্য কি আমার আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা যাচাই ক'রে দেখা নয়?

পরদিন মারিয়া এল না। আমার উন্মুখতা চেপে রাখতে আমায় বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। তাও কি পেরেছিলাম পুরো চাপতে? জানি না। আমি শুধু মারিয়াকে দেখবার জন্যেই অধীর ছিলাম না, আমার অধীরতা ছিল একান্তভাবে তার সঙ্গ পাবার জন্যে। সুতরাং আমাদের বাড়িতে সে আসুক, এ আমি ততটা চাইছিলাম না যতটা চাইছিলাম আমি যাই তার বাড়িতে যেখানে সে একলা রয়েছে। তার পরদিন সকালেও মারিয়া এল না। অবিশ্যি ইতিমধ্যেই আমি কামনা করতে শুরু করেছি সে যেন না আসে। তাতে আমারই যাবার সুবিধে হবে। এতটা সময় তার খবর না-পেলে কি চলে? আমি যাব, আমাকেই যেতে হবে।

সন্ধ্যের পর আমি বেরিয়ে পড়লাম। অঞ্জলিকে শুধু বললাম, আমি একটু বেরোচ্ছি। সে কোনো প্রশ্ন করল না। ইদানীং সে আমাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছে।

মারিয়ার হোটেলে পৌঁছে তার ঘরের বেল বাজাতে সে দরজা খুলে দিল। আমি দম-আটকানো গলায় বললাম, 'তোমার খবর নিতে এলাম।' মারিয়া বলল, 'ভিতরে এসো।' আমি ভিতরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে মারিয়া হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। ভালো-মন্দ কিছুই আর তখন আমার চেতনায় নেই, আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার সেই বাড়ানো হাত আমার দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে গাঢ় স্বরে ডাকলাম, 'মারিয়া!' সে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি খুব অস্থির হ'য়ে পড়েছো, পলাশ; চেয়ারের উপর বোসো।' তার কথায় আমার যেন হুঁশ ফিরল, আমার হাত একটু আল্‌গা হল। আমার হাত সে আস্তে-আস্তে, মা যেমন আহত সন্তানের প্রত্যঙ্গ নিজের শরীর থেকে নামিয়ে বিছানায় রাখে তেমনিভাবে, সরিয়ে দিতে দিতে আবার বলল, 'বোসো।' আমি পেছনে-রাখা চেয়ারে ব'সে পড়লাম। মারিয়া বসল সামনা-সামনি চেয়ারটায়। আমার ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি, আমি ব'লে চললাম, 'তোমার কাছে না-এসে আমি পারলাম না। মারিয়া, তুমি কি বুঝতে পারছো না? তোমাকে আমি···'

আমি আরো অগ্রসর হওয়ার আগেই মারিয়া বলল, 'আমি সব বুঝতে পারছি, পলাশ।'

—'কী বুঝতে পারছ?'

—'তুমি আমাকে চাও।'

—'তবে, তবে কেন তুমি···' বলতে-বলতে আমি আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। মারিয়া আবার অচঞ্চল স্বরে বলল, 'তুমি বোসো। আমি বলছি।'

তার এই অবিচলিত শান্ত ভঙ্গিমার সামনে আমি কেমন জুড়িয়ে

যেতে লাগলাম। দুর্বলভাবে আবার ব'সে পড়লাম। মারিয়া বলতে লাগল, 'পলাশ, তুমি যে আমাকে কামনা ক'রে অস্থির হ'য়ে উঠেছো তা আমি সহজেই অনুভব করেছি। কিন্তু আমাদের দু'পক্ষের অবস্থা তো একরকম নয়। তোমার দিকের কথা তুমিই ভালো জানো, সে-বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার দিকে, পিটারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা প্রবল রয়েছে। সেখানে কোনো ক্লান্তি বা ঔদাসীন্য বা বিরোধ আপাতত নেই। যখন সে-সম্পর্ক শিথিল হ'য়ে যাবে তখন অন্যকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার ইচ্ছে হয়তো আমার জাগবে। হয়তো কেন, খুব সম্ভব জাগবে। কিন্তু এখনো তো সে-অবস্থা আসেনি।'

পিটারের নাম উচ্চারিত হতেই আমি এক ভীষণ ধাক্কা খেলাম, যেন কেউ আমার গালে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল। আমার বুদ্ধির জড়তা ভেঙে গেল, ব্যক্তি ও পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা ফিরে এল। আমি আর্তস্বরে বললাম, 'মারিয়া, আর বোলো না। আমি বুঝতে পারছি তুমি আমায় কী চোখে দেখছো। বাস্তবিক আমি খারাপ মানুষ, খুব খারাপ। তোমার ঘৃণাই আমার একমাত্র প্রাপ্য।'

মারিয়া বলল, 'না, তোমাকে আমি খারাপ মনে করি না, সুতরাং ঘৃণার কথাই ওঠে না।'

—'খারাপ মনে করো না? তবে কী মনে করো?'

একটু হেসে মারিয়া জবাব দিল, 'রক্তমাংসের মানুষদের একজন মনে করি, এমন একজন যার নানান্ গুণ আছে।'

আমি নির্বাক চেয়ে রইলাম। মারিয়া আরো বলল, 'খারাপ হবে কেন? এ-খারাপত্ব তো সবার মধ্যেই আছে। অবস্থার উপর এবং অন্য চিন্তা ও আবেগের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্যের উপর তার প্রকাশ বা অপ্রকাশ নির্ভর করে। আমিই হয়তো এই খারাপত্বকে প্রশ্রয় দিতাম যদি কোনো ফাঁক থাকত। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকেই পিটার আমার অভিনিবেশের কেন্দ্র

হ'য়ে রয়েছে। অবিশ্যি আমি জানি তোমার সঙ্গে বা আর কারো সঙ্গে যদি এখন আমার সম্পর্ক হয় তাহলেও সে ক্ষুব্ধ হবে না।'

—'কী বলছ তুমি? পিটার আপত্তি করবে না?'

—'না, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের পূর্ণ স্বাধীনতায় সে বিশ্বাসী। কোনো-কোনো দ্বিচারিতাকে সে সাময়িক ব'লে মেনে নিতে প্রস্তুত। আর যদি তা সাময়িক না-হয় তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই, সম্পর্ক চুকে গেল।'

আমি ঠিক বুঝছিলাম না, কেননা অঞ্জলি ও আমার সম্পর্ককে ঐ ভিত্তিতে স্বীকার করার কথা আমি চিন্তা করতে পারি না। যে-আমি অঞ্জলি থাকতেই এসেছি মারিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে সেই আমি এমন যুগল-সম্পর্ক মানতে ইচ্ছুক নই! এ বেশ মজার। এই মজার দিকটাও মনে উঁকি মারল। বলতে ইচ্ছে হল: সাবাস পলাশ, এই তো চাই!

হঠাৎ দরজায় বেল-বাজার শব্দ। আবহাওয়া মুহূর্তে তীব্র তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। যদিও আমি তখন চুপচাপই ব'সে ছিলাম, তবু কেমন সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লাম। মারিয়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল, তারপর বলল, 'এসো।' এ কী! ঘরে ঢুকল অঞ্জলি। মারিয়া তাকে চেয়ারে বসতে বলল। সে বসল, ব'সে একবার আমার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। মারিয়া তাকে চা ক'রে দিতে চাইল, কিন্তু সে মাথা নেড়ে জানাল, না। আমি যে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। না-বুঝতে পেরেই ব'লে ফেললাম, 'তুমি হঠাৎ এলে কেন?' অঞ্জলি একটি কথায় জবাব দিল, 'এমনি।' একটু চুপ ক'রে থেকে সে মারিয়াকে জিগেস করল, 'পিটার কবে ফিরবে?' মারিয়া জানাল পরদিনই তার ফেরার কথা।

ঘরের হাওয়াটা যেন ভীষণ শক্ত হ'য়ে উঠেছে, নিশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। এভাবে তো তিনটি মানুষ এক জায়গায় অনির্দিষ্টকাল ব'সে থাকতে পারে না। মারিয়া গৃহকর্ত্রী, সে-ই অবস্থাটা আয়ত্তে নিল। অঞ্জলিকে সম্বোধন ক'রে সে বলল, 'তোমাকে খুব ক্লান্ত

দেখাচ্ছে, অঞ্জলি। তোমার শরীর বেশ খারাপ মনে হচ্ছে। তোমার এখনই বাড়ি যাওয়া উচিত।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'পলাশ, অঞ্জলিকে নিয়ে যাও। তোমাদের সকাল-সকাল খেয়ে বিশ্রাম করা দরকার।' আমি তখন উঠে অঞ্জলিকে বললাম, 'চলো, বাড়ি যাই।' ক্লান্তভাবে অঞ্জলি বেরিয়ে এল আমার সঙ্গে।

আমি আর অঞ্জলি সোজা বাড়ি ফিরলাম, পথে কেউ কোনো কথা বলিনি। বাড়ি পৌঁছে সে ভিতরের ঘরে চ'লে গেল। আমার কিছু কাগজপত্র এলোমেলো প'ড়ে ছিল, সেগুলো গুছিয়ে ভিতরে যেতে আমার একটু সময় লাগল। আমি গিয়ে দেখলাম অঞ্জলি খাটের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে, চেপে-চেপে ফুঁপিয়ে ভীষণ কাঁদছে। আমি অঞ্জলির পিঠের উপর হাত রাখলাম। কান্নায় তার বুক আরো ফুলে-ফুলে উঠল। আমি তার বাহুর উপর, তার মাথায় চুলের উপর হাত রাখলাম। কী ঘন চুল অঞ্জলির, কী কোমল মসৃণ ত্বক! আমার খুব মায়া হতে লাগল। বড় কষ্ট পাচ্ছে অঞ্জলি।

১৪

পরের ঘটনাটার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। তার প্রথম আঘাত আমাদের বিহ্বল ক'রে দেয় এবং তার জের এখনো আমাদের দু'জনকে বিষণ্ণ ক'রে রেখেছে। এক-একটা ঘটনা যেন বিপর্যয়।

মারিয়ার হোটেল থেকে ফেরার পর আমরা প্রায় সারারাত ঘুমোইনি। অঞ্জলি মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে কেঁদেছে, কোনো কথা বলেনি, না-অভিযোগের, না-আত্মধিক্কারের। আমি মাঝে-মাঝে তাকে স্পর্শ ক'রে তার যন্ত্রণা লাঘব করতে চেয়েছি, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো, তার কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছি। তখন চেয়ারে ব'সে আমি সিগারেট খেয়েছি, আর নিজেকে অনুতপ্ত বোধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু

তাতেও সফল হইনি। কার্যকারণ, অবস্থা, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিতর্কের মধ্যে চ'লে গিয়েছি যে, নিজের হৃদয়াবেগকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি। শেষরাতের দিকে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে ঘুম এসে গিয়েছিল ক্লান্তিতে। অঞ্জলিও ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল, অঞ্জলিরও। চোখ মেলে দেখি জানলা দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে। ধড়মড় ক'রে উঠে চোখমুখে একটু জলের ঝাপ্টা দিয়ে দরজা খুললাম। স্বপ্ন দেখছি নাকি? সামনে দাঁড়িয়ে মারিয়া। তার মুখ কেমন শুকনো। এই প্রথম মারিয়ার ঠোঁটে দেখলাম হাসি নেই। তার চোখে উদ্বেগের ছায়া। আমি সামনে দাঁড়াতেই সে বলল, 'পলাশ, একটা দুঃসংবাদ নিয়ে তোমাদের কাছে আসতে হল। আর কার কাছেই বা যাব?' মারিয়ার হাতে একটা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ ছিল। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে সে কাগজের ভাঁজ খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখাল। সেটা শেষ সংবাদের জায়গা। তাতে খবর রয়েছে যে, দিল্লী থেকে হাওড়া অভিমুখী মেলট্রেন কলকাতার অনতিদূরে লাইনচ্যুত হয়েছে এবং বেশ কিছু যাত্রী হতাহত হয়েছে। আমি মুখ তুলে মারিয়ার দিকে তাকালাম, সে তখন বলল, 'পিটার এই ট্রেনেই আসছিল।'

—'সে কী?' আমার গলা থেকে শুধু ঐ দুটি শব্দই বেরোল।

ইতিমধ্যে অঞ্জলি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, মারিয়ার মুখে 'দুঃসংবাদ' শব্দটিই তাকে টেনে এনেছিল। সে মারিয়াকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি নিশ্চিত যে, পিটার এই ট্রেনেই ছিল?'

অনেকদিন বাদে অঞ্জলিকে এই দেখলাম নিজেকে ভুলতে। দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যেও একটা আনন্দ বিদ্যুচ্ছটার মতো আমার মনে খেলে গেল।

মারিয়া বলল, 'হ্যাঁ, রওনা হওয়ার আগে আমাকে সে টেলিগ্রাম করেছিল।'

এ-কথা শোনার পরও একটা আশা আমার মনে জ্ব'লে উঠল। আমার মনে পড়ল জেনীভার কথা। সেখান থেকে ট্রেনে রওনা হওয়ার সময় পিটার আমাকে ইঞ্জিনের পরের কামরায় চড়তে দেয়নি, বলেছিল দুর্ঘটনা ঘটলে ইঞ্জিনের কাছের কামরাগুলোই বিধ্বস্ত হয়। সে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠিয়ে দিয়েছিল পেছনের এক কামরায়। সেই সাবধানতা পিটার নিশ্চয় এক্ষেত্রেও অবলম্বন করেছিল। তবু কী সাংঘাতিক উদ্বেগের ঘটনা। আমি মারিয়াকে বললাম, 'তুমি একটু বোসো, আমি পোশাক প'রে নিই। আমরা স্টেশনে যাব।' অঞ্জলিকে বললাম, 'কখন ফিরতে পারব জানি না; তুমি খেয়ে নিয়ো।'

মারিয়াকে নিয়ে চ'লে গেলাম হাওড়া স্টেশনে। ইতিমধ্যে সেখানে পরবর্তী অনেক খবর এসেছে। আমরা গিয়ে শুনলাম জীবিত এবং অপেক্ষাকৃত কম জখম যাত্রীদের নিয়ে একটা রিলিফ ট্রেন কলকাতায় আসছে। আশা করা হচ্ছে সেটা আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে এসে পৌঁছবে। যাত্রীদের নামধাম পেতে এখনো অনেক দেরি। আমি মনে-মনে বলতে লাগলাম পিটার যেন এই রিলিফ ট্রেনে থাকে। মারিয়া মুখে কিছু না-বললেও তার মনের ঐ একই প্রার্থনা আমি যেন শুনতে পেলাম। আমার খেয়াল হল মারিয়াকে কিছু খাওয়ানো দরকার, ও তো অত তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে খেয়ে বেরোয়নি, তাছাড়া একলা ব'সে খাবার মতো মনের অবস্থাও নিশ্চয় ওর ছিল না। এখনো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আগের রাত থেকে আমিও খাইনি, কিন্তু সে-কথা আমার প্রথম মনে পড়েনি, খিদেও ছিল না। মারিয়াকে নিয়ে গেলাম স্টেশনের রেস্তোরাঁয়। সেখানে আমরা দু'জনেই কিছু খেয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে স্টেশনে লোক জমতে আরম্ভ করেছে, মেয়ে এবং পুরুষ। সকলের মুখচ্ছবিতে উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতা। মেয়েরা অনেকেই কাঁদছিল। ঐ অভিশপ্ত

ট্রেনে যারা আসছিল তাদের আত্মীয়স্বজন আমাদের মতোই আচম্‌কা খবর দেখে ছুটে এসেছে। রেলকর্মচারীদের কাছ থেকে জেনে তারা সবাই রিলিফ ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। সমস্ত নিশ্বাসের সঙ্গে সেই একই প্রার্থনা স্টেশনের বাতাস ভ'রে ফেলেছে: ও যেন এই ট্রেনে থাকে।

কত যুগ পার হ'য়ে অবশেষে ট্রেন এসে পৌঁছল। লোকেরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের ফটকের সামনে। তাদের সামলাতে পুলিস এবং রেলকর্মীরা হিমসিম। আমরা একাগ্র দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছি, অনড় হ'য়ে। অক্ষত যাত্রীরা বেরিয়ে চ'লে গেল, সমাগত আত্মীয়স্বজন তাদের প্রায় কোলে তুলে নিয়েছিল। পিটার আসেনি তাদের মধ্যে। আমাদের যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছি না। এমন সময় মাইকে ঘোষণা করা হল, জখম যাত্রীদের ট্রেন থেকেই অ্যাম্বুলেন্স ক'রে সোজা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। তাদের নামগুলো বলা হল। অনেক নামের মধ্যে আমরা শুনলাম: পিটার লরেন্স। আমাদের নিশ্বাস ছাড়া পেল। আহ্‌, কী স্বস্তি! অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ট্যাক্সি ধ'রে আমরা ছুটলাম হাসপাতালে। সেখানে পৌঁছে শুনলাম আহতদের চিকিৎসা ইতিমধ্যে শুরু হ'য়ে গিয়েছে। অনেকরকম জবাবদিহি ক'রে আমরা পিটারের কাছে যাবার অনুমতি পেলাম। গিয়ে দেখলাম বিধ্বস্ত চেহারায় পিটার বিছানায় শুয়ে আছে, মাথায় ও বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাদের দেখতে পেয়েই পিটার হাসল, হাসিটা ম্লান কিন্তু মধুর। মারিয়া তার গালের উপর হাত রাখল, পিটার একটু চোখ বুজল। তারপর চোখ খুলে ধীরে-ধীরে বলল, 'বেঁচে গিয়েছি, তবে আবার কবে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারব জানি না।' জিগ্যেস ক'রে জানা গেল, ডাক্তাররা বলেছেন আঘাত যদিও মারাত্মক নয়, তবু বেশ কয়েক মাস তাকে সাবধানে থাকতে হবে। প্রধান সাবধানতা হল বিশ্রাম, চলাফেরা ও মাথার কাজ যতদূর সম্ভব কম করা। যে-কথাটা

প্রথমেই আমার মনে এসেছিল এবং আমার আশা যাকে আঁকড়ে ধরেছিল, সেই কথাটা এবার পাড়লাম। মনের মধ্যে প্রশ্নটা অদম্য হ'য়ে উঠেছিল। জিগ্যেস করলাম, 'পিটার, ট্রেনের কোন্ কামরায় তুমি চড়েছিলে?' ও উত্তর দিল, 'ইঞ্জিনের পরে দ্বিতীয়টায়।'

—'সে কী, তুমি-ই না আমাকে জেনীভায় বলেছিলে ইঞ্জিনের কাছের কামরায় চড়া বিপজ্জনক, আমাকে তুমি চড়তে দাওনি। তবে নিজে চড়তে গেলে কেন?'

সহজ ও সংক্ষিপ্ত জবাবে পিটার বলল, 'নিজের সম্বন্ধে অতশত ভাবিনি।'

আমার আর কী বলার থাকতে পারে? ওর ঐ ক'টি কথার মধ্যে আমি তলিয়ে গেলাম।

পিটারকে দিন বারো হাসপাতালে থাকতে হল। মারিয়া ও আমি রোজ তাকে দেখতে যেতাম। অবিশ্যি বেশির ভাগ সময় মারিয়াই পিটারের কাছে থাকত, আমি বাইরে-বাইরে ঘুরতাম। অঞ্জলিও কয়েকদিন গিয়েছিল। সে প্রায় নীরবেই আমাদের সঙ্গে যেত এবং ফিরে আসত, তবে হাসপাতালে পিটারকে খুব আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করত। ইতিমধ্যে পিটার তার করণীয় সম্বন্ধে মনস্থির ক'রে ফেলেছিল: সে ইয়োরোপে ফিরে যাবে। আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল পঙ্গু অবস্থায় তার ভারতবর্ষে থাকার কোনো মানে হয় না, এখানে সে তো শুয়ে-ব'সে থাকার জন্যে আসেনি। তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিমানযাত্রার ব্যবস্থা করা হল, যাতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিনই সে ও মারিয়া রওনা হতে পারে।

সকালে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পিটার হোটেলে না-গিয়ে এল আমাদের বাড়ি। এ-ইচ্ছে সে নিজেই আগে থেকে জানিয়েছিল। প্রথমেই বলেছিল অঞ্জলিকে। বাড়িতে আসার পর পিটার অঞ্জলির সঙ্গে অনেক গল্প করল, হাসির কথা বলল। অঞ্জলিও বেশ সহজভাবে তাতে অংশ নিল। মারিয়াও মাঝে-মাঝে যোগ দিচ্ছিল। আমি

একটু আল্‌গা ছিলাম, যদিও পিটার আমাকে ডেকেও কয়েকবার কথা বলল। বিশ্রামের পর বিকেলে পিটার, মারিয়া ও আমি হোটেলে গেলাম, গোছগাছ করতে হবে। অবিশ্যি গোছগাছ করার বিশেষ কিছু ছিল না। অল্প যা মালপত্তর ছিল গুছিয়ে ফেলে ওখানেই চা খাওয়া গেল। তারপর হোটেলের পাট চুকিয়ে আবার ফিরলাম আমাদের বাড়িতে। ওখানেই সকলে খাব। অঞ্জলি ব'লে দিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একসঙ্গে রওনা হলাম বিমানবন্দরে। বিমান ছাড়ার খুব বেশী দেরি ছিল না। আমাদের পৌঁছনোর অল্প সময়ের মধ্যেই যাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হল বিমানে উঠতে।

বিদায়ের পালা। পিটার আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল, বলল, 'আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আবার আসতে পারব। এবার তো ভারতবর্ষকে ঠিকমতো জানতে পারলাম না, সব ভেস্তে গেল। এখানে এসে বোধহয় স্থায়ীভাবেই থাকা দরকার।' অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার এসে তোমাদের বাড়িতেই পাকাপাকি থাকব আর তোমার রান্না খাব। তুমি নিশ্চয় আপত্তি করবে না।' আমাকে সম্বোধন বলল, 'পলাশ, চিঠি লিখো, যোগাযোগটা রেখো, নইলে আবার এসে অঞ্জলির আতিথ্য নেব কী ক'রে?' মারিয়া অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধ'রে তার গালে চুমু খেল। অঞ্জলির মুখ লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু তার চোখে জল টলটল করছিল। তারপর মারিয়া আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি ক'রে হাসল। আমি তার হাত আমার হাতে ধ'রে ঝাঁকালাম, কিন্তু আমার চোখ আমি নামিয়ে নিয়েছিলাম।

ওরা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি আর অঞ্জলি একা হ'য়ে বাড়ি ফিরলাম।

১৫

অঞ্জলিকে নিয়ে বাড়িতে আমি একা। একা তো আমরা আগেও ছিলাম, কিন্তু এমন নয়। এ যেন হানাবাড়িতে নিঃসঙ্গ থাকা, চারদিকে স্মৃতির প্রেত। অঞ্জলিকে কোথাও আমি পাচ্ছি না। ও যেখানে রয়েছে সেখানে কী ক'রে যাওয়া যায়? ওকে আমার সামনে ঘুরতে-ফিরতে কাজ করতে দেখছি, কিন্তু আমি হাত বাড়ালেই বাড়ির আসবাবপত্রের সঙ্গে মিশে ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছে এক নিশ্চল পাষাণমূর্তি, ঠাণ্ডা পুরনো। আমি যে-হাত বাড়াচ্ছি, সেটা কীসের? উদ্ধারের, না, অন্য কিছুর? এইখানেই যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। আবার এক-এক সময় মনে হচ্ছে অঞ্জলি একেবারে নিভে গিয়েছে, জ্বলন্ত শিখা আর নেই, প'ড়ে আছে একরাশ ছাই। তার আগ্রাসী প্রেমের জায়গায় এখন কি শুধু নৈরাশ্য?

একত্র দু'জনের উজ্জীবনের কোনো উপায় আছে কিনা ভাবি। কী আর উপায় থাকতে পারে নিজেদের নিয়ে ব্যাপৃত না-হওয়া ছাড়া? নিজেদের ভোলা মানেই তো অন্যদের সম্বন্ধে ভাবা। অঞ্জলি যে এখনো নিজেকে ভুলতে পারে তা তো দেখলাম পিটারের দুর্ঘটনার ব্যাপারে। কিন্তু অন্যের ভাবনা যদি মনের একটা আকস্মিক ভাবান্তর হয় তাহলে আর কী হল? তাহলে ঘুরে আবার সেই নিজের নিষ্ফলতায় ফিরে আসা। সে-ভাবনা কাজের সঙ্গে যুক্ত না-হলে তার স্থায়িত্ব কতটুকু? আচ্ছা, অঞ্জলি কি আবার তার আগেকার রাজনৈতিক উদ্যমে আত্মনিয়োগ করতে পারে না? কিন্তু কে তাকে সে পরামর্শ দেবে, কে তার বিতৃষ্ণা ঘোচাবে? আমি? তা কী ক'রে সম্ভব? তার আগে তো আমার নিজের ত্রাণের প্রশ্ন আসে। দুই-তিনের গণ্ডি পার হ'য়ে আমি যদি অসংখ্যের মধ্যে না-যাই, তাহলে এক-একটা মুহূর্তের ঢেউয়ে আমি ক্রমাগত হাবুডুবু খাব, এই যেমন খেলাম

মারিয়াকে ঘিরে। আমারও নিজেকে ভুলতে হবে। এইভাবেই মনে হয়, আমরা পরস্পরকে ঠিকমতো দেখতে পাব। কিন্তু সে-প্রয়োজনের কথা কে বলবে অঞ্জলিকে? শুধু বলা নয়, অনুভব করানো। নিজের অভিজ্ঞতা দৃষ্টান্ত আর বন্ধুত্ব সে-কথার পেছনে না থাকলে হয় না। পিটার হয়তো পারত, কিন্তু সে কবে ফিরে আসবে কিম্বা আদৌ ফিরবে কিনা জানি না। ঐ ভূমিকায় অন্য কেউ কি দেখা দেবে?

নইলে করুণা ছাড়া আর কিছু নেই। অঞ্জলিকে দেখছি: তার ব্যর্থতা তার যন্ত্রণা আমার মধ্যে করুণা সঞ্চারিত করছে। কাছ থেকে আমাকেও তার দেখা দরকার। আমার পক্ষেও তার করুণা প্রয়োজন। আমি বলি, অঞ্জলি আমাকে করুণা করুক। একটা ছন্নছাড়া শোচনীয় কোণে আমরা দাঁড়াই। তাহলে হয়তো একসময় আমরা কাছাকাছি আসব। সেই অন্তরঙ্গতার জন্যে চেষ্টা ক'রে যাওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। কোনো চুক্তি নয়, কোনো ঘোষণা নয়, শুধু অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা।